শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ।

চতুর্থ খণ্ড

(১২৯৯ সালের ডায়েরী)

শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাশ্রিত অবস্থার কতকসময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত।

তদীয় কৃপাভাজন

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক যথাযথভাবে লিখিত।

কলিকাতা, বড়বাজার, ২০ নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীমহানন্দ নন্দী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

[মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা মাত্র

কুন্তলীন প্রেস,
৩১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বিশেষ বিশেষ অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	১	সঙ্কল্প	সংসঙ্গ
৫০	৯	ক্ষরন্তি	ক্ষরন্তু
৫০	৯	সন্তোষধি	সন্তোষবি
৫০	১১	মধ্মাং	মধুম্মাং
১০৩	৫	কুঞ্জ ঠাকুরদা	কুঞ্জ ঠাকুরতা



শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রী দ্‌গুরুসঙ্গ।

প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের

দেহাশ্রিত অবস্থার ৭ বৎ। (১২৯৩-৯৯ সাল পর্য্যন্ত) অলৌকিক ঘটনাবলী

শ্রীচরণাশ্রিত নিত্যসেবক **শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর** ডায়েরী—

সাধন সমস্যার চূড়ান্ত সা। **মহাত্মা গান্ধিও** বলেন—সত্যের অপলাপ হইলে স্বরাজও চাইনা। একে সেই সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণের জলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বীর্য্যধারণ করিতে হইলে,। প্রলোভনের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া তপস্যা করিতে হয়, এই পুস্তকে তাহা বিশব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপন্যাস। আর্য্য ঋষিগণের সারগভ বলী ব্রহ্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিনার মধ্যে এত সহজ ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে া করিয়া ছাড়া যায় না।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়—

কৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ যুগাবতারগণের সংশ্রবে আসিয়া গোস্বামী প্রভু ধর্ম্মক্ষেত্রে মিলন ঘটাইয়াছেন। সকল পথের সকল মতের সামঞ্জস্য করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইয়াছেন। গুরুর দয়া, শিষ্যের ঔদ্ধত্য; গুরুর আদেশ, শিষ্যের আত্মদেখাইয়া গুরুর মাহাত্ম্য প্রকট করা হইয়াছে।

মহাপুরুষগণের া স্থানের চিত্রে সুশোভিত ১ম খণ্ড (১২৯৩-৯৬) ১॥০। ২য় খণ্ড (১২৯৭) ১॥০। খণ্ড (১২৯৮) ২৲। চতুর্থ খণ্ড (১২৯৯) ২৲।

মহাবা গম্ভীরনাথ জী।
শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক সংগৃহীত মূল্য।০ আনা
সাধন সঙ্গীত
মহাবিষ্ণু যতী বির ... ... মূল্য ॥০ „

প্রকাশক—
মহানন্দ নন্দী।
২০নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীজনাথ মোদক ১৮নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ও কলিকাতার অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে শ্রী—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৬ নং সোনারপুর, বাঙ্গালীটোলা। পুরী—হেমচন্দ্র । ঠাকুরবাড়ী, পুরী। বরিশাল—জমিদার শ্রীহিরণ কুমার সেন রায় চৌধুরী। খুলনাগবন্ধু দত্ত কোং। ঢাকা—শ্রীবসুদা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গেণ্ডারিয়া। ফরিদপুর—শ্রীন্দ্রে দে হেড মাষ্টার গোপালগঞ্জ।—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ঘোষ—পুরুলিয়া। শ্রীপ্রতিভানাথ পাধ্যায় শ্যামপুর পোষ্ট, হাওড়া। শ্রীঅন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য ডাক্তার নড়াইল, পোষ্টার।

দয়া করিচার করিবেন।

সূচীপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা

বৈশাখ, ১২৯৯।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

আষাঢ়, ১২৯৯।

মাঘ, ১২৯৯।

চিত্র সূচী

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ।

শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ।

(চতুর্থ খণ্ড)

[বৈশাখ, ১২৯৯]

রূপের শোভানষ্টে ভজনে বিরক্তি।

গুরুদেব আমার সাধন ভজন ও জীবনের উন্নতি বিষয়ে যতই ভরসা দিন না কেন, আমি আমার ভিতরের দুরবস্থা দেখিয়া, দিন দিন বড়ই হতাশ হইয়া পড়িতেছি। গত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণকালে ঠাকুর আমাকে দুইটী নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে বলিয়াছিলেন। প্রথমটি—পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া চলা, দ্বিতীয়টি—প্রয়োজন বোধ হইলে কেবল পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) হইয়াই সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া। এই দু'টির একটি নিয়মও আমি এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করার ফলে আমার দুর্ব্বার কামরিপুর উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে উহার ফেঁকড়া অন্য দিক্ দিয়া গজাইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোক দর্শনের স্পৃহা তেমন বলবতী না থাকিলেও, স্ত্রীলোক আমাকে দেখুক্—এই লালসায় আমি মালাতিলকে সাজিয়া, সুন্দর বেশ-ভূষা করিয়া থাকি। ঠাকুর আমাকে সেদিন বলিলেন—

ব্রহ্মচারী! আয়নায় মুখ না দেখে' পার না? ব্রহ্মচারীর ওটি ক'রতে নাই।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম,—মুখ না দেখ্‌লে তিলক ক'রব কিরূপে? ঠাকুর কহিলেন,—

বাঁ হাতের তেলো এইভাবে সাম্‌নে রেখে', তা'র দিকে দৃষ্টি ক'রে তিলক ক'রো। ক্রমে নিজের মুখ তা'তে দেখ্‌তে পাবে।

আমি ঠাকুরের কথা মত আন্দাজে ললাটদেশে ব্রাহ্মণোচিত ত্রিপুণ্ড্র আঁকিয়া তদুপরি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে লাগিলাম। কিন্তু উহা ঠিক্ মত সরল না হওয়ায় গুরুভ্রাতারা আমায় উপহাস করিতে লাগিলেন। তিলক-বিভ্রাটে মুখের শোভা নষ্ট হইল ভাবিয়া উদয়াস্ত আমি অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। ভিতরের উদ্বেগে সাধনেও আমায় বিরক্তি আসিয়া পড়িল। নাম, ধ্যান আমার ধীরে ধীরে ছুটিয়া গেল। তখন রুদ্রাক্ষধারণের স্থানগুলিতে 'লোম্‌ছা' পোড়ার মত একটা জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে এই জ্বালা বৃদ্ধি পাইয়া বাহুর কক্ষাদিতে ফোস্কার মত মরা ছাল উঠিতে আরম্ভ করিল। তখন যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুরকে এসব অবস্থার কথা বলাতে ঠাকুর কহিলেন—

বিধিমতে রুদ্রাক্ষ ধারণ ক'রে নিয়মমত চ'ল্‌লে, তা'তে তম ও রজোগুণ নষ্ট হ'য়ে সাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থিতি করে। সর্ব্বদা নামেতে ক'রে ভিতর ঠাণ্ডা না রাখ্‌লে উহা ধারণ ক'র্‌তে নাই,—রোগ জন্মায়। তুমি এখন কিছুদিনের জন্য রুদ্রাক্ষ তুলে রাখ;—তুলসীর মালা ধারণ কর। তা'তেই জ্বালা কমে' যাবে, উপকার পাবে।

এখন আমি তাহাই করিতেছি! রুদ্রাক্ষ বর্জ্জনে উজ্জ্বল তেজস্বীরূপ হারাইয়া, নিরীহ বৈরাগীর মত হইয়াছি। পাছে কেহ আমার এই কদাকার চেহারা দেখে—এই লজ্জায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নতশিরে থাকি। ভিতরে যেন মরার মত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি,—নিয়ত লোকের দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা হয়। হায়—ভগবান্! মাত্র রূপের গরিমা লইয়া ছিলাম—রুদ্রাক্ষ ছাড়াইয়া, ঠাকুর তাহাতেও বাদ সাধিলেন। এখন কি লইয়া থাকিব?

সাধকের প্রথম সংযম। স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ ও বীর্য্যধারণ।

আশ্রমস্থ স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলেই আমার বেশের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নানা কথা তুলিতেছেন। সাধারণের অজ্ঞাত কোন গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপই ঠাকুর আমাকে এই দণ্ড দিয়াছেন,—এই প্রকার অনুমান করিয়া, কেহ কেহ আমার সম্বন্ধে আলোচনাও করিতেছেন। একটি গুরুভ্রাতা এই ব্যাপারের সুযোগ পাইয়া একদিন

ঠাকুরকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর রান্নার সময়ে কচি-কচি মেয়েগুলি গিয়ে ব্রহ্মচারীর কাছে বসে, ব্রহ্মচারীও তাদের খুব আদর করে। ব্রহ্মচারী যখন আসনে থাকে তখনও মেয়েগুলি গিয়ে তার আসন ঘেঁষে' বসে, ব্রহ্মচারী কোন আপত্তিই করে না,—বরং ওতে যেন খুব আমোদ পায়। উহার কি এরূপ করা ঠিক?" এ সকল কথা শুনিয়া আমার ভিতর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি আর করিব? আমার তো কিছুই বলিবার যো নাই,—মুখ যে বন্ধ! ঠাকুর উহাদের কথায় আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া সমস্তই যেন স্বীকার করিয়া লইলেন, এবং আমাকে শাসন করিয়া বলিলেন,—

ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রবই রাখতে নাই। স্ত্রীলোকের পানে তাকাতে নাই, তাঁদের সঙ্গে ব'স্তে নাই, তাঁদের সহিত কোনপ্রকার আলাপ ক'রতে নাই। স্ত্রীজাতি যিনিই হউন্ না কেন,—অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন্, আর যুবতীই হউন্, কিম্বা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন্,—সর্ব্বদা তাঁদের থেকে দূরে থাক্তে হয়; না হ'লে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। স্ত্রী-দেহ এমনই উপাদানে গঠিত যে, নির্ব্বিকার পুরুষের শরীরকেও তাতে আকর্ষণ করে:—ইহা বস্তু-গুণ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও যে দেহের আশ্রয় গ্রহণ করেন তার কতক অধীনতা তাঁকেও স্বীকার ক'র্তে হয়। শাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা এই দুটি সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মচারীদের অভ্যাস ক'র্তে হয়। সাধকাবস্থায় কায়মনোবাক্যে স্ত্রী-সঙ্গত্যাগ না ক'রলে বীর্য্যধারণ হয় না। অজ্ঞাতসারেও স্ত্রীদেহের সংশ্রব ঘট্‌লে, দেহাস্থিত বীর্য্য চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। তা'তে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়। বীর্য্যধারণ না হ'লে সত্যরক্ষাও সহজে হয় না। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, একাগ্রতা, প্রতিভা ইত্যাদি গুণ আপনাআপনি সাধকের লাভ হ'য়ে থাকে। এই দুটি একবার আয়ত্ত হ'লে সমস্ত সিদ্ধিই সাধকের সহজসাধ্য হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই সর্ব্বপ্রথমে সংযমের ব্যবস্থা। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষাই যথার্থ সংযম। এদুটি না হ'লে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ বহু দূরে। ধর্ম্মার্থীদের সর্ব্বপ্রথমে এ দুটির দিকে

বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চ'লতে হয়। ধর্ম্ম একটা কথার কথা নয়। প্রাণপণে চেষ্টা ক'রতে হয়, না হ'লে হয় না।

মা ও গুরু—বিষম সমস্যা। ঠাকুরের তৃপ্তি।

আমার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের কথা শুনিয়া মা নাকি দারুণ ক্লেশ পাইতেছেন। দিনরাত তিনি কান্নাকাটি করিয়া কাটাইতেছেন। আহার করিতে বসিয়া অন্নের দিকে চাহিয়া থাকেন, আর চোখের জলে ভাসিয়া যান। দুধ ছাড়িয়াছেন। অনশনে, অর্দ্ধাশনে তাঁহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মা আমাকে চাল, ডাল, ঘৃত, গুড় ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। "স্থূল ভিক্ষা" গ্রহণ করিতে আমার নিষেধ আছে, নিত্য ভিক্ষাই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের ব্যবস্থা। এখন এ সকল সামগ্রী লইয়া আমি কি করি? একদিকে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা; অপরদিকে বৃদ্ধা, দুঃখিনী জননীর বুকে শেল হানা। কোন্‌টি করিব? শুধু যদি গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিলেই হইত তাহা হইলেও হয় তো আমি ঐসব বস্তু গ্রহণ করিয়া মাকে সন্তুষ্ট রাখিতাম। আমার পরিষ্কার ধারণা, গুরুদেব আমাকে মা অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন; সুতরাং, তাঁর বাক্য লঙ্ঘনে আমার লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ কিছুই আসে না। কিন্তু ব্রতলঙ্ঘন আমি কি প্রকারে করিব? এই পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমস্ত ঋষি, মুনি, যোগীদের পরম আদরের সম্পত্তি। ইহা নষ্ট করিলে আমার পিতামাতা এবং যতদূর পর্য্যন্ত যাহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। এ সকল বিচার আমার ভিতরে আসিয়া পড়িল। আমি হোমের জন্য ঘৃত এবং একদিনের মত চাল-ডাল গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই ঠাকুরের ভাণ্ডারে অর্পণ করিলাম। এখন ঠাকুরের সেবায় ঐ চাউল দেওয়া হইতেছে। তিনি উহা ভোজন করিয়া অন্নের বড়ই প্রশংসা করিলেন। বলিলেন—

এই (সেঁচিপোতা ধানের নূতন) চাউলের ভাত এতই মিষ্টি যে, শুধু নুন্ দিয়া এম্‌নি খাওয়া যায়। ভাতে যেন ঘি মাখা র'য়েছে। বড়ই সুস্বাদ ও পুষ্টিকর। এই চাউল মধ্যে মধ্যে আমার জন্য দেশ হ'তে এনো।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। মায়ের হাতে প্রস্তুত করা চাউল ঠাকুর আনন্দের সহিত সেবা করিতেছেন—ইহাতে মা যথার্থই কৃতার্থ হইলেন।

লোভে প্রসাদভোজন, জ্বালা ও প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুদেবের আহারান্তে প্রসাদের থালা বারাণ্ডায় রাখিয়া দেই। পরে স্থান 'মুক্ত' করিয়া উহা সকলকে আমি বাঁটিয়া দিয়া থাকি। আমি হাতে ধরিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহ উহা স্পর্শ করে না। খাওয়ার বস্তুতে আমার দারুণ লোভ,—ভাল বস্তু দেখিলেই জিহ্বায় জল আসে। অনেকে বলেন প্রসাদে লোভ ভাল। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইলেও, উহার স্থূল উপাদান শুষ্ক, পর্য্যুসিত বা দুর্গন্ধময়ও হইতে পারে! সুতরাং অনেকের দেহের উপরে তাহারও একটা বিষময় ফল অনিবার্য্য। হয় তো লোভে পড়িয়া ঝাল, মিষ্টি ইত্যাদি সুস্বাদু, গুরুপাক, উত্তেজক বস্তু আহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনিষ্ট করিব—হয় তো এই জন্যই অথবা বহুলোককে প্রসাদবিতরণ করিয়া অবশিষ্ট কিছু থাকিবে না বলিয়াই দয়াল গুরুদেব স্বহস্তে আমার জন্য প্রত্যহ পৃথকভাবে প্রসাদ তুলিয়া রাখেন। আমার আহারের সময়ে তিনি আমাকে এই প্রসাদ পাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু জিহ্বার লালসায় অনেক সময়ে আমি তাহা পারি না। আজ উৎকৃষ্ট ছানার ডাল্না পাইয়া খাইতে বড়ই লোভ জন্মিল। মনকে বুঝাইলাম—এই উৎকৃষ্ট বস্তু যদি কেহ আমার অজ্ঞাতসারে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে আজ প্রসাদে বঞ্চিত হইব। তারপর শাস্ত্রে আছে, মহাপ্রসাদ 'প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা'।—এই যুক্তি ধরিয়া গুরুবাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া ফেলিলাম। প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিতে অত্যন্ত শঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল,—ভিতরে একটা জ্বালা উঠিল। এই জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। নামে অরুচি ও বিরক্তি আসিল। ফলে সাধনভজন ছুটিয়া গেল। সারাদিন যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম; এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আজ উপবাস করিয়া রহিলাম। কল্য আবার সন্ধ্যার সময়ে আহার করিব।

লোভ-সংযমের উপায়। রিপু দুইটি—জিহ্বা ও উপস্থ।

অবসরমত ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—লোভের যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করিতে পারি না। ভালো জিনিষ দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়। আসনে বসিয়া যখন নাম করি,—অজ্ঞাতসারে সুস্বাদু বস্তুর কল্পনা আসিয়া পড়ে। নাম, ধ্যান কিছুই হয় না। পূর্ব্বে আমার এরূপ কখনও ছিল না। এখন কি করিব? ঠাকুর কহিলেন—

যা খেতে ইচ্ছা হ'বে, খেয়ে নিও। না খেলে ও ইচ্ছা যাবে না।

আমি—তা হ'লে আমার একাহারের নিয়ম তো রক্ষা হয় না! না খেলে কি এ ইচ্ছা যাবে না?

ঠাকুর—না খাওয়াই ভালো। যা নিতান্ত ইচ্ছা হয়, খেয়ে নিও। আর একটি কাজ ক'রো। যে সব বস্তুতে খুব লোভ, তা' পরিতোষ ক'রে নিকটে ব'সে কারোকে খাওয়াইও। উপকার পাবে। নুন্ ত্যাগ ক'রলে খাবার বস্তুতে লোভ ক'মে যায়। তা' তো আর পারলে না! ব্রহ্মচারী মশায় ব'ল্‌তেন, রিপুমাত্র দুটি,—জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ সংযম করা সহজ। কিন্তু জিহ্বা সংযত রাখা বড়ই কঠিন। লোভেতে ক'রে স্থূল বস্তুর সঙ্গহেতু ক্রমে জীব জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য মুনি-ঋষিরা কতই কঠোর তপস্যা ক'রেছেন। অনাহারে, গলিত পত্রাহারে কতকাল কাটায়েছেন। অসংযত জিহ্বাদ্বারা কতপ্রকার উৎকট পাপের সৃষ্টি হয়। জিহ্বা বশ করার জন্য ঋষিরা মৌনী হইতেন। লোকের গুণানুবাদ, শাস্ত্রপাঠ ও ভগবানের নাম-কীর্ত্তনাদিতে জিহ্বা ভদ্র ও শুদ্ধ হয়। ক্রমে উহা সংযত হ'য়ে আসে।

তীর্থপর্য্যটনে সংযম লাভ।

শুনিয়াছি, ব্যবস্থানুরূপ তীর্থ-পর্য্যটন করিলে এ সব বিষয়ে সংযম খুব সহজে অভ্যস্ত হয়! এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—

তীর্থপর্য্যটনে বিশেষ কল্যাণ। দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তীর্থপর্য্যটন যৌবনেই ক'রতে হয়। না হ'লে প্রায় হয় না, অনেক বিঘ্ন ঘটে। পর্য্যটনের সময়ে সর্ব্বদা নীচু দিকে দৃষ্টি রেখে' প্রতি পদবিক্ষেপে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ ক'রে চ'ল্‌তে হয়। প্রত্যহ তিন-চার ক্রোশ বা বেলা দশটা পর্য্যন্ত চ'লে, একটা স্থানে আড্ডা নিতে হয়। সেখানে স্নান-আহ্নিক সমাপন ক'রে, সুবিধা হ'লে কোন দেবালয়ে প্রসাদ পাওয়া যায়। না হ'লে কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রস্তুত অন্ন আহার করা চলে, কিন্তু ভিক্ষান্ন স্বপাক আহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহা কখনও অপবিত্র হয় না,—পরম পবিত্র। শাস্ত্রে উহাকে অমৃত ব'লেছেন।

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে ভজন-সাধনে রাত্রি অতিবাহিত ক'রতে হয়। পর্য্যটনকালে টাকাপয়সা কখনও হাতে রাখ্‌তে নাই। কেহ কিছু দিতে চাইলেও নিতে নাই। কোথাও যাওয়ার সুবিধার জন্য কেহ টিকেট ক'রে দিলে নেওয়া যায়। সঙ্গে একটি জলপাত্র রাখ্‌তে হয়। তা কাঠের করঙ্গ হ'লেই নিরাপদ। পর্য্যটনের সময়ে একখানা কম্বল, কৌপীন, বহির্ব্বাস, একটী জলপাত্র ও একখানা গীতা রাখ্‌লেই যথেষ্ট। কোন দলে না মিশে একাকী বা একটি লোক সঙ্গে নিয়ে চল্‌লেই সব চেয়ে ভাল। সাধুদের জমায়েতের সঙ্গে চল্‌লে তাদের নিয়মে বাধ্য হ'তে হয়। তাতে অসুবিধাও আছে।

তীর্থপর্য্যটনকালে পথে যে সকল মন্দির, দেবালয় পড়ে, দর্শন ক'রে যেতে হয়। কোথাও খুব ভাল লাগ্‌লে সেখানে ব'সে প'ড়তে হয়। কিছু সময় সেই স্থানে থেকে সাধন ক'রতে হয়। পর্য্যটনকালে একরাত্রির অধিকসময় একস্থানে থাক্‌তে নাই। তীর্থে উপস্থিত হ'য়ে সর্ব্বপ্রথমে তীর্থগুরু করা ব্যবস্থা। পাণ্ডার নিকটে তীর্থের কর্ত্তব্য সমস্ত জেনে নিয়ে, সেই মত কার্য্য ক'রতে হয়। যে কোন তীর্থে কিছুদিন সংযতভাবে থেকে নিয়মনিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন ভজন ক'রলে তীর্থদেবতার প্রসন্নতা লাভ করা যায়। শুধু নিয়মরক্ষার মত তিনরাত্রিবাস ক'রে গেলে তীর্থের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না।

তীর্থযাত্রাকালে কখনও ক্রোধ ক'রতে নাই। ক্রোধেতে ক'রে সাধকের সাধনলব্ধ পুণ্য নষ্ট হয়। হিংসা, দম্ভ, পরনিন্দা পর্য্যটনকালে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। চিত্ত প্রসন্ন রেখে একমাত্র সত্যকেই অবলম্বন ক'রে চলতে হয়। তীর্থযাত্রাসময়ে এসকল নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এ ভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ একবার পরিভ্রমণ ক'রে আস্‌তে বার বৎসর লাগে। এতে জীবনটি বেশ তৈয়ার হ'য়ে যায়। বিধিপূর্ব্বক তীর্থ-পর্য্যটন ক'রলে সংযমটি সহজে অভ্যস্ত হয়—আরও অনেক প্রকার কল্যাণ হ'য়ে থাকে।

কর্ত্তব্য পালনে বৈরাগ্য লাভ। প্রলোভনে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়।

মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার কি আরও কর্ম্ম বাকী র'য়েছে? ঠাকুর বলিলেন—

কর্ম্ম আর হ'য়েছে কি? সবই তো বাকী রয়েছে?

১০ই–২০শে বৈশাখ, ১২৯৯।

আমি কহিলাম—সে কর্ম্মের কথা বলি না—শ্রীবৃন্দাবনে ব'লেছিলেন মা দাদাদের নিকটে আমার কর্ম্ম রয়েচে—আমি সেই কর্ম্মের কথা ব'ল্‌ছি?

ঠাকুর—মা তোমার সেবায় খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছেন বটে—তা হ'লেও যথেষ্ট হয় নাই। তিনি যদি রোগে দীর্ঘকাল কষ্ট পান, সেই সময়ে নিজ হ'তে গিয়ে তাঁর সেবা শুশ্রুষা করা কর্ত্তব্য হবে। আর তোমার দাদাদের প্রতিও অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাদের আপদ বিপদে সর্ব্বদাই দেখ্‌তে হবে। সকলেরই প্রতি কর্ত্তব্য আছে এই সব কর্ত্তব্য ক'রে ক'রে ক্রমে বৈরাগ্য জন্মে। এই বৈরাগ্য জন্মিলেই রক্ষা। না হ'লে আবার সংসারে প্রবেশ ক'রতে হয়।

আমি—সংসারে প্রবেশ কি? আমার কি বিবাহ ক'রতে হবে? আমার তো বিবাহের কল্পনাও হয় না।

ঠাকুর—সেই অবস্থা এখনও তোমার আসে নাই। ভবিষ্যতে সেই পরীক্ষা র'য়েছে। তখন যদি স্ত্রী-সঙ্গ কাকবিষ্ঠাবৎ মনে কর, স্ত্রী-সহবাস নিতান্ত অপবিত্র—ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ বুঝ্‌তে পার তবেই রক্ষা। না হ'লে কি রক্ষা পাওয়ার যো আছে? ভবিষ্যতে অনেক পরীক্ষা। সেই সময়ে ঠিক্ থাক্‌তে পারলেই হোলো। বিষয়ে বাসনা থাক্‌লেই সেই স্থানে বদ্ধ হতে হয়। বৈরাগ্য না জন্মিলে কি ঠিক থাকা যায়?

আমি—ভবিষ্যতে যে সকল পরীক্ষা, প্রলোভনে প'ড়ব—কি উপায়ে তা হ'তে উত্তীর্ণ হবো?

ঠাকুর—উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। ঐ সময়ে নামে ঠিক্ থাক্‌তে পার্‌লেই হোলো। নামে রুচি জন্মিলে কোন প্রলোভন, পরীক্ষাই কিছু করতে পারবে না। নামে রুচি না জন্মান পর্য্যন্তই

বিপদের আশঙ্কা। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম কর্‌তে কর্‌তেই নামে রুচি জন্মে, তা হ'লেই আর কোন মুস্কিল হয় না।

সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায়—সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণ।

১লা বৈশাখ প্রত্যুষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—এ বৎসর খুব নিয়ম-নিষ্ঠায় থাকিয়া ঠাকুরের আদেশ যথামত প্রতিপালন করিয়া চলিব। কিন্তু দু'চারদিন অতীত হইতে না হইতেই দেখিলাম আমার সমস্ত সঙ্কল্পই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করিব স্থির করিয়া আসন হইতে উঠি, সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দু'চার দণ্ড যাইতে না যাইতেই দেখি মনটি কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—সব ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাণায়াম, কুম্ভকযোগে সারাদিন নাম করিব সঙ্কল্প করিয়া খুব দৃঢ়তার সহিত লাগিয়া যাই—দু'চার ঘণ্টার পরেই দেখি মন জল্পনা কল্পনার রাজ্যে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দু'তিন ঘণ্টা বিশ্রামান্তে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নাম করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—কোথা হইতে দুর্নিবার অতিরিক্ত নিদ্রা আসিয়া প্রত্যহ আমাকে অবশ করিয়া ফেলিতেছে। যখনই যাহাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করি, তখনই তাহাতে অজ্ঞাতসারে শিথিলতা আসিয়া পড়িতেছে। আমার এরূপ কেন হইল—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল।

ঠাকুর সারারাত্রি একাসনে বসিয়া থাকিয়া, চারটার সময়ে একবার মাত্র অৰ্দ্ধ ঘণ্টার জন্য শয়ন করেন। নিদ্রা যা'ন কিনা বলিতে পারি না। রাত্রি ৩।০টার সময়ে প্রত্যহই তিনি বাহিরে আসিয়া আমতলায় উপস্থিত হন, এবং উচ্চ হরিধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরকে ঐ সময়ে একাকী পাইয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, মনের একাগ্রতা-সাধনে দৃঢ়তা আমার কিসে জন্মিবে? নিদ্রাও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাধন করিতে পারি না। কি করিব?

ঠাকুর বলিলেন—**উপায় ঐ এক। বীর্য্য যদি স্থির হয়, সমস্তই সহজ হ'য়ে আস্‌বে। ওটি না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক্ মত হয় না। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা—এই যদি ঠিক্ মত প্রতিপালন কর্‌তে পার এক সময়ে ভগবানের কৃপা নিশ্চয়ই লাভ কর্‌বে। সত্য-প্রতিপালন কর্‌তে হ'লে সত্য কথা, সত্য চিন্তা এবং সত্য ব্যবহার কর্‌তে হয়। জিজ্ঞাসিত না হ'য়ে কখনও কথা বল্‌বে না। জিজ্ঞাসিত হ'লে সত্য ধারণামত আধ ঘণ্টা**

বল্‌লেও কোন দোষ হবে না। নিজ হ'তে কথা বলা একেবারে কমিয়ে ফেল্‌তে হয়। বীর্য্যধারণও সহজ নয়। কতপ্রকারে বীর্য্যক্ষয় হয়। প্রস্রাবের সময়ে যেরূপ কর্‌তে ব'লেছি—সেই মত ক'রো। না হ'লে পেরে উঠ্‌বে না। চেষ্টা ক'রে যাও—ধীরে ধীরে সব হ'য়ে আস্‌বে।

একটু পরে আবার বলিলেন—তোমাদের এদিকের ছেলেদের পশ্চিমদেশ অপেক্ষা কু-অভ্যাস বেশী। এ বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা একেবারে নাই। তা'তেই ছেলেরা খারাপ হয়। খুব ছোট সময় হ'তেই কু-অভ্যাস জন্মে। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা সব বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেন, কিন্তু যা'তে শরীর-মনের বিশেষ কল্যাণ হয়—সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে লজ্জা বোধ করেন। শিক্ষা দেওয়া তো থাক্ বরং কুদৃষ্টান্ত দেখান। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একঘরে রে'খে, স্ত্রী পুরুষে অপর ঘরে থাকেন। এসব ছেলেবেলা হ'তে সুযোগ পায় ব'লে ছেলেরা খারাপ দিকে চলে। দিন দিন যেরূপ হ'চ্ছে—তা'তে মনে হয়, আর কিছুদিন পরে বিষম অবস্থা দাঁড়াবে।

এই বলিয়া ঠাকুর কতগুলি ঘটনা বলিলেন। আমি বলিলাম—কেহ আমাকে বিদ্বেষভাবে মিথ্যা দোষারোপ কর্‌লে আমি তা' সহ্য কর্‌তে পারি না।

ঠাকুর বলিলেন—

উত্তর দিলেই বা লাভ কি? ঝগড়া মাত্র হয়। তা'তে নিজেরই তো ক্ষতি। এ সব বিচার ক'রে সর্ব্বদা চল্‌তে হয়।

স্বাস্থ্যলাভের উপায়। বিভিন্ন মালা ধারণের উপকারিতা।

রুদ্রাক্ষ ধারণের আদেশ।

আজ মেঘাড়ম্বর দেখিয়া সময়ের কিছুই ঠিক্ পাইলাম না। বেলা অবসান অনুমানে ভাবিলাম—ঠাকুর প্রত্যহই ৪টার সময়ে আমাকে বলিয়া থাকেন—

ব্রহ্মচারী! রান্না কর্‌তে যাও—

১৪ই বৈশাখ, আজ বোধ হয় ঠাকুর ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি রান্না ও আহার সমাপনের পর ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। একটু পরে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—ব্রহ্মচারী! **রান্না কর্‌তে যাবে না?**

আমি কহিলাম—বেলার ঠিক্ পাই নাই। রান্না আহার করিয়া নিয়াছি।

ঠাকুর বলিলেন—**সন্ন্যাসীরা আকাশ দেখেই বেলার ঠিক্ পান, আমাদেরই মুস্কিল, ঘড়ি না দেখে বেলা বুঝি না। আহারের পরিমাণ ও সময় খুব ঠিক্ রে'খো। এ দুটি ঠিক্ রাখ্‌লেই শরীর বেশ সুস্থ থাক্‌বে।**

আজ ঠাকুরের গলায় প্রবালের মালা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রবালের মালা ধারণে কি উপকার হয়? ঠাকুর বলিলেন—**শরীর ঠাণ্ডা রাখে।**

আমি—তুলসীর মালা ধারণেও তো শরীর ঠাণ্ডা রাখে। এও কি সেই প্রকার? ঠাকুর—**তুলসী ধারণে শরীর ঠাণ্ডা করে, আর দেহ মন সাত্ত্বিক করে। প্রবালে পিত্ত নষ্ট ক'রে শরীর ঠাণ্ডা রাখে, মনের উপরও কিছু কিছু ক্রিয়া করে।**

পদ্মবীজ ও স্ফটিকের উপকারিতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—

পদ্মবীজ ধারণে মন প্রফুল্ল থাকে। স্ফটিকে তেজ ও শক্তি বৃদ্ধি করে। এজন্য শাক্তেরা স্ফটিক ব্যবহার করেন, ভাল ভাল ফকিরদেরও স্ফটিক ব্যবহার কর্‌তে দেখা যায়। অনেকে স্ফটিকের মালা জপ করেন।

রুদ্রাক্ষত্যাগ করার পর হইতে আমার যে অবস্থা হইয়াছে—ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর বলিলেন—**তুলসীতে উগ্রভাব নষ্ট করে—স্বভাব নম্র ও বিনয়ী করে। রুদ্রাক্ষে উৎসাহ, উদ্যম ও তেজ বৃদ্ধি করে। শরীরও খুব গরম রাখে। কাল হ'তে তুমি আবার পূর্ব্বের মত রুদ্রাক্ষ ধারণ কর। শরীর তোমার রুদ্রাক্ষের তেজ ধারণ কর্‌তে পার্‌তো না ব'লেই—উহা তুলে রাখ্‌তে ব'লেছিলাম। এখন উহা আবার নিয়মমত ধারণ কর।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কতক্ষণে দিন শেষ হয়—দেখিতে লাগিলাম।

স্বপ্ন—ক্রোধে পতন।

গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—ঠাকুরের সহিত একটি নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। শ্রীধর এবং শ্যামকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ও সঙ্গে আছেন। ঠাকুর বলিলেন—

এই সাধন যাঁহারা পাইয়াছেন, সকলেই বড় লোক, সকলেই মোক্ষলাভ করিবেন। আমাকে বলিলেন—**পূর্ব্বে তুমি সন্ন্যাসী ছিলে। ক্রোধ দ্বারা পতিত হইয়াছ। দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলে আবার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে।**

১৫ই বৈশাখ,

এই কথা শোনার পরই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি অবসরমত ঠাকুরকে স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর মাথা নাড়িয়া স্বপ্নের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সায় দিয়া লিখিয়া রাখিতে বলিলেন।

দীক্ষাকালীন উপদেশ। পরমহংসজীর আদেশ।

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। অনেকে আজ সাধন পাইবেন। সকালে দীক্ষাপ্রার্থীরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ছোট ভাই রোহিণীর আজ দীক্ষাগ্রহণের কথা ছিল, বড়দাদার ছেলে শ্রীমান্ সজনীর অদ্য বিবাহ বলিয়া রোহিণী আসিতে পারে নাই। মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ঠাকুর দীক্ষাদানের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন—**সাধনপ্রার্থীরা সকলে আসিয়াছেন?** একটি গুরুভ্রাতা বলিলেন—ব্রহ্মচারীর ছোট ভাই রোহিণী আসে নাই। ঠাকুর কহিলেন—**সে আর কি প্রকারে আস্‌বে? তা'র পরে হবে।**

১৮ই বৈশাখ

ইহার পর কোঠাঘর লোকে পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুর আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া ঠাকুর সাধনপ্রার্থীদিগকে বলিতে লাগিলেন—

১। সর্ব্বদা সত্য প্রতিপালন কর্‌বে। মনে যাহা যথার্থ প্রতীতি হবে—তাহাই সত্য ব'লে গ্রহণ কর্‌বে। সত্যরক্ষা কর্‌তে হলে মিথ্যা কল্পনা, বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। না হ'লে সত্য বলা যায় না। আর জিজ্ঞাসিত না হ'য়ে কথা বল্‌তে নাই। সর্ব্বদা পরিমিতভাষী হবে। কাহারও নিন্দা কর্‌বে না। পরনিন্দা মহাপাপ; নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ।

২। বীর্য্যধারণ কর্‌বে। বীর্য্যরক্ষা যদিও শারীরিক তপস্যা তথাপি ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বীর্য্যরক্ষা না হ'লে সত্য প্রতিপালন হয় না। ইহা দ্বারা সাধনের বিশেষ সাহায্য হয়। যাঁহারা সন্ন্যাসী কোনরূপেই তাঁহারা বীর্য্য নষ্ট কর্‌বেন না। যাঁহারা গৃহী শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহারা ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস কর্‌বেন। অযথা যাঁহারা বীর্য্য নষ্ট করেন তাঁহারা পিতৃমাতৃঘাতী। এই দেহ পিতামাতার বীর্য্যশোণিত দ্বারা উৎপন্ন। কেবল পিতৃঋণ শোধ কর্‌বার জন্যই বীর্য্যত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বৃথা বীর্য্য নষ্ট কর্‌লে পিতৃমাতৃঘাতী, আত্মঘাতী ও ব্রহ্মঘাতী হ'তে হয়। বীর্য্য রক্ষা দ্বারা মনের একাগ্রতা ও শরীরের সুস্থতা লাভ হয়। বীর্য্যরক্ষা না হ'লে সাধনে উৎসাহ থাকে না। সাধনের উপকারিতাও অনুভব হয় না।

৩। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। ইহাই আমাদের সাধন। প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন ফেলা হচ্ছে—নেওয়া হচ্ছে, তেমন উহার প্রতি লক্ষ্য রে'খে সর্ব্বদা নাম কর্‌বে।

হঠাৎ একবারে এসব হয় না। বারংবার চেষ্টা ক'রে উঠে 'পড়ে এই কয়টি বিষয়ে স্থির হতে হবে। চেষ্টা থাক্‌লে একসময় এই সব হবেই। সাধনের বিধি বলা হ'লো—এখন নিষেধ বলা যাচ্ছে।

৪। মাংস, উচ্ছিষ্ট ও মাদক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর্‌তে হবে। কঠিন রোগে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থা মত মাংস, মাদক ব্যবহার করা যায়, শুধু ঔষধরূপে। প্রয়োজন শেষ হওয়ামাত্র আবার ছাড়্‌তে হবে। মৎস্য আহারে নিষেধ নাই। বিধিও নাই। যার যেমন ইচ্ছা। উচ্ছিষ্ট সর্ব্বদাই ত্যাগ কর্‌বে। পিতামাতা পরম গুরু ; তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট নয়। প্রসাদজ্ঞানে উহা গ্রহণ কর্‌লে উপকারই হয়। উচ্ছিষ্টজ্ঞান হ'লে উহাও ত্যাগ কর্‌বে। পাঁচ বৎসরের অধিক যাহাদের বয়স, তাহাদেরই উচ্ছিষ্ট হয়। যে সব শিশুদের ভালমন্দ জ্ঞান হয় নাই—তাহাদের উচ্ছিষ্ট তত অনিষ্টকর হয় না।

৫। কোন প্রকার দলে বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাক্‌বে না। যেখানে

পরমেশ্বরের নাম, যেখানে ধর্ম্মের কোনপ্রকার অনুষ্ঠান, সেখানেই ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার কর্‌বে। সকল ধর্ম্মার্থীদেরই আদর কর্‌বে। কোন সম্প্রদায়কেই অনাদর কর্‌বে না। আমাদের কোন দল বা সম্প্রদায় নাই।

৬। স্ত্রীলোক হতে সর্ব্বদা সাবধান থাক্‌বে। তাহাদের সঙ্গে এক ঘরে সাধন কর্‌বে না। যে স্থলে গৃহাভাব—তথায় অগত্যা একটি পর্‌দা দিয়া নিবে। নির্জ্জনে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বস্‌বে না।

৭। যথাসাধ্য পরোপকার কর্‌বে। যাঁহারা গৃহী তাঁহারা খুব আদরের সহিত অতিথি-সৎকার কর্‌বেন। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সকলেরই যাহাতে তৃপ্তি হয়—গৃহী তাহা কর্‌বেন। কোন প্রকার হিংসা কর্‌বেন না। একটি বৃক্ষের পাতাও বিনা প্রয়োজনে ছিঁড়্‌তে নাই। কাহারও মনে বৃথা কষ্ট দিবে না।

যাহারা এখানে দীক্ষা নিতে এসেছেন, শুধু তাদের জন্যই এসকল কথা নয়। ইহলোক ও পরলোকে যাহারা এই সাধনের ভিতরে আছেন—সকলেরই জন্য পরমহংসজী এই আদেশ কর্‌লেন।

এ সকল আদেশ প্রদানের পর ঠাকুর **জয় গুরু! জয় গুরু!** বলিতে বলিতে ধ্যানস্থ হইলেন; পরে দীক্ষামন্ত্র দান করিলেন।

এই সময়ে গুরুভ্রাতাদের নানাপ্রকার অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কোঠার ভিতরে বাহিরে সকলেরই মধ্যে হাসি, কান্না, আনন্দ উচ্ছাসের তরঙ্গ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুর ক্রমে সকলকে সংযত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। স্ত্রী-পুরুষে আশ্রম পরিপূর্ণ। সকলেরই খুব আনন্দ!

পরিবেশনে বৈষম্য—ঠাকুরের বিরক্তি।

আজ আশ্রমে মহোৎসব। সুখাদ্য সামগ্রী দ্বারা ঠাকুরের ভোগের আয়োজন দেখিলে ভিতর আমার শুকাইয়া যায়; মুখ মলিন হইয়া পড়ে। প্রায়ই উৎকৃষ্ট সুখাদ্য বস্তু স্বহস্তে সকলকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছি—অথচ নিজে এক কণিকাও খাইতে পাই

না। লোভের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি—অন্তরের ক্লেশ একটি লোককেও বলিবার যো নাই। সকলেই আমার ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী। আজ গুরুভ্রাতাদের লইয়া ঠাকুর যখন ভোজন করিতে বসিলেন, পরিবেশনকালে সমস্ত বস্তুই ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দিয়াছিলাম। ঠাকুর তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সকলের সাক্ষাতেই আমাকে বলিলেন—

"ব্রহ্মচারী! প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় বেশী পরিমাণে খাবার দিলে, উচ্ছিষ্ট বস্তু দেওয়া হয়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আমার দিকে কট্ মট্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন—কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন। হায়! উচ্ছিষ্ট বস্তু ঠাকুরকে খাওয়াইতেছি ভাবিয়া আমি একান্ত প্রাণে মনে মনে ঠাকুরের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলাম।

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে আর একবার পরিবেশনের বৈষম্যহেতু কঠোর শাসন করিয়াছিলেন—এক পংক্তিতে ভোজনকারীদিগের মধ্যে পরিবেশনে তারতম্য করিতে নাই—ইহা সাধারণ নীতি কিন্তু ঠাকুরের বেলা এই নীতি রক্ষা করিয়া চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। শিষ্যদের পংক্তিতে গুরুর বিশেষত্ব থাকিবেই—ইহা দোষাবহ মনে হয় না; তারপর প্রসাদ রাখিতে গিয়া ঠাকুর অল্প পরিমাণে আহার করিবেন—এই প্রকার ভাবও পরিবেশনকালে স্বতঃই প্রাণে উদয় হয়।

আহারান্তে ঠাকুর আমার জন্য আর আর দিনের ন্যায় স্বহস্তে সুস্বাদু প্রসাদ তুলিয়া রাখিলেন। এ ভাগ্য কাহার হয়? গুরুপাপে লঘু দণ্ড করিয়া—ঠাকুর যাচিয়া অপরিসীম দয়া করিতেছেন। ইহা দেখিয়া কান্না সংবরণ করিতে পারি না। প্রতিদিন ঠাকুরকে নিজহাতে আহার দিয়া থাকি কিন্তু যেভাবে ভক্তিতে গদগদ হইয়া দিতে হয়—একটি দিনও তাহা পারিলাম না। ঠাকুর কেন যে এ পিশাচের হাতে খাবার গ্রহণ করেন বুঝিতেছি না। আজও আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মধ্যাহ্নেই ঠাকুরের প্রসাদ পাইলাম। অমনি দারুণ জ্বালা উপস্থিত হইল। হায় কপাল! গুরুভ্রাতারা আমার হাতে কণিকামাত্র ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরমানন্দে দিন কাটান, আর আমাকে ঠাকুর স্বহস্তে প্রসাদ দেন—তাহা পাইয়াও সমস্তদিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি, সাধন চলে না—নামও একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়।

কাম, ক্রোধ ও লোভ—নরকের দ্বারস্বরূপ।

অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রসাদ পেয়েও আমার জ্বালা হয়—এ কি রকম? ঠাকুর কহিলেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ে একবেলা আহার তোমার নিয়ম। নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌লে এ সব হয় না। নিয়মটি রক্ষা ক'রে চ'লো।

আমি—আমি লোভ সংবরণ করতে পারি না—এই লোভ কি আমার যাবে না?

ঠাকুর বলিলেন—কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর হাত হ'তে একেবারে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। এ জন্য ঋষি মুনিরা কত ক'রেছেন। কঠোর তপস্যা ও ভজনসাধনদ্বারা অবস্থার একটু উন্নতি হ'লেই—এ সকল রিপু এসে সাধককে আক্রমণ করে। নানা প্রকার দুরবস্থায়, প্রলোভনে ফেলে এদের সর্ব্বনাশ করে। বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্যাদ্বারা অত শক্তিলাভ ক'রেও—কামের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেলেন না। পতিত হ'তে হলো। বহুচেষ্টায় কামকে একটু দমন করতেই ক্রোধ এসে আক্রমণ কর্‌লো। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিকারী হ'য়েও বিশ্বামিত্র দুর্জ্জয় রিপু ক্রোধের নিকটে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হ'তে লাগ্‌লেন; তাঁর সমস্ত তপস্যার ফল নষ্ট হ'য়ে গেল। তখন তিনি নিরুপায় দেখে লোকসঙ্গ ত্যাগ কর্‌লেন, মৌন হলেন। তীব্র তপস্যার দ্বারা আবার পূর্ব্ব অবস্থা লাভ করতে লাগ্‌লেন। এ সময়ে লোভের উৎপাৎ আরম্ভ হলো। বিশ্বামিত্র আহার ত্যাগ কর্‌লেন। কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দ্বার স্বরূপ। একমাত্র ভগবানের ভজন দ্বারা ইহাদের মুখ ফিরায়ে দিতে পার্‌লেই নিষ্কৃতি। তখন ইহারা ভজনের সহায় হয়, বন্ধু হয়। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম কর্‌লেই ক্রমে এদের উৎপাৎ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। এমন সহজ উপায় আর নাই।

ইষ্টমন্ত্র গুরুকেও বল্‌তে নাই।

কয়দিন যাবৎ সাধনভজনে মন বসিতেছে না। নিয়ত মার কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে। হঠাৎ এমন কেন হইল, বুঝিতেছি না। আজ অপরাহ্নে ছোড়দাদা রোহিণীকে লইয়া বাড়ী হইতে আসিলেন। তাঁর মুখে শুনিলাম মা আমার জন্য কান্নাকাটি করিতেছেন। বুঝিলাম এ

২০শে ২৫শে বৈশাখ

জন্যই আমার এত অস্থিরতা। মাকে ঠাণ্ডা করিয়া তাঁর চরণধূলি লইয়া না আসিলে কিছুতেই চিত্তস্থির হইবে না। মার জন্য প্রাণ বারংবার কাঁদিয়া উঠিতেছে।

আজ রোহিণীর দীক্ষা হইল। "বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা" বিষয়ে আজ ঠাকুর বিশেষ করিয়া বলিলেন। এ বিষয়ে এমনভাবে আর কখনও বলেন নাই।

ঠাকুর কহিলেন—"বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা যত কাল না হবে—তত কাল সাধনের ফল অনুভব হবে না। সাধনে যদি যথার্থ উপকার পাইতে চাও—এ দুটি রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে।"

গৃহস্থ বৈধভোগের দ্বারা কি প্রকারে কর্ম্ম শেষ করিবে—ঠাকুর তাহা বিস্তারিতরূপে বলিলেন।—"গৃহী ঋতুগামী হবেন। শাস্ত্র-ব্যবস্থামত স্ত্রীসঙ্গ কর্‌বেন। নেশাবস্তু, উচ্ছিষ্ট ও মাংসাহারে সাধন-শক্তিকে একেবারে চেপে রাখে, প্রকাশ হ'তে দেয় না। এ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর্‌বেন। ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকটে প্রকাশ কর্‌বেন না। এমন কি গুরু জিজ্ঞাসা কর্‌লেও বল্‌বেন না।"

দীক্ষাকালে আর আর লোককে যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, রোহিণীকেও তাহাই দিলেন। আজ গুরুদেব দয়া করিয়া আমার সকল ভ্রাতাদেরই ভার গ্রহণ করিলেন। আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

ঠাকুরের অসাধারণ অনুভব।

আজ মধ্যাহ্নে পাঠান্তে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি—ঠাকুর ধ্যানস্থ—হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—"জগবন্ধু কুলগাছটি কাটিতে কাটারি নিয়ে বেরিয়েছেন, শীঘ্র গিয়ে বল, যেখানে কাট্‌তে মনে ক'রেছেন—তার দেড় হাত উপরে কাটেন।" আমি দৌড়িয়া দক্ষিণের চৌচালার পশ্চিমদিকে কুলগাছের নিকটে পৌছিয়া দেখি—জগবন্ধুবাবু কাটারিহস্তে আসিতেছেন। গাছটি কোথায় কাটিবেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্থান দেখাইয়া বলিলেন—এখানে কাট্‌বো। আমি বলিলাম—ঠাকুর আরও দেড় হাত উপরে কাট্‌তে বলেছেন। জগবন্ধুবাবু তাহাই করিলেন। দেখিলাম ঐ স্থানে গাছটি কাটায় দুটি বড় ডালা রক্ষা পাইল, তাহাতে গাছটি বাঁচিয়া গেল।

গতকল্য ঠাকুর পাঠ শুনিতে শুনিতে আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! কাঁঠাল

গাছের চারাটিকে ছাগলে খাচ্ছে—সাত গ্রাস খেতে দিয়ে তাড়ায়ে দাও।” আমি তাড়াতাড়ি কাঁঠালগাছের নিকটে যাইয়া দেখি—ছাগলটি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উহার একটি পাতা চিবাইতেছে। ইহার সাতটি পাতা খাওয়া হইলে তাড়াইয়া দিলাম। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ছাগলটিকে সাতগ্রাস খাইতে বলিলেন কেন? চারাগাছ, সাতটি পাতা খাওয়াতেই যে ওর দফা শেষ। ঠাকুর বলিলেন—“যার যা খাবার জিনিষ, খেতে আরম্ভ কর্‌লে বাধা দিতে নাই—অন্ততঃ সাত গ্রাস খেতে দিয়ে বাধা দিতে হয়।”

ঠাকুর কোথায়—আর কাঁঠাল গাছই বা কোথায়—ঠাকুর কি প্রকারে জানিলেন—তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিই হইল না। সেদিন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়া ঠাকুরকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন—ঠাকুরের নিকটে ঐ চিঠিখানা পৌছিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর জগবন্ধুবাবু দ্বারা সমস্তগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পরে জানা গেল চিঠি পড়িয়া উত্তর দিতে গেলে, যথাসময়ে নগেন্দ্রবাবু তাহা পাইতেন না। ঠাকুরের এই প্রকার দূরদৃষ্টি ও অনুভব সর্ব্বদা দেখিয়া এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে এখন আর এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে কোন প্রকার আন্দোলনই আসে না।

মাতাঠাকুরাণীর উপরে বিরক্তি—তাঁর প্রসাদ পাইতে ঠাকুরের আদেশ।

২৮শে বৈশাখ ছোড়দাদা রোহিণীকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। রোহিণীর বিবাহ। আমাকে বাড়ী যাইতে পুনঃ পুনঃ বলিলেন। মা আমার জন্য খুব ক্লেশ পাইতেছেন। ছোড়দাদা বলিলেন—বিবাহে আত্মীয়স্বজন যাহারা আসিয়াছেন—আমার সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনা শুনিয়া মার মন খারাপ হইয়া গিয়াছে—তিনি সর্ব্বদা কাঁদেন আর গোঁসাইকে গালাগালি করেন। এ কথা শুনিয়া অবধি আমার ভিতরে যেন আগুন লাগিয়াছে। মা ঠাকুরকে গালাগালি করেন। মার উপরে অত্যন্ত রাগ হইল। আর মার মুখ দেখিব না—মনে মনে স্থির করিলাম।

মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহারান্তে আর আর দিনের ন্যায় তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম। মন অতিশয় অস্থির। একদিকে বাড়ী যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অপরদিকে মার উপরে ভয়ানক ক্রোধ—তার পর এ সময়ে বাড়ী গেলে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি রক্ষা করিতে পারিব কি না

খুব সন্দেহ—এ অবস্থায় কি করি? মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—ঠাকুর যদি এ বিষয়ে একটা কিছু বলিয়া দেন নিশ্চিন্ত হই। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**"কি ব্রহ্মচারী! বাড়ীতে বিবাহে তোমার যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র এল না?"**

আমি—"শুধুপত্র কেন? লোকও ছ'সাতবার এসেছে।"

ঠাকুর—**"তবে বাড়ী গেলে না কেন?"**

আমি—"এ সময়ে আত্মীয়স্বজন বহু স্ত্রীলোক পুরুষ বাড়ীতে এসেছেন। তাঁদের নিকটে মাথাগুঁজে নির্ব্বাক্ হ'য়ে ব'সে থাকা সহজ নয়, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম এ সময়ে প্রতিপালন ক'রে চলা বড়ই শক্ত—তাই এতদিন বাড়ী যাই নাই।"

ঠাকুর বলিলেন—**"না গিয়ে খুব ভালই করেছ। বিবাহ হ'য়ে গেলে একবার বাড়ী যেও। বাড়ী গিয়ে আর ভিক্ষা করো না। মা ঠাক্‌রুণের প্রসাদ পেও।"** ইহার পর ঠাকুর আমাদের বিবাহের নিয়মাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণীর বিবাহে 'কতটাকা পণ নেওয়া হ'ল' ঈষৎ হাসিয়া তাহারও খবর নিলেন। ঠাকুরের সহিত এসব বিষয়ে কথাবার্ত্তায় আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণই সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বহুকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যার পর খুব উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াও সামান্য অপরাধে পতিত হয়; নিরাপদ স্থান কি তবে নাই?"

ঠাকুর কহিলেন—**"সদ্‌গুরুর আশ্রয় যাহারা পেয়েছেন তাহারাই নিরাপদ হয়েছেন। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পে'লে কোন ভয়ই থাকে না।"**

আমি—"তবে ঐ সব মহাত্মারা, মুনি-ঋষিরা কি সদ্‌গুরুলাভ করেন নাই?"

ঠাকুর—**"সদ্‌গুরু লাভ কি এতই সহজ? বহু জন্ম সিদ্ধিলাভ ক'রে—একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই সদ্‌গুরুলাভ হয়। সদ্‌গুরু লাভ হ'লে তাঁরা আর কোন অবস্থা হ'তেই পতিত হন না। তবে কর্ম্ম কাটাবার জন্য তাঁদের অবস্থা কিছু কালের জন্য চেপে রাখা প্রয়োজন হ'তে পারে। নষ্ট কখনও হয় না। সদ্‌গুরু লাভের পর যে কোন অবস্থাই লাভ হোক্ না কেন, তাহা একেবারে স্থায়ী। সদ্‌গুরু লাভ হ'লেই সম্পূর্ণ নিরাপদ।"**

আমি—“সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ ক’রে যদি কেহ আবার অন্যত্র গিয়ে দীক্ষা নেন্ সদ্গুরু প্রদত্ত সাধন ত্যাগ করেন, তা হ’লে সদ্গুরু ও তাকে ত্যাগ করেন কি?”

ঠাকুর—“তা কি আর কখনও হয়? তবে কর্ম্মভোগ শেষ করাইতে কিছুকাল ঘুরাইতে পারেন। কিন্তু তিন জন্মে নিশ্চয়ই কর্ম্ম শেষ করাইয়া নেন।”

অহিংসা, সত্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই সাধন।

একটু পরে ঠাকুর নিজ হইতে সকলকে বলিতে লাগিলেন—

“আমাদের এই সাধন পূর্ব্বে আর কখনও গৃহস্থদের মধ্যে ছিল না। গৃহস্থদের এ সাধন লাভ করা এবারই প্রথম। যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এই সাধনের প্রচলন ছিল। কেহ ইচ্ছা কর্‌লেই অমনি এ সাধন লাভ কর্‌তে পার্‌তেন না। বর্ত্তমান সময়ে সংসারের দুরবস্থা দেখে কয়েকজন মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য সংসারীদের মধ্যেও প্রার্থী হ’লেই এই দুর্লভ সাধন যাকে তাকে দিয়েছেন। যাঁদের এ সাধন দেওয়া গিয়েছে, তাঁরা কেহই নিয়মমত এ সাধন কর্‌ছেন না। এ পর্য্যন্ত একটি লোকও প্রস্তুত হলো না। তাই কিছুকাল পর্য্যন্ত এদের কি অবস্থা দাঁড়ায়, তা দেখ্‌বেন। যাঁদের আশা দেওয়া গিয়াছে, মাত্র তাঁরাই সাধন পাবেন। এ বছর নূতন আর কেহ সাধন পাবেন না—এখন এরূপ আদেশ হলো। সাধন নিয়ে যদি কিছুই করা না হয়—তবে এ সাধন নেওয়া কেন? বৃথা ঋষি-মুনিদের পরম আদরের সাধনপথ কলুষিত করা হয় মাত্র। কাহারও সাধনে নিষ্ঠা নাই। আমাদের সাধনে বেশী কথা নাই—মাত্র তিনটি কথা। যিনি এই তিনটি কথা রক্ষা কর্‌ছেন, তিনিই সাধন কর্‌ছেন। অহিংসা, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই তিনটিই এখন আমাদের সাধন। কেহ যদি ঈশ্বর না মানেন, নাম-সাধন না করেন, কিন্তু এই তিনটি গুণ অবলম্বন ক’রে চলেন, তাঁকে আমি ধার্ম্মিক মনে করি। আস্তিকই হউন বা নাস্তিকই হউন, মূলকথা এই তিনটি গুণ থাকা চাই। তার পর প্রেমভক্তির কথা, সে অন্য প্রকার। এ সব গুণ

থাক্‌লে প্রেমভক্তিও তাঁর লাভ হবেই। সে জন্য আর চেষ্টা কর্‌তে হবে না মনুষ্যের যা' কর্ত্তব্য—ঐ তিনটি লাভ হ'লেই হ'য়ে গেল। ঐ তিনটির একটিতেও যদি শিথিলতা হয়, তা' হ'লে সংকীর্ত্তনে ভাব উচ্ছ্বাসই হোক্—আর নামে অশ্রুপাতই হোক্—কিছুই নয়।"

চন্দ্রগ্রহণ—সংকীর্ত্তন—ভাবের ঘরে চুরি, ঠাকুরের শাসন।

বুধবার, ৩০শে বৈশাখ।

আজ চন্দ্রগ্রহণ—আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহর হইতেও বহু গুরুভ্রাতারা আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাহারা নানাস্থানে দলে দলে মিলিত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দুইটার সময়ে ঠাকুর বাহিরে আসিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"আজ এখানে এই শুভক্ষণে কত দেবদেবী, ঋষিমুনি এসেছেন—ইঁহারা কত আনন্দ কর্‌ছেন। তোমরা সংকীর্ত্তন কর।"

ঠাকুরের বলামাত্র খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মধ্যস্থলে ঠাকুর স্থিরভাবে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটি ভদ্রলোক নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার নৃত্য আমাদের কাহারই ভাল লাগিল না। বরং বিরক্তি আসিতে লাগিল। ঠাকুর—'কপটতা ক'রো না, কপটতা ক'রো না" বারংবার বলিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি আরও ভাবোন্মত্ততা দেখাইতে লাগিলেন। তখন দ্রুতগতিতে পশ্চাৎদিক্ হইতে ঠাকুর তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া রাস্তার দিকে ধাবমান হইলেন। পরে কীর্ত্তন-অঙ্গনের বাহিরে উহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—

"এখানে ভাব দেখাতে এসেছ? ভাবের ঘরে চুরি?—ধর্ম্মের নামে ভাণ?"

লোকটী আর পশ্চাৎদিকে না তাকাইয়া দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল। ঠাকুর কীর্ত্তনস্থলে আসিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণন করিয়া "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে দেখিয়া মাতিয়া গেলেন। তাঁহারা মণ্ডলাকারে ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। উচ্চ সংকীর্ত্তনের ভাবোদ্দীপক রবে ও মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টার

ধ্বনিতে সকলেই দিশাহারা হইলেন। দর্শকবৃন্দের ভাবোচ্ছ্বাসে আনন্দ-কোলাহল আরম্ভ হইল। মহিলাগণের মাঙ্গলিক উলুধ্বনি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনিতে মিলিত হইয়া আশ্রমটিকে যেন ঘনঘন কম্পিত করিতে লাগিল। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধবেশে বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর অচিরে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। নিবিড় নভোমণ্ডলে ক্ষীণ নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝিকিমিকি করিয়া উঠিল। জানি না ঠাকুরকে কিরূপ দেখিয়া গুরুভ্রাতৃগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তাঁহারা 'হরিহরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহারা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। রাহুমুক্ত চন্দ্রমা শুভ্রজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুরও **"হরিবোল হরিবোল"** বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। গুরুভ্রাতারা ধীরে ধীরে সংকীর্ত্তন থামাইয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে তাহারা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। আশ্রম নিস্তব্ধ হইল।

সাধনপ্রার্থী একটি ভদ্রলোক আশ্রমে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজ গ্রহণের পর ঠাকুর তাহাকে ডাকাইয়া মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া দীক্ষা দিলেন। গ্রহণের পর ঠাকুর আমতলায় গিয়া বসিলেন। অবশিষ্ট রাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। ভোরবেলা ঠাকুর শৌচাদি সমাপন করিয়া পূবের ঘরে নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। আমিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাড়ী রওয়ানা হইলাম।

নদীতে ঝড়—দৈবে রক্ষা।

বুড়ী-গঙ্গার পারে আসিয়া স্নান-তর্পণ সারিয়া নিলাম। মাঝ নদীতে গহনা (নৌকা) দেখিয়া ইঙ্গিত করা মাত্র মাঝিরা আসিয়া আমাকে তুলিয়া নিল। সাধুবেশ দেখিয়া নৌকার সকলেই আমাকে আদর-যত্ন করিয়া বসাইল। কয়েক ঘণ্টা চলিয়া আমরা ধলেশ্বরীর ধারে পঁহুছিলাম। তখন অকস্মাৎ কাল মেঘ উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সম্মুখে ভয়ঙ্কর নদী দেখিয়া সকলেই বিষম বিপদ অনুমানে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাহারা মাঝিদিগকে পাড়ি দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন।

'মীরের-বেগে' মাঝিরা ঝড়-তুফানকে গণ্যের ভিতরেই আনে না। তাহারা নৌকায় পাল তুলিয়া স্বচ্ছন্দে চলিল। মাঝ নদীতে পঁহুছিলে ঘনঘটায় গভীর গর্জ্জন ও বর্ষণে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। নদী বিষম কাঁপিয়া উঠিল। প্রবল তরঙ্গে নৌকাখানা বেচাল হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ এ সময়ে তুফানের ঝাপ্‌টা উঠিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঝিরা পাল নামাইবার চেষ্টাও করিতে পারিল না। তাহারা বেসামাল হইয়া 'বদর বদর' ডাক ছাড়িতে লাগিল। একটি তুফানের ঝাপ্‌টায় নৌকা কাৎ হইয়া পড়িল। আরোহীরা, ডুবিলাম ভাবিয়া হতাশ হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আমি গুরুদেবের অভয় চরণ একান্ত প্রাণে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছেন মনে হইল। তখন উল্লাসের সহিত চীৎকার করিয়া সকলকে বলিলাম—'ভয় নাই, ভয় নাই—ঠাকুর নিশ্চয় আমাদের রক্ষা কর্‌বেন।' এ সময়ে হঠাৎ একটি তুফানের ঝাপ্‌টা আসিয়া পালটিকে দুভাগ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। নৌকাও সোজা হইয়া নক্ষত্রবেগে পারের দিকে ছুটিল। অদ্ভুত প্রকারে নৌকা গিয়া তীরে ঠেকিল। ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল। পারের ঘাট সেরাজদিঘা এখনও বহুদূরে। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা, "আজ যাত্রা অশুভ হইয়াছে—'পক্ষান্তে মরণং ধ্রুবং' " বলিয়া পরস্পর তর্ক জুড়িলেন। পরে 'সাধুটি নৌকায় থাকায়ই এ আপদে রক্ষা পাইলাম' এই সিদ্ধান্তই স্থির করিলেন। মাঝিরা কিছুতেই আমার ভাড়া গ্রহণ করিল না। বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে নৌকা সেরাজদিঘায় পঁহুছিল। আরোহীরা—'দুর্গা, দুর্গা' বলিয়া পারে উঠিয়া পড়িলেন। আবার মহা দুর্লক্ষণ আরম্ভ হইল। কাল আকাশে ঘন ঘন বিজলী চমক্‌ ও ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন হইতে লাগিল। সকলেই দোকান ঘরে আশ্রয় লইয়া আমাকে বাড়ী যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি উজ্জ্বল শুভ্র-জ্যোতিঃ সম্মুখে প্রকাশমান দেখিয়া নির্ভয়ে যাত্রা করিলাম। বৃষ্টি হয় হয় অবস্থায়ও প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা কাল চলিয়া বাড়ী পঁহুছিলাম। মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া সমস্ত শ্রান্তি দূর করিলাম। দু'তিন মিনিট সময় অতীত হইতে না হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এক মাত্র ঠাকুরের কৃপাতেই এবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম, ইহা পরিষ্কার বুঝিয়া ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিলাম।

বাড়ীতে উপস্থিতি—মায়ের আশীর্ব্বাদ।

বাড়ীতে মেজ দাদা ও ছোড়দাদাকে নমস্কার করিয়া নিজ ভজন কুটীরে প্রবেশ করিলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন পাতিয়া একমনে নাম করিতে লাগিলাম। বিবাহ

উপলক্ষে সমাগত লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ। আত্মীয়-স্বজন সকলে দলে দলে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। আমি মৌন হইয়া রহিলাম। পরে মাতাঠাকুরাণীর আদেশে নানা ব্যঞ্জনে তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। আহারেরও সময়ের কিছুই ঠিক রহিল না। কিন্তু তাহাতেও চিত্ত প্রফুল্ল রহিল, নাম সরস ভাবে আপনা আপনি চলিল। এ সমস্তই ঠাকুরের দয়া মনে হইতে লাগিল। জয় গুরুদেব !

বাড়ীতে গিয়া প্রথম কয়দিন বেশ ছিলাম। শেষরাত্রে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া স্নানান্তে জপ, পাঠ হোমাদি নিয়মমত করিতাম। তখন মা আমার জন্য চিঁড়া ভাজা, নারিকেল কোরা, ঘৃত ও চিনি আনিয়া সম্মুখে বসিয়া আমাকে

জ্যৈষ্ঠ

খাওয়াইতেন। কখনও বা ভিজা চাউল বাটিয়া তাহাতে দুধ চিনি ও নারিকেল কোরা মিলাইয়া খাইতে দিতেন। মা জানিতেন এই দুটি জিনিস আমি খুব ভালবাসি। ভজন কুটীরে থাকিলে মেয়েরা আমার নিকটে আসিতে সুযোগ পাইবেন— এই আশঙ্কায় জলযোগের পর বহির্ব্বাটীতে আমতলায় যাইয়া বসিতাম। বেলা প্রায় ১টা পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়ে ভজন কুটীরে আসিতাম। ছোড়দাদা তখন একটি ডাব আনিয়া আমাকে দিতেন এবং আমার কাছে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার অসাধারণ ভালবাসা ও স্নেহ-দৃষ্টিতে আমার প্রাণ বড়ই ঠাণ্ডা থাকিত। ঠাকুরের অভাব অনেকটা পূর্ণ হইত। কখন আমার কি প্রয়োজন তাহা ভাবিয়াই যেন তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। ছোড়দাদার স্বাভাবিক সেবার ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। নিজ জীবনে ধিক্কার আসিত। বিকাল বেলা মাতাঠাকুরাণীর দু'গ্রাস প্রসাদ পাইয়া স্বপাক আহার করিতাম। আহারান্তে যখন নিজ ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতাম, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামবাসী স্ত্রীলোক, পুরুষ আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নতশিরে থাকিয়া তাহাদের সকলের কথার জবাব দিতাম। সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন। প্রথম কয়দিন এইভাবে আনন্দে কাটিল—পরে দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল।

গতকল্য প্রত্যূষে নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে আসনে বসিলাম। হঠাৎ মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। বহু চেষ্টায়ও নাম করিতে পারিলাম না। তখন আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। মাঠে ময়দানে কতক্ষণ ঘুরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে 'ছকির বাড়ী' জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া বাড়ী আসিলাম। স্বপাক আহার করিয়া আসন ঘরে প্রবেশ করিলাম। নামশূন্যাবস্থায়

থাকা কি যে বিষম যন্ত্রণা পরিষ্কার অনুভব করিতে লাগিলাম। সমস্তটি রাত্রি যন্ত্রণা ও অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম। অদ্য সকালে নিত্য ক্রিয়া সমাধানের পর ঢাকা রওনা হইতে প্রস্তুত হইলাম। মা নানা প্রকার খাবার আনিয়া আদর করিয়া খাওয়াইলেন। মা তখন বলিলেন—'তোর যেখানে থেকে শান্তি হয়—সেখানেই গিয়ে থাক্। সময়ে সময়ে তোকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়—মধ্যে মধ্যে এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাস্। আমি তোকে যে সব জিনিষ পাঠিয়েছিলাম—তা' তুই গ্রহণ করিস্ নাই শুনে বড়ই কষ্ট পেয়েছিলাম—তাই তোর গোঁসাইকেও গালাগালি করেছি। মনে কত কষ্ট পেয়ে বলেছি গোঁসাই তা বুঝেছেন। আমার অপরাধ ক্ষমাও করেছেন।' মার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। জলযোগের পর মার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সেরাজদিঘা রওনা হইলাম। ছোড়দাদা অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। অপরাহ্ন ৫টার সময়ে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পঁহুছিলাম। ঠাকুরকে দর্শনমাত্রই উৎসাহ, আনন্দ ভিতরে প্রবেশ করিল। অবসন্নতা দূর হইল।

ঘৃতপানে ঠাকুরের কৃপা।

ঝোলাঝুলি লইয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি—কুতুবুড়ী একটি বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—'ব্রহ্মচারি! ভাল ঘি এনেছ—আমাকে একটু দেও।' আমি ঠাকুরের জন্য উৎকৃষ্ট ঘৃত যত্নের সহিত আনিয়াছি—তাহা ঠাকুরকে দেওয়ার পূর্ব্বে কি প্রকারে কুতুকে দিই, এ কথা একবার মনে হইল। কুতুকে ঘৃত দিতে উদ্যত দেখিয়া ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক ঈষৎ হাসিমুখে বালকের মত হাত পাতিয়া আমাকে বলিলেন—

ব্রহ্মচারি! আমার জন্য আন নাই?—আমাকেও একটু দেও।

আমি ঠাকুরের গণ্ডূষ ভরিয়া ঘৃত দিলাম, ঠাকুর উহা পান করিয়া হাত খানা চাটিতে লাগিলেন এবং ঘৃতের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

বিক্রমপুরের ঘৃত বড়ই উৎকৃষ্ট—শান্তিপুরের সরভাজা ঘিয়ের মত। ঘরে রেখে দিলে বাহিরে থেকে ইহার সদ্‌গন্ধ পাওয়া যায়। স্বাদ যেন ক্ষীরের মত।

ঠাকুরের নামে রাখা জিনিষ—তাঁহাকে দেওয়ার পূর্ব্বেই তিনি আগ্রহের সহিত চাহিয়া নিলেন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের প্রণালী।

ঠাকুরের আদেশমত আজ মহাভারত মোক্ষ-পর্ব্বাধ্যায় পাঠ আরম্ভ করিলাম।
৯ই জ্যৈষ্ঠ শ্রবণান্তে ঠাকুর বলিলেন—

মহাভারত মহাসমুদ্র। ইহার কোথায় কি আছে তা' কি কেহ পাঠ ক'রে গেলেই মনে রাখ্‌তে পারে? এ সব গ্রন্থ পাঠ করার সময়ে ভাল ভাল কাজের কথা তুলে নিতে হয়। পরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের ভিতর হ'তে ও সব শ্লোক নিয়ে মুখস্থ ক'রে রাখ্‌তে হয়।

একটুপরে ঠাকুর বলিলেন—

মানুষ যদি হিংসাশূন্য হ'তে পারে, মন হ'তে হিংসার ভাব যদি একেবারে দূর কর্‌তে পারে, তা' হ'লে কোন প্রাণীই তাকে হিংসা করে না। মহা অরণ্যে বাঘভালুকাদির মধ্যেও অনায়াসে নিরাপদে থাকৃতে পারে। পাহাড়-পর্ব্বতে যে সকল সাধু মহাত্মারা আছেন, মন হ'তে হিংসা দূর ক'রেই তাঁরা স্বচ্ছন্দে রয়েছেন। অহিংসা, সত্য ও বীর্য্যরক্ষা—এই তিনটিই যথার্থ ধর্ম্ম। এই তিনটি হ'লে আর সব আপনা আপনি হয়।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এ সব বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

তোমার কার্য্য তুমি কর—হিংসা অনিবার্য্য।

মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠান্তে ঠাকুরের সম্মুখে আমরা সকলে নিবিষ্টমনে বসিয়া আছি
১০ই—১৬ই জ্যৈষ্ঠ অকস্মাৎ একটা বিড়াল আসিয়া একটি আরজিনা সাপকে ধরিল। আরজিনাটি বিড়ালের মুখে থাকিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সকলেই 'আহা! আহা!' করিয়া উঠিল। আমি সাপটিকে ছাড়াইতে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলাম। ঠাকুর অমনি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া আমাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন—

বসো। হঠাৎ কিছুই কর্‌তে নাই। সমস্ত কাজই বিচার ক'রে কর্‌তে হয়। স্থির হ'য়ে ব'সে তোমার কায তুমি কর। ওকাজ তোমার নয়। ওদিক দেখ্‌তে একজন আছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে বা তাঁর ইচ্ছা না হ'লে একটি তৃণও নড়ে না; কেহ কাহাকে বধ কর্‌তে পারে না। কোথায় কাহার কি ভাবে মৃত্যু হবে—তাহা তিনিই ঠিক ক'রে রেখেছেন। বিড়ালটি তার বিধি-নির্দ্দিষ্ট আহার মুখে তুলে নিয়েছে—তুমি তা' ছাড়াতে ব্যস্ত কেন? জীবহত্যা? তা' কে না কর্‌ছে? জীবনধারণ কর্‌তে হ'লেই জীবহত্যা অনিবার্য্য। বৃক্ষলতা ইত্যাদি যাদের উদ্ভিদ বল, তাদেরও জীবন আছে। সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাদি সমস্তই ঠিক মানুষের মত আছে। বর্ত্তমান দর্শন-বিজ্ঞানাদিতে যাহাই সিদ্ধান্ত করুক না কেন এ কথা যথার্থ। যদি কখনও তেমন অবস্থা হয়, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে কত প্রাণী হত্যা হয়, চোখের প্রত্যেকটি পলক তুল্‌তে ফেল্‌তে কত অসংখ্য প্রাণী বধ হয়, তা নিবারণ কর্‌বে কি প্রকারে? বৃক্ষলতাপাতাও হিংসা দ্বারা জীবন ধারণ করে। সর্ব্বত্রই হিংসা। তবে আর একজনের আহারে অন্যে বাধা দিবে কেন? ইহা ভগবানেরই বিধান। তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্ত হচ্ছে। মনটিকে একেবারে শান্ত ক'রে ফেল, স্থিরভাবে ব'সে সর্ব্বত্র ভগবানেরই কার্য্য দর্শন কর। তাঁর ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হয় না।

আগ্রহে অতিথি-সেবায় ঠাকুরের কৃপাবর্ষণ।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের সহিত কয়েকটী সাধু আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী, সুশিক্ষিত, বি. এ. এম এ.। কেহ কেহ সরকারী উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন। ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া তাঁহাদের জন্য রান্না করিতে বলিলেন। আমি খুব উৎসাহের সহিত রান্না করিতে চলিলাম। ভাণ্ডারে যাইয়া দেখি—ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। সামান্য চাউল, ডাল, নুণ, লঙ্কা মাত্র আছে—তাহাও খুব অল্প পরিমাণ। সাদা জলের ভিতরে নুণ লঙ্কা ফেলিয়া দিয়া ডাল সিদ্ধ করিয়া রাখিলাম। রান্না শেষ করিয়া অশ্বিনীকে ডাল চাকাইলাম। অশ্বিনী ডাল মুখে দেওয়া মাত্র

বলিল—'বাবারে! কি নুণ! কাহারও সাধ্য নাই ইহা মুখে দেয়।' আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। কতগুলি জল ডালে ঢালিয়া দিলাম—কিন্তু নুণ কমিল না। এদিকে রাত প্রায় আড়াইটা হইয়াছে। ক্ষুধিত সাধুরা আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কি করি? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া একান্ত প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। অতিথিরা যেন তৃপ্তির সহিত আহার করেন, প্রার্থনা করিলাম। সাধুদের ভোজন করিতে ডাকিলাম। ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলাম। সাধুরা ডালের সদ্‌গন্ধ ও স্বাদের খুব প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষে আহার সমাপন করিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই অবশিষ্ট ডাল খাইয়া বলিলেন—'এমন সুস্বাদু ডাল আশ্রমে কখনও রান্না হয় না।' বুঝিলাম ইহা ঠাকুরের প্রত্যক্ষ কৃপা; তিনি দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।

মহাসঙ্কীর্ত্তনে প্রেমানন্দের শক্তি-প্রার্থনা, ভাবের বন্যা—আমার শুষ্কতা। জীবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, পাপপুণ্য—সংস্কার মাত্র। সাধনে সংস্কারমুক্তি।

প্রেমানন্দ ভারতী (সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ইনি আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু। গপ্ এণ্ড গছিপ (Gup and Gossip) কাগজের সম্পাদক ছিলেন। আমার ফয়জাবাদে থাকা কালে, প্রায় সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিতেন। সাধনপ্রার্থী হওয়াতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলি। তখন হইতে ইনি এই ভাবে আছেন। নীলানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপা পাত্র। সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। ধর্ম্মানুরাগে ইঁহারা সকলেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনভাবে দেশে দেশে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন।

উচ্চ শিক্ষিত কয়েকজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আশ্রমে আসিয়াছেন, এই সংবাদ অচিরে সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া সাধুদের দর্শন করিয়া যাইতে লাগিল। আজ সঙ্কীর্ত্তনের বিপুল আয়োজন লইয়া বহু সম্ভ্রান্ত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে মন্দির প্রাঙ্গনে মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তবৃন্দ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া করতালি সংযোগে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর করজোড়ে অনিমেষনেত্রে কিছুক্ষণ সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরের স্থির কলেবরে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের আকৃতি অন্য প্রকার হইয়া গেল। তিনি জয় শচী-নন্দন, জয় শচী-নন্দন

বলিতে বলিতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে দেখিয়া উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহারা ভাবাবেশে বিবিধ প্রকারের নৃত্য করিয়া ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া কীর্ত্তন অঙ্গনে ঘুরিতে লাগিলেন। বিস্মিতনেত্রে দর্শকমণ্ডলী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। মৃদঙ্গ করতালের ঝম্ ঝম্ ধ্বনিতে সকলেরই হৃদয় নাচিতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে ভাবতরঙ্গে তুফান উঠিল। গুরুভ্রাতারা অনেকে ঠাকুরকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের প্রতি পদ-সঞ্চারে বৃক্ষলতা সহিত আশ্রমটী যেন নৃত্য করিতে লাগিল। কি শক্তিতে জানিনা, আজ সমস্তই একাকার! স্ত্রী-পুরুষেরও ভেদাভেদ রহিল না। সকলেই মাতোয়ারা। ভাব-বৈচিত্র্যের বিশৃঙ্খল-সৌন্দর্য্যে সকলেরই চিত্ত অভিভূত হইল। ঠাকুর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ত্তন থামিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। ভারতী মহাশয় ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'শক্তি দেও, শক্তি দেও।' ঠাকুর তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া সুস্থির করিলেন।

আজ মহাভাবের বন্যায় কতলোক ভাসিল, কতলোক ডুবিল। আমি কিন্তু ডাঙ্গায় তপ্ত বালির উপরে দাঁড়াইয়া আনন্দসাগরে সকলকে হাবুডুবু খাইতেই দেখিলাম। বন্যার এক বিন্দু জলেরও স্পর্শ পাইলাম না, ঠাণ্ডা বাতাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও গায়ে লাগিল না। ভাবিলাম—হায়! আমার একি দশা হইল? দিন দিনই যেন শুষ্ক কাষ্ঠ হইয়া পড়িতেছি। সঙ্কীর্ত্তনে ভাব উচ্ছ্বাস এক সময়ে আমারও হইত, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের সাময়িক আনন্দে এখন আর স্পৃহা নাই—এখন তীব্র বৈরাগ্যের কঠোর নিয়ম পালনেই তৃপ্তিলাভ করি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**"অহিংসা, সত্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,—এই তিনটীই মানবের যথার্থ ধর্ম্ম। ইহা লাভ না হ'লে কোন উচ্চ অবস্থার অধিকারী হওয়া যায় না।"** প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিচারবুদ্ধির দ্বারা একটু সংযত হইতে যত্ন করিতেছি মাত্র—কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের আভাসও এ পর্য্যন্ত স্বভাবে খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রকৃতিটী আমার সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিরোধী। বিচারের ধর্ম্ম ছাড়িয়া কবে আর স্বভাবের ধর্ম্ম লাভ করিব? সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহা যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান, শ্রেষ্ঠজীব। আমা অপেক্ষা তাঁহারা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ভগবানের নামে যাঁহাদের অশ্রুপাত হয়, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে

যাঁহারা আত্মহারা হন, তাঁহারা সামান্য নন। যতই তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী, দুরাচার হউন না কেন—তাঁহারা নমস্য।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্, সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।" হায়! আমি সকল দিকেই ঠাকুরের কৃপায় বঞ্চিত রহিয়াছি—প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার কোন দিকেই কিছু উন্নতি হইতেছে না কেন?

ঠাকুর বলিলেন—উন্নতি সকলেরই হ'তেছে। ভগবানের রাজ্যে একটী বস্তুও এক অবস্থায় থাকে না। উন্নতি হ'তেছে—ইহা নিশ্চয় জেনো।

আমি একটু উত্তেজিত অবস্থায় আব্দার করিয়া বলিলাম—কিসে বুঝিব উন্নতি হইতেছে? পূর্ব্বে যে সকল পাপ কার্য্য করিতাম না, এখন তাহা করি। পূর্ব্বে যে সকল চিন্তা, কল্পনা ঘোর অপরাধ মনে করিতাম, এখন সে সকলে সুখ পাই। এই প্রকার সকল বিষয়েই অবনতি দেখিতেছি।

ঠাকুর বলিলেন—এতে উন্নতির বাধা হয় না। অবনতিও হয় না। এ সকলই বাহিরের। আত্মার উন্নতি প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই হ'তেছে। এখন যাহাকে পাপ বল, পুণ্য বল—সমস্তই সংস্কার। বাস্তবিক এসব কিছুই নয়। ইহা পাপ, ইহা পুণ্য—ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, এই প্রকার সংস্কারে আবদ্ধ হওয়াতেই আমরা কষ্ট পাই—উন্নতি দেখ্‌তে পাই না। বৃক্ষ যেমন আপনা আপনি বৃদ্ধি পাচ্ছে—জীবাত্মাও সেইপ্রকার আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, কার্য্য-কর্ম্মের কোন অপেক্ষা না ক'রে উন্নতিলাভ কর্‌ছে। বৃক্ষকে পোকায় ধর্‌তে পারে—কেহ তার ডাল ভাঙ্গ্‌তে পারে—কিন্তু তাতে বৃক্ষের বৃদ্ধি বন্ধ হয় না। পাপ-পুণ্য যাকে বল—তা কিছুই নয়, সংস্কারমাত্র। এজন্য মন খারাপ করা, বৃথা অশান্তি ভোগ করা ঠিক নয়। স্বভাবে যাহা করায়ে নেবার করায়ে নেক্, যাহা হবার হ'য়ে যাক্। শুধু দেখে যাও। অশান্তি ভোগ কর কেন? যাহাই করনা কেন নিশ্চয় জেনো অবনতি হচ্ছে না—আত্মার ক্রমশঃ উন্নতিই হচ্ছে। সর্ব্বদা বিচার করে চল। ভিতরে যে সব সংস্কার রয়েছে, তার স্ফুরণ হবেই। কিন্তু তাই ব'লে আত্মার উন্নতি হচ্ছে না মনে ক'রো না। শম, সন্তোষ, বিচার

ও সঙ্কল্প দ্বারা আত্মার উন্নতি উপলব্ধি হয়। কাম ক্রোধাদিতে আত্মাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না। আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল।

আমি বলিলাম—আত্মার উন্নতি অবনতিতে আমার যায় আসে কি? লাভই বা কি? যদি আমি তাহা না বুঝিলাম। এখন আমার আত্মার উন্নতি তো আমার পক্ষে অন্যের উন্নতির মতই হইল। আমার যাহাতে কষ্ট অনুভব হয়, সেই ত্রিতাপের জ্বালা, তাহা দূর না হলে আমার উন্নতি বুঝি না।

আরে না! সেরে গেছে।

কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীধর আমার নিকটে বসিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন। আমার কথা শেষ হইতেই শ্রীধর খুব হাসিয়া হাতনাড়া দিয়া বলিলেন—'আরে না! ওসব কিছু না, সেরে গেছে।' শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—**কি শ্রীধর, কি বল্‌ছ?**

শ্রীধর বলিলেন—আমাদের দেশে এক কবিরত্ন ছিলেন। তিনি নাপিত, কবিরাজী কর্‌তেন। একদিন তিনি একটী জ্ব'রো রোগীকে দেখে বল্‌লেন—এ রোগ কিছুই না।—ঔষধ নেও—খাওয়াও। তিন দিনে রোগ সার্‌বে। চতুর্থ দিনে এসে আরোগ্য স্নান করাবো। বেশ ক'রে যোগাড় যন্ত্র রেখো। রোগী নিয়ম মত ঔষধ খেতে লাগলেন, কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হ'য়ে বিকারের অবস্থায় দাঁড়ালো। চতুর্থ দিনে ঘরে কান্নাকাটি আরম্ভ হলো। এসময়ে কবিরত্ন এসে বাড়ীর বাইরে থেকেই চীৎকার ক'রে বল্‌লেন—ওগো! যোগাড়যন্ত্র ঠিক আছে ত? আজ আরোগ্য স্নান করাবো। সকলে কবিরাজকে রোগীর পাশে নিয়ে বসালেন। রোগী তখন আবোল তাবোল বক্‌ছেন, কখনও বা একটু জ্ঞান হ'লে 'উঃ, আঃ প্রাণ গেল, প্রাণ গেল' চীৎকার কর্‌ছেন। কবিরত্ন সেদিকে গ্রাহ্য না করে তার হাত ধরে টেনে টেনে বল্‌তে লাগ্‌লেন—আরে না! সেরে গেছে। ওঠ্—আরোগ্যস্নান করাই। রোগী যতই বল্‌ছে—যন্ত্রণা আর সইতে পারি না—প্রাণ গেল, কবিরত্ন ততই বল্‌ছেন—আরে না! ওসব কিছু না। সেরে গেছে—ওঠ্ আরোগ্যস্নান করাই! শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিলেন,পরে বলিলেন—**সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য—এ সমস্তই সংস্কার। সংস্কার জিনিষটাই মিথ্যা। বিচার দ্বারা এটি বুঝে শান্ত হ'তে চেষ্টা কর।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম—এযে বিষম কথা। সংস্কার হইতেই ভোগের উৎপত্তি হয়।

ভোগ আরম্ভ হইলে বরং বিচার দ্বারা শান্ত হইলাম। কিন্তু ভোগ আরম্ভের পূর্ব্বে অন্তর্নিহিত সংস্কারের খোঁজ কিপ্রকারে পাইব? অজ্ঞাত সংস্কারের শান্তিই বা কি প্রকারে করিব? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভোগ যে সকল সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়—সেই সকল অজ্ঞাত সংস্কার কি প্রকারে ছাড়ানো যায়? ঠাকুর কহিলেন—**স্বভাবে যার যে সংস্কার আছে—তার সেটী প্রকাশ হবেই। তবে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌লে দেহ মন নির্ম্মল হয়, চিত্তও শুদ্ধ হয়। তখন দৈহিক, মানসিক কোন প্রকার সংস্কারই আর থাকে না।**

সঙ্কীর্ত্তনে ভারতীর সংজ্ঞালাভ।

একরামপুরে বিহারী মালাকারের ঠাকুরবাটীতে খুব কীর্ত্তনোৎসব চলিয়াছে। প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি সাধুরা তথায় গিয়াছেন। আশ্রম হইতেও গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ গিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরের নিকটে একজন আসিয়া বলিল—ভারতী মহাশয় ১২।১৪ ঘণ্টা যাবৎ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন—সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করা যায়?

ঠাকুর বলিলেন—**সঙ্কীর্ত্তন কর গিয়ে—জ্ঞান হবে এখন।**

ঠাকুরের কথামত সঙ্কীর্ত্তন করায়—তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইয়াছে। ভারতী মহাশয় আশ্রমে আসিলেন। আমরা সকলেই ভারতী মহাশয় প্রভৃতি সাধুদের সঙ্গে খুব আনন্দে আছি। বাহিরের কতকগুলি লোক আশ্রমে থাকায় প্রাণায়াম করার বড়ই অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু অভ্যাগত সাধুরা যে কয়দিন থাকেন, ঠাকুর খুব আদর-যত্ন করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন।

আকাশ-বৃত্তি সংরক্ষণে ঠাকুরের আদেশ। গুরুভ্রাতাদের অভদ্র আলোচনা—ঠাকুরের এক সঙ্গে ভোজন।

কোন দিন ভাণ্ডারশূন্য হইলেও সামান্য ধার-কর্জ্জ করিয়া কিছু বাজার-সওদা আনিবার যো নাই—ঠাকুর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন—**আমার আকাশবৃত্তি—ভগবান্ যেদিন যেমন দেন্ আমি তা'তেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু না দিলেও তাঁরই**

দয়া মনে করি। আপনারা কখনও আশ্রমের জন্য ধার কর্‌বেন না। শিশু, রোগী, গর্ভবতী ও নিতান্ত অশক্ত বৃদ্ধের জন্যই মাত্র ধার করা যায়। আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন—তাঁদের এই নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চলা উচিত।

ঠাকুরের অনুশাসন বাক্য শুনিয়া গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ অত্যন্ত দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়াছেন—কিছুদিন হয় তাহারা অতৃপ্তিকর আহারের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিরক্তিজনক আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা অভদ্র আলোচনার বিষ ঠাকুরের পবিত্র অঙ্গে ছড়াইয়া দিতেছেন। ঠাকুর নির্জ্জনে আহার করেন—তাঁহার আহার-সময়ে ঘরে দরজা বন্ধ থাকে, যোগজীবন ও কুতুবুড়ী ঠাকুরের ও মন্দিরের প্রসাদ পাইয়া থাকে। বুড়ো ঠাকুরুণ ও শান্তি প্রভৃতি কখন কি আহার করে, কেহ দেখিতে পায় না। ইহাতে পরিষ্কারই প্রমাণ হয় যে গোঁসায়ের ও গোঁসাই পরিবারের আহার এক প্রকার, আর আশ্রমে যাহারা থাকেন তাহাদের আহার অন্যপ্রকার হইয়া থাকে। ঠাকুরের টাকায় কেহ খায় না। যোগজীবনও রোজগার করিয়া টাকা আনে না। আশ্রমের খরচের জন্য গুরুভ্রাতারা যে যাহা দেন তাহাতে আশ্রমস্থ সকলেরই সমান অধিকার। ঐ টাকা বুড়ো ঠাকুরুণ হাতে নিয়া নিজ মতলবমত খরচ করেন কেন? এ সব লইয়া ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে বুড়ো ঠাকুরুনের সঙ্গে কাহারও কাহারও দুচার কথা বচসা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর ঠাকুর একদিন যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—যোগজীবন, মধ্যাহ্নে সকলের সঙ্গে চৌচালায় আমাকে খাবার দিস্‌। সেই হইতে দক্ষিণের চৌচালায় সকলের সঙ্গে ঠাকুর মধ্যাহ্নে আহার করিতেছেন। মধ্যাহ্নে আমার আহার নাই বলিয়া পরিবেশনের ভার আমারই উপর রহিয়াছে।

ভোজন দর্শনে দেবদেবীর আনন্দ।

আহারের সময়ে সকলের সঙ্গে ঠাকুরকে পরিবেশন করা যেমন অসুবিধা, ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া সকলের আহার করাও তেমনই অসুবিধা। এক মুঠা অন্ন আহার করিতে ঠাকুরের প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া যায়। ভাতের গ্রাস মুখে দিয়া কখন কখন ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। মুখের ভাত মুখেই পড়িয়া থাকে। সময়ে সময়ে কত কি বলেন—সব সময়ে সব কথা বুঝিতেও পারি না। আজ আহার করিতে করিতে সম্মুখের দরজা দিয়া উত্তর দিকে

৫

আকাশ পানে কতক্ষণ অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন, পরে আহা, কি সুন্দর! কি সুন্দর! বলিয়া চোখ পুঁছিয়া আবার ধীরে ধীরে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সুন্দর কি?

ঠাকুর বলিলেন—এই যে সব এসেছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি কত দেবদেবী ঋষিমুনি এসেছিলেন। দেখে কত আনন্দ ক'রে গেলেন।

আমি—কি দেখে তাঁরা আনন্দ ক'রে গেলেন?

ঠাকুর—তোমাদের আহার দেখে কত আনন্দ কর্‌লেন।

আমাদের লক্ষ্য।

আমি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের আহার দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আনন্দ করেন?

ঠাকুর বলিলেন—তা ক'র্‌বেন না? তোমরা কি সাধারণ? তোমাদের যিনি লক্ষ্য, তাঁর চারদিকে কত যোগী, কত ঋষি, কত দেবদেবী, কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত শিব রয়েছেন। সেই অনন্ত উন্নতির পথে কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি বৈকুণ্ঠাদি লোক বিন্দু হইতেও বিন্দু—কিছুই নয়। আমরা যাঁকে চাই—কোটি কোটি অবতার, কোটি কোটি * * * * ভক্ত ও পার্ষদগণ তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘুর্‌ছেন। সেই অন্তবিহীন, মহান্ পুরাণ পুরুষই আমাদের লক্ষ্য। অবিরাম সেই দিকেই আমরা চল্‌ব। সর্ব্বত্রই আমরা নিমন্ত্রণ খাব—আনন্দ কর্‌ব—কোথাও দাঁড়াব না—কারও নিন্দা-প্রশংসায় পড়্‌বো না,—পার্ষদ হ'লেই বা কি, কিছু না হ'লেই বা কি? কত ইন্দ্র চন্দ্র হ'লেন, গেলেন। হবেন, যাবেন। এই পথে কোথাও বদ্ধ হ'লেই বিপদ! বদ্ধ কোথাও হব না। একটু পরে আবার বলিলেন—এই সাধনপথে চল্‌লে ভগবানের অনন্ত বিভূতি, যাবতীয় লীলা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হ'তে থাকবে। নৌকায় চলার মত দুপাশে কতই দর্শন কর্‌বে। শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সর্ব্বত্রই প্রণাম কর্‌বে। আসক্ত কোথাও হবে না। আসক্ত হ'লেই সেখানে বদ্ধ

হ'য়ে পড়্বে। অগ্রসর না হ'লে নূতন নূতন দর্শন হয় না। নূতন কোন অবস্থাও লাভ হয় না।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্। আমি বিষম ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেলাম। সকলের আহার সমাপনের পর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিলাম—ঠাকুর এ কি বলিলেন—ঠাকুরের কথায় মনে হইল, সমস্ত লীলা এবং বিভূতির প্রকাশ ও অন্তর্দ্ধানের অতীত নামের প্রতিপাদ্য অজ্ঞাত মহান্ পুরুষই আমাদের লক্ষ্য। নিয়ত অপ্রতিহত-গতিশীল নামে স্থিতিই আমাদের অবস্থা; এই জন্য যে কোন অবস্থার কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি না কেন—তিনি প্রথমে নানা প্রকার উপদেশ ও ব্যবস্থার কথা বলিয়া শেষকালে বলিয়া থাকেন—শ্বাসে শ্বাসে নাম কর—নামেই সমস্ত লাভ হয়।

সাধনে আমার চেষ্টা ও নিষ্ফলতা

আমার চেষ্টায় কিছুই হবে না, দেখিতেছি। ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। যতই উৎসাহের সহিত এক একটা বিষয়ে নিযুক্ত হই—ততই যেন হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়ি। ঠাকুরের কোন একটি আদেশই আমি ঠিক্‌মত রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তিনি আমাকে নিয়ত পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখিতে বলিয়াছিলেন; এতকাল এক প্রকার চলিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তাহাতে আর তেমন মনোযোগ নাই। যতই এই বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত লাগি, ততই, জানি না কেন, নিষ্ফল হইয়া পড়ি। সকল বিষয়েই এই প্রকার দেখিতেছি। বাক্য-সংযমের জন্য একবৎসর যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি—এতকাল একপ্রকার ভালই চলিয়াছিল—কিন্তু কিছুকাল যাবৎ বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছি। আমি প্রতিদিন আসন ত্যাগ করার সময়ে সঙ্কল্প করিয়া উঠি—আজ আর কোন কথাই বলিব না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুই এক ঘণ্টা শেষ হইতে না হইতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়। অকস্মাৎ বা অজ্ঞাতসারেই যে সর্ব্বদা এই প্রকার হয়, তাহা নয়। জ্ঞাতসারেও বলার অদম্য প্রবৃত্তি রোধ করিতে অবসর পাই না। অভ্যাস দোষে একটি কথা বলিয়াই অমনি চুপ্ করি, অনুতাপ হয়—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আর বলিব না, কিন্তু একটু পরেই আবার বলিয়া ফেলি। প্রতি ঘণ্টায়ই চেষ্টা হইতেছে—প্রতিঘণ্টায়ই বিফল হইতেছি। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও ভুগিয়া মনে হইতেছে

১৭ই—২৫শে জ্যৈষ্ঠ

—এরূপ কেন হয়? আমার ইচ্ছা অনুসারে যখন আমার কার্য্য আমি করিতে পারিতেছি না তখন নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছার উপরে আর একটা ইচ্ছা রহিয়াছে। সে আমা অপেক্ষাও বলশালী। এখন ভিতর হইতে বারংবার এই ভাব উঠিতেছে যে, একান্তপ্রাণে কাতর হইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় না করিলে, তিনি দয়া করিয়া শক্তি না দিলে,—আমার সাধন ভজন ও সংযমের চেষ্টায় তাঁর আদেশ পালনে কখনও সমর্থ হইব না। গুরুদেব! একবার দয়া কর।

জিহ্বার লালসায় অসহ্য যন্ত্রণা।

এবার আমি বড়ই নিরুপায়ে পড়িলাম। লোভ-সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুর এতকাল তাঁর আদেশমত চলিতে আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন। সমস্ত দিনেরাত্রে গণ্ডূষমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া—অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে দেড় ছটাক পরিমাণ ডাল চাল সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি—কোন কষ্টই হইত না। আহারের কঠোরতায় দিন দিন আমার শারীরিক স্ফূর্ত্তি ও মানসিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছিল—হায়! কিছুকাল যাবৎ আমার এ কি দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে? 'লোভ আমার নাই'—এই প্রকার ভ্রান্তসংস্কারে মুগ্ধ হওয়াতে—ধীরে ধীরে সংযমচেষ্টার উপরে শিথিলতা আসিয়া পড়িল। 'ইহাতে আমার কি হইবে'—এই প্রকার ধারণায় গুরুবাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক অতি সামান্য সুস্বাদু বস্তুর রসাস্বাদন করিতে গিয়া এখন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**আহারের সময়েই খেও।** ঠাকুরের এই আদেশের উপরে 'প্রসাদ গ্রহণে দোষ নাই'—এই প্রকার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত করিয়া যখন তখন প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। এখন দেখিতেছি বালকেরাও যে সকল খাবার বস্তুতে অনায়াসে লোভ সংবরণ করিতে পারে, আমি তাহাও পারি না। সহজে না পাইলে চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা হয়। ভিতরের দুরবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইয়াও স্পৃহা ছাড়াইতে পারিতেছি না। কৃপালব্ধ অবস্থাকে স্বোপার্জ্জিত মনে করিলে যে দুর্দ্দশা ঘটে এখন আমার তাহাই ঘটিয়াছে। লোভসম্বরণের চেষ্টা একেবারে আসিতেছে না—ইচ্ছাপর্য্যন্ত জন্মিতেছে না। অথচ পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইতেছি। স্থির করিলাম—আমি আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিব। সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যদি আমার মতি বিরুদ্ধ দিকে ধাবিত হয়—তবে উহা প্রারব্ধবশেই হইল ভাবিয়া ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিব। আর যদি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই আমার চেষ্টা পণ্ড হয়—তাহা হইলে আক্ষেপের আর কি আছে? বরং বুদ্ধিকে সেই মতের অনুগামী করিয়া

নিশ্চিন্ত থাকিয়া আনন্দই করিব। গুরুদেব! কিছুই বুঝিতেছি না—দয়া করিয়া শুভমতি ও শক্তি দিয়া তুমি আমাকে রক্ষা কর। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত যে 'কিছুই' হয় না—যে কোন অবস্থায় ফেলিয়া তাহা আমাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দেও। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকি। ঠাকুর! আমি যে আর পারি না।

গুরুবাক্যের উপরে বিচার বুদ্ধি।

গুরুদেব আমাকে পদে পদে দেখাইতেছেন যে কোন ভাল অবস্থাই নিজের চেষ্টায় লাভ করা যায় না—এবং গুরুদত্ত কোন অবস্থাই নিজে চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে পারি না। এ সকল পুনঃ পুনঃ দেখিয়া শুনিয়া এবং বিচার বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়াও নিজের কর্তৃত্বাভিমান এক কণিকা ছাড়াইতে পারিতেছি না। নানাপ্রকার অবস্থায় ফেলিয়া দয়াল গুরুদেব, আমার যথার্থ প্রকৃতি আমাকে দেখাইতেছেন। এখন আমার অসংযত মনের মলিনতা, কুৎসিৎ চরিত্রের কলুষতা ও স্বভাবের নীচতাই যেন অস্তিত্বের ভিত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রবৃত্তি সকল গুরুদেবের ইচ্ছার প্রতিকূলে ধাবিত হইতেছে, প্রতীকারের কোন উপায় পাইতেছি না—কোনদিকেই কূল-কিনারা দেখিতেছি না। এতকাল অন্ধকার রাত্রিতে নির্জ্জনঘরে শয়নকালেও পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে মনে মনে দৃষ্টি রাখিয়াছি। হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে দেখিতাম ঘাড় বাঁকান এবং নজর পায়ের দিকে রহিয়াছে। আজ আমার সেই অবস্থা কোথায় গেল? গুরুদেবের আদেশের উপরে বুদ্ধি-প্রয়োগ না করিয়া—যতদিন অবিচারে অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—তাঁর কৃপায় খুব সহজেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু তাঁর আদেশের বা বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা নিজবুদ্ধি অনুসারে যখন বুঝিয়া লইলাম, পদাঙ্গুষ্ঠে নিয়ত দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্য স্ত্রীলোকদর্শন না করা—এইরূপ যখন সিদ্ধান্ত করিলাম; এবং গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা, ও তাঁর অভিপ্রায় বুঝিয়া সেইমত কার্য্য করা—এই দুয়ে কোন প্রভেদ নাই এইপ্রকার বুদ্ধি যখন আমার জন্মিল, তখনই আমার বিষম সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। স্ত্রীলোকদর্শন না করাই উদ্দেশ্য সুতরাং পদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখা অথবা পায়ের দিকে হেঁট-মস্তকে চাহিয়া থাকা—একই কথা, এইপ্রকার মনে করিয়া দৃষ্টি কিঞ্চিৎ বিস্তার করিতে ইচ্ছা হইল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহা বৃদ্ধি করিয়া স্ত্রীলোকের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন তাদের পা দেখিলেই গা দেখিতে ইচ্ছা হয়। হঠাৎ মুখে দৃষ্টি করিলে, বুকের কল্পনা আসিয়া পড়ে। আজকাল এ সকল ধ্যানেই আমার দিন কাটিয়া যাইতেছে; কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার

চেষ্টা আমার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে গুরুদেবের সহজ বাক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছি। গুরুদেব! এখন আমার উপায় কি?

অবসরমত সুবিধা পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—আপনি পদাঙ্গুষ্ঠে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে চলিতে বলিয়াছিলেন; আমি ভাবিলাম স্ত্রীলোক না দেখাই ঐ কথার তাৎপর্য্য; তাই সর্ব্বদা পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি না রাখিয়া অনেক সময়ে পায়ের দিকে মাটির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া চলি; আর দেহ, মন সুস্থ ও শুদ্ধ রাখিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক পরিমাণে স্বপাক আহার করিতে বলিয়াছেন এইরূপ ভাবিয়া অযাচিতরূপে লঘুপথ্য বস্তু কেহ দিলে গ্রহণ করি—ঠাকুর আমার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন—**তাতেই গোলে পড়েছ। ঠিক্ গুরুবাক্য মতেই চল্‌তে হয়। গুরুবাক্যের অর্থ বুঝা কি সহজ? গুরুবাক্য অনুসারে চল্‌লে ক্রমে ক্রমে তার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা যায়।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম গুরুগীতায় পড়িয়াছি—'মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং', সমস্ত মন্ত্রের বা শক্তির মূলই গুরুবাক্য অর্থাৎ গুরুশক্তি। গুরুবাক্য ধরিয়া চলিলে সাক্ষাৎভাবে গুরুর সহিত বা গুরুশক্তির সহিত সম্বন্ধ রাখা হয়। নিজে বিচার বুদ্ধি কল্পনা বা অনুমান দ্বারা একটা তাৎপর্য্য ঠিক করিয়া লইয়া সেই মত চলিলে, সাক্ষাৎভাবে গুরুর সহিত সম্বন্ধ রাখা হয় না। গুরুবাক্যই সার।

গায়ত্রীর মাহাত্ম্য। ঠাকুরের ফাঁড়া,—আসনই নিরাপদ।

প্রত্যহ প্রত্যুষে বুড়ীগঙ্গায় যাইয়া স্নান-তর্পণ করি। পরে নিজ আসনে আসিয়া হোমান্তে পাঠ সমাপন করিয়া নাম ও গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি। ঠাকুর গায়ত্রীজপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। গায়ত্রী জপে না কি ব্রহ্মণ্যকেই লাভ হয়। ভাবিলাম ব্রহ্মণ্যতেজে আমার প্রয়োজন কি? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—শ্বাসে শ্বাসে ইষ্টনাম জপে তো আরও বেশী উপকার; শুধু তা করিলে হয় না?

ঠাকুর কহিলেন—**গায়ত্রী জপও করো। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপে যে উপকার, গায়ত্রীজপেও তাই হবে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রীজপ অবশ্য কর্ত্তব্য।** আমি গায়ত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া নিতেছি। বেলা ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি। ঠাকুর এই সময়ে গ্রন্থসাহেব ও ভাগবতাদি পাঠ করেন।

১১টার পরে ঠাকুর শৌচে যান। পাতকুয়ার এক কলসী জলে গা ধুইয়া আসনে আসেন। তিলকসেবার পর দক্ষিণের চৌচালায় যাইয়া সকলের সঙ্গে আহার করেন। আহারান্তে আমতলায় ঠাকুরের আসন নেওয়া হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমতলায়ই বসিয়া থাকেন। ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত আমি মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাই। পরে ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়া নাম করিয়া কাটাই। ভিক্ষা, রান্না ও আহারাদিতে আমার দেড়ঘণ্টা সময় লাগে। ঠাকুর বহুবার বলিয়াছেন—**সাধনের জন্য রাত্রিই প্রশস্ত সময়।** কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি তাহা পারিলাম না। শ্রীধর উৎপাত করিলেই রাত্রি জাগরণ হয়। তখন বাধ্য হইয়া নাম করি। না হইলে হয় না। আজ সমাধি অবস্থায় ঠাকুর একটি বিষম কথা বলিলেন। শুনিয়া আমাদের সকলেরই হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া গিয়াছে—অদৃষ্টে কি আছে জানি না। আগামী ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনসঙ্কট ফাঁড়া। দেহরক্ষার সম্ভাবনা খুবই কম। মহাপুরুষেরা ঠাকুরকে সর্ব্বদা আসনে থাকিতে বলিয়াছেন। ঠাকুর আসনে থাকিলে মহাত্মারা দেহরক্ষার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে পারিবেন। ঠাকুর আসনে না থাকিলে তাঁদের কোন হাতই থাকিবে না। ঠাকুর বলিলেন—**প্রকৃতির গতিতে যাহা হয় হউক—এ বিষয়ে আমি কোন ইচ্ছাই রাখি না।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি বড়ই ক্লেশে সময় যাইতেছে। ঠাকুরের নিকটে সারাদিন রাত যাহাতে থাকিতে পারি সেরূপ চেষ্টা করিব স্থির করিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত গুরুভ্রাতারা অনেকে ঠাকুরের নিকটে থাকেন। স্থানাভাব বশতঃ যোগজীবন ঠাকুরের নিকটে পূবের ঘরে রাত্রে শয়ন করেন। উপস্থিত ঠাকুরের শরীর বেশ সুস্থই দেখিতেছি।

ঠাকুরের বৈষম্যভাব-কল্পনায় পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রম ত্যাগ।

কয়েকদিন হয় শ্রীধর ও পণ্ডিত মহাশয়ের জ্বর হইয়াছিল। ঠাকুর প্রত্যহই তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন শ্রীধর প্রবল জ্বরে ক্লেশসূচক শব্দ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর তাহার হাত দেখিয়া আসিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের জ্বরের একই প্রকার অবস্থা, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই জানিয়া তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের অভিমানে বড়ই আঘাত লাগিল। ঠাকুরের বৈষম্য ব্যবহার, এ সঙ্গে আর কখনও থাকিব না—স্থির করিয়া জ্বর আরোগ্যের পরই তিনি আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বিশ্বাস মহাশয়ও আশ্রমবাসের ক্লেশ, পুনঃ পুনঃ অভিমানে আঘাত এবং ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

শুনিলাম, তাঁহারা রাস্তায় নানা দুর্ভোগ ভুগিয়া, এখন গয়া আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানেই নাকি থাকিবেন। বাবাজি খুব সেবাপরায়ণ। কোন কষ্টই হইবে না। তিনি উঁহাদের পাহাড়ে থাকিয়া ভজন সাধনের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন, সকলে এইরূপ বলিলেন।

উঁহাদের সম্বন্ধে ঠাকুর কহিলেন—উঁহারা যদি সঙ্গত্যাগী হ'য়ে, কাহারও সেবা না নিয়ে উদাসীন ভাবে থাকেন, ভজন সাধন করেন, তাহলে এবার একটি ভাল অবস্থা লাভ কর্‌বেন। আর যদি দুজনে এক সঙ্গে থাকেন ও অন্যের সেবা গ্রহণ করেন, তা হলে আর সেটি হবে না।

সাধন কর। গুরুতে নির্ভর বহুদূর।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় গেলেন। আজ বড়ই গরম পড়িয়াছে।
২৬শে জ্যৈষ্ঠ
মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে নিজ হইতে আমাকে বলিতে লাগিলেন—লোকের গোলমালে সাধন হয় না বলে তুমি কুটীর কর্‌তে চেয়েছিলে। এখন দেখ আশ্রম বেশ নির্জ্জন হয়েছে—দিনরাত এখন খুব সাধন কর। সাধনের বিষয় কাহাকেও কিছু ব'ল না। সাধনের বিরুদ্ধ কথাও কারো মুখে শু'ন না। কোন দিকে দৃষ্টি না ক'রে খুব দৃঢ়তার সহিত নিজের কাজ নিজে করে যাও। এখন হ'তে তিতিক্ষাটি বেশ করে অভ্যাস করে নেও। বেশ উপকার পাবে। আহার মাত্র একবারই কর্‌বে। আহারের মাত্রা ও কাল সর্ব্বদাই ঠিক রাখ্‌বে। এই দুটি ঠিক থাক্‌লে কোন অসুখই হবে না। এক তরকারী ভাত অভ্যাস হলে শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাবে। ওটি অভ্যাস হলে নুন দিয়ে জলভাত খাবে। ক্রমে ক্রমে নুন ত্যাগ কর্‌বে। পরে জল রুটি খেতে পার। আহার বিষয়ে খুব সংযত হবে। মানসিক অধিকাংশ বিকার, চঞ্চলতা ও অস্থিরতা শরীরের দরুণ হয়। যে প্রকার আহার গ্রহণ করা যায়, রক্তও সেই প্রকার হয়। মনটিও তদনুরূপই হয়ে থাকে। শুধু জলভাত আহার অভ্যস্ত হলে, দেখ্‌বে শরীর মন কেমন সুস্থ থাকে। আহারের মাত্রা ও

সময় ঠিক রাখা বড় সহজ নয়। সময় ঠিক থাক্‌লেও মাত্রা গোলমেলে হয়ে যায়। তীর্থভ্রমণের কালে কোথায় কি জোটে বলা যায় না। বেশী পেলে পরিমাণ মত নেওয়া যায়, কম জুট্‌লেই মুস্কিল। তীর্থ-পর্য্যটন জমাতের সঙ্গে মিশেই ভাল। রাস্তায় বিস্তর প্রলোভন ও ভয় আছে। জমাতে থাক্‌লে সে সকল উৎপাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়। জমাতে যে সকল সাধুরা থাকেন তাঁদের সাধন ভজন, আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে নাই। যিনি ভজন স্থানে অশান্তি করেন, তিনি সেখানে টিক্‌তে পারেন না; স'রে পড়্‌তে হয়। সাধন না ক'রে কেবল 'গুরু কর্‌বেন' 'গুরু কর্‌বেন' বল্‌লে কিছু হবে না। গুরুকে বিশ্বাস করে, এই সাধনের ভিতরে এমন একটী লোকও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। গুরুকে বিশ্বাস করা কি সহজ? যিনি গুরুকে বিশ্বাস করেন, তিনি ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্‌তে পারেন। যতকাল অহঙ্কার আছে, পুরুষকার আছে, ততকাল 'গুরু কর্‌বেন' বল্‌লে চল্‌বে না। নিজেরা খাট। নিজেরা না খাট্‌লে কিছুই হবে না। কেহ সাধ্যমত খাট্‌লেই গুরু তাঁকে সাহায্য করেন। গুরুর বাক্যই গুরু। গুরু যাহা ব'লে দেন, তাহা কর্‌লেই গুরুর কৃপা লাভ করা যায়।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর, তা হলেই মহাত্মারা তোমাদের মুক্তি দিতে দায়ী। আর তাঁদের আদেশমত যদি কিছুই না কর—তা হলে আর কি হবে? সর্ব্বদা খুব সাধন কর—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর—সমস্তই লাভ হবে—অভাব কিছুই থাক্‌বে না।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কি ভাবে চলিব—
নানা প্রশ্ন ও উপদেশ।

আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর ঠাকুর আমতলায় গেলেন না। পূবের ঘরে নিজ আসনে বসিয়া রহিলেন। মহাভারত পাঠের পর মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কখন দেহত্যাগ করেন কিছুই তো নিশ্চয় নাই। এর পর কি কর্‌বো? তখন তো

২৭শে—২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

একেবারে একলা পড়্‌বো, কি যে হবে জানি না। সে দিন রাত্রে বল্‌লেন—কামভাব থাক্‌লে বিবাহ ক'রে তাড়াতাড়ি ভোগ শেষ ক'রে নেওয়া ভাল। পূর্ব্বে আমাকে তিনবার বলেছেন—তোমার আর গৃহস্থি কর্‌তে হবে না। আপনার সেই বাক্য কি অন্যথা হবে?

ঠাকুর কহিলেন—কেন, তোমার কি বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা হয়?

আমি—আমার ঐ কথা শুন্‌লেও ভয় হয়। ওরূপ ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই—তবে কাম ভাব যখন রয়েছে—তখন সাময়িক উত্তেজনায় কুইচ্ছা একেবারে যে হয় না—তাওনা। স্ত্রীসঙ্গে কিন্তু আমার খুব অশ্রদ্ধাও আছে।

ঠাকুর বলিলেন—না, তোমার আর ঘর-গৃহস্থালী হবে না। এ সব সাময়িক উত্তেজনা বা ইচ্ছা কিছুই নয়। এ সব যাবে। স্ত্রীসঙ্গে অশ্রদ্ধা থাক্‌লে আর কোন কথাই নাই। আর আমার দেহত্যাগ হ'লেই বা কি? যা ব'লে দেওয়া হয় তা কর্‌লেই আর অভাব থাক্‌বে না। ও সব কথা মনে রাখ্‌লেই হবে। তিন বৎসর জল-ভাত খেয়ে অভ্যস্ত হলে, শুধু শাক সিদ্ধ ক'রে খেও। ব্রহ্মচর্য্যে সত্য, অহিংসা ও বীর্য্যধারণই প্রধান সাধন। আর নাম খুব কর্‌বে। ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্য হ'য়ে গেলে মনের গতি কোন দিকে যায় বুঝ্‌বে। তখন যদি বিবাহ কর্‌তে একেবারে ইচ্ছা না হয়, তবে গৈরিক ও কৌপিন নিয়ে তীর্থ পর্য্যটন কর্‌বে। জগন্নাথ হয়ে ক্রমে চারধাম পর্য্যটন কর্‌বে। অর্থ কাহারও নিকটে চাইবে না। এ বিষয়ে খুব সাবধান থাক্‌বে। খেয়া ঘাটে গিয়ে মাঝিকে পার কর্‌তে প্রার্থনা কর্‌বে। না কর্‌লে সেখানে ব'সে পড়্‌বে। তীর্থ পর্য্যটনে তেমন ইচ্ছা না হলে যতদূর পার ততদূরই কর্‌বে। তীর্থে গিয়ে সঙ্কল্প ক'রে তুমি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কিছুই কর্‌বে না। নিত্য ক্রিয়া মাত্র কর্‌বে। ঠাকুরদর্শন, সাধুসঙ্গ, স্নানাদি কর্‌বে। যত দিন আছ, হোমটি ত্যাগ ক'রো না। অন্যান্য মালা রাখ বা না রাখ, রুদ্রাক্ষ চিরকাল ধারণ করো। উপবীত ত্যাগ ক'রো না। তীর্থ পর্য্যটন হয়ে গেলে একটা স্থানে আসন ক'রে বসো। কাশীতেই ভাল। ব্রহ্মচর্য্যে যেমন সত্য, অহিংসা ও বীর্য্যধারণ প্রধান সাধন, সন্ন্যাসে সেই প্রকার বাসনা ত্যাগ ও সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ

উদ্দেশ্য। বাসনাটি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেই এবার পাড়ি দিলে। নিন্দা প্রশংসাতে মনকে যখন স্পর্শ কর্‌বে না, তখনই বুঝ্‌বে বাসনা নষ্ট হয়েছে। এ সকল কথা মনে রেখে চ'লো—তাহলেই আর কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—চিরকালই কি ভিক্ষা করিয়া আমায় খাইতে হইবে?

ঠাকুর—ভিক্ষা কিছু কথা নয়। অযাচিত ভাবে যাহা পাবে তাহাই নিবে। শারীরিক পরিশ্রমের জন্য ভিক্ষা। একটা স্থানে ব'সে পড়্‌লে, যে যাহা দিবে তাহাই গ্রহণ কর্‌বে—তাতে দোষ নাই। একটী কথা মনে রে'খো—কামিনী কাঞ্চন বিষয়ে সর্ব্বদাই খুব সাবধান থাক্‌বে। আত্মীয়ই হউক—আর পরই হউক, স্ত্রীলোক কাছে ঘেস্‌তে দিবে না। আর নিজের কাছে কখনও অর্থ রেখো না। এ কথা কয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রেখো। অর্থ ও স্ত্রীলোক বড়ই ভয়ানক।

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকে আসক্তি ও অর্থে আসক্তি—এর মধ্যে কোন্‌টি অধিক অনিষ্টকর?

ঠাকুর একটু থামিয়া বলিলেন—আসক্তি সর্ব্বত্রই অনিষ্টকর। তবে স্ত্রীলোকে আসক্তি অপেক্ষাও অর্থে আসক্তি অধিক অনিষ্টকর। সম্ভোগে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে আসক্তি কমে। এমনিও সহজে কাটান যায়, কিন্তু অর্থে আসক্তি জন্মিলে কাটান সহজ নয়। অর্থ যতই পাওনা কেন তৃপ্তি হয় না। যত পাবে ততই আরও পাইতে ইচ্ছা হয়।

ব্রহ্মচর্য্য সফল হইল কখন বুঝিব? তীর্থের প্রয়োজনীয়তা কতক্ষণ? ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর কি ভাবে চল্‌লে তাঁর দর্শন পাইব?

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার

আজও ঠাকুর মধ্যাহ্নে আহারান্তে পূবের ঘরে নিজ আসনে রহিলেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকটে কেহই থাকে না। কখন কখন শান্তি, কুতু, বুড়ো ঠাকরুণ ও গেণ্ডারিয়ার মেয়েরা আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া যান। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রহ্মচর্য্য আমার সফল হইল কখন বুঝিব?

ঠাকুর কহিলেন—স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ে কল্পনাও যখন একেবারে মনে আস্‌বে না, স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য যখন মনে হবে, তখনই ব্রহ্মচর্য্য ঠিক হলো বুঝ্‌বে।

এই অবস্থা যদি আমার দশ বৎসরের পূর্ব্বেই লাভ হয়, তাহলে তখন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিব কিনা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—হাঁ। তা পার্‌বে। আমি বলিলাম—ভিক্ষাতে যে সর্ব্বত্র আতপ চাউলই জুটিবে বলা যায় না। সিদ্ধ চাউল দিলে তাহা গ্রহণ করা যায়?

ঠাকুর কহিলেন—ভিক্ষান্নে দোষ নাই। উহা সর্ব্বদাই পবিত্র। সিদ্ধ চাউলই নিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাকে চিরকাল হোম কর্‌তে বলেছেন, কিন্তু এমন সময়ও তো হ'তে পারে যখন হোম করার সুবিধা হলো না- হোমের ঘৃত, বেলপাতা কিছুই যদি না পাই?

ঠাকুর বলিলেন-হোম করার সুবিধা না হলে আর কি কর্‌বে? তা না কর্‌লে কোন ক্ষতি হবে না। ঘি, বেলপাতা না জোটে—নাই বা জুট্‌ল। যে কোন ফল, ফুল, পাতা বা খাবার পবিত্র বস্তু মন্ত্রপূত ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিবে। অগ্নি প্রজ্বলিত করে যে কোন বস্তু দ্বারা হোম কর্‌বে। প্রত্যহ অগ্নি সেবা চাই।

আমি—তীর্থ পর্য্যটনের ফল কি? তীর্থ পর্য্যটনের প্রয়োজন সিদ্ধ হলো, কখন বুঝ্‌বো?

ঠাকুর বলিলেন—যখন আর তীর্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্তি থাক্‌বেনা। যখন নিজের হৃদয়কেই পবিত্র তীর্থ ব'লে মনে হবে, তখন আর তীর্থ পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই। তখন একটা স্থানে বসে পড়্‌লেই হলো।

আমি—তীর্থ-পর্য্যটনের পরে কাশীতে থাক্‌তে বলেছেন, যদি পাহাড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়?

ঠাকুর—তাহ'লে ত খুব ভালই হয়। তোমার মত বয়সে যদি এই সাধন পেতাম, তা হলে কি আর এসব স্থানে থাকি? তাহ'লে নিশ্চয়ই কোন পাহাড় পর্ব্বতে গিয়ে থাক্‌তাম। এখন আর সে যো নাই। পাহাড়ে যদি থাক, তাহলে গ্রীষ্মের সময়ে বদরিকা আশ্রমে আর শীতের সময় হৃষীকেশে থেকো। ঐ সকল স্থানে আহারের কোন অসুবিধা নাই। প্রচুর পরিমাণে তোমার আহার পাহাড়েই জুটবে। অনেক রকম সুখাদ্য ফল আছে—তা

খেয়ে অনায়াসে থাকা যায়। তা ভিন্ন বৌদ্ধদের অনেক মঠ আছে। তাঁরা বড় দয়াল; খুব অতিথি সেবা করেন। ওসব স্থানে থাকার কোন অসুবিধা নাই।

ঠাকুরের এসকল কথা শুনিয়া কহিলাম—অনেক দিন যাবৎ একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে খুব ইচ্ছা হইতেছে—কিন্তু সাহস পাইতেছি না।

ঠাকুর আমার কথা শেস না হইতে বলিলেন—কেন? বলনা, বল।

আমি কহিলাম—এরপরে কিভাবে চল্‌লে আপনাকে দেখ্‌তে পাব, কি ভাবে চল্‌লে আপনার অভাব আমার কখনও ভোগ কর্‌তে হবে না, জান্‌তে ইচ্ছা হয়। তখন যে কি কর্‌বো ভেবে পাই না।

ঠাকুর বলিলেন—দেহত্যাগ হ'লেই বা কি? যাহা তোমাকে বলা গিয়াছে তাহা ক'রো, তবেই আর অভাব থাক্‌বে না। সে সময়ে আরও যেখানে সেখানে সর্ব্বদা খুব ঘন ঘন দেখ্‌তে পাবে।

ঠাকুরকে খুব কাতর ভাবে বলিলাম—আমি অন্য কিছুই চাই না। মুক্তি কি তা চাই না। মুক্তি কি তা আমি জানি না। সেজন্য আমার আগ্রহও নাই। আপনার অভাব যেন আমার সহ্য কর্ত্তে না হয়—শুধু এই চাই। আপনার আদেশ মত চল্‌তে পার্‌বো কিনা জানিনা—তবে, চেষ্টা কর্‌বো নিশ্চয়। যদি ইচ্ছা করে বা আলস্য করে আদেশ মত না চলি, তবে যত রকম শাস্তি আপনার ইচ্ছা আমাকে দিবেন; কিন্তু ঠিকমত চল্‌তে পারি আর নাই পারি—যদি চেষ্টা করি, তাহলেই আপনি আমাকে দয়া কর্‌বেন?

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, তাই। পার আর নাই পার, চেষ্টা কর্‌লেই হলো। তা'হলেই আর অভাব থাক্‌বে না, নিশ্চয় জেনো।

আমি—শুনতে পাই মায়িক রূপও নাকি দেখা যায়—তাহ'লে খাঁটী রূপ ও মায়িক রূপ কি প্রকারে বুঝ্‌ব?

ঠাকুর কহিলেন—যাহা যখন দর্শন হবে—তখনই তার বিশেষ সম্মান কর্‌বে, ভক্তি কর্‌বে। দর্শনের সময়ে ওসব কিছু মনে করো না। খুব ভক্তি ক'রো, কোন প্রকার সন্দেহ মনে এন না। আর কারও নিকট কিছু প্রার্থনা করো না। নিজ হতে যিনি যাহা ক'রে যান—তাহাই ভাল। প্রার্থনা কর্‌লেই অনিষ্ট হয়ে থাকে। একথা সর্ব্বদা মনে রেখো।

আমার পাপে ঠাকুরের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত।

বিধির বিপাকে অনুদয়ে আজ বূড়ীগঙ্গায় স্নান হইল না। বেলা প্রায় ৮টার সময়ে সনাতন বাবুর বাগান বাড়ীতে স্নান করিতে গেলাম। বাঁধান ঘাটের

আষাঢ় ৬ই পর্য্যন্ত।

সিঁড়ির উপরে কাপড় রাখিয়া একেবারে গলাজলে নামিয়া পড়িলাম। ডুব দিয়া যেমন মাথা তুলিয়াছি, ছোটপুকুরের অপর পারে পরমাসুন্দরী তিনটী স্ত্রীলোক অকস্মাৎ আমার চোখে পড়িল। সকলেই একবয়সী তরুণ-যুবতী। দৃষ্টিমাত্রে কেমন যেন হইয়া গেলাম। চমকে পড়িয়া তন্মুহূর্ত্তে চোখ ফিরাইতে ভুলিয়া গেলাম, যুবতীরা চঞ্চলভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে বস্ত্রবিপর্য্যস্ত করিয়া ঘন ঘন আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের অসামান্য রূপের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, হৃৎপিণ্ড আমার দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। অমনি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে অতিকষ্টে সংযত করিয়া দ্রুতপদে আশ্রমে আসিলাম। নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বেলা প্রায় দশটার সময়ে ঠাকুরের ঘরে গিয়া বসিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন—ধীরে ধীরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—

গয়ার পাহাড়ের নিকট ৪ জন ব্রহ্মচারী, সকলেই পাহাড়ে উঠ্‌ছেন। দৃষ্টি পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে। পশ্চাতে এক ব্যক্তি বেতহাতে। ব্রহ্মচারীরা পদাঙ্গুষ্ঠ ছেড়ে দৃষ্টি কর্‌লেই চটাপট বেত। জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন—উঁহারা চতুঃসন—সনকাদি ঋষি, যোগ-পন্থার প্রথম প্রবর্ত্তক; যোগ শিক্ষা দেন। যাহা শিক্ষা দেন, নিজেরা না কর্‌লে বেত খান; শিষ্যেরা না কর্‌লেও বেতখান। পিছনে থেকে নারদ বেত মারেন। গুরুগিরি কি ভয়ানক? বাবা! আমি কারও গুরু নই। পরমহংসজীই গুরু। তাঁকে আর কে বেত মার্‌বে? তিনি যে ব্রহ্মে যুক্ত—স্বয়ং ব্রহ্ম। তিনিই সব কর্‌ছেন, আমি কিছুই নই। তিনিই সব। তিনি সবই দেখ্‌ছেন—যে যা কর সব দেখ্‌ছেন। ভালও দেখ্‌ছেন, মন্দও দেখ্‌ছেন। ফাঁকি দেওয়ার যো নাই। গুরু সমস্তই জানেন। সাবধান!

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। লজ্জা ও ত্রাসে বিষম ক্লেশ হইতে লাগিল। ধ্যানভঙ্গের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শিষ্যের অপরাধে গুরুকে বেত খেতে হয়? ঠাকুর আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া ইঙ্গিতে পিঠ দেখিতে বলিলেন;

এবং মমতাপূর্ণ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বসা অবস্থায়ই একবার মাত্র পাশ হইতে তাকাইলাম—যাহা দেখিলাম—আর পারিলাম না। ঠাকুর আমাকে কোন দণ্ডই দিলেন না; একটী শাসন বাক্যও বলিলেন না। এমন কি, আমার গুরুতর অপরাধের বিষয় তিনি জানেন, আভাসেও এরূপ কিছু প্রকাশ করিলেন না। শিষ্যের উৎকট অপরাধের তীব্র ভোগ গুরু গ্রহণ করিয়া নীরবে ভোগ করিলে, শিষ্যের পক্ষে উহা কিরূপ শাসন তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। অসহ্য যন্ত্রণায় সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম।

শিষ্যকে অভয় দান। তোমার হয়ে আমি ভুগ্‌ব।

ঠাকুরের আশ্চর্য্য দয়া ও অসাধারণ সহানুভূতির ফলে, একটি গণ্যমান্য অবস্থাপন্ন গুরুভ্রাতার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। গুরুভ্রাতাটি বড়ই নির্ভীক, একগুঁয়ে এবং সরল প্রকৃতি। একদিন মনোদুঃখে অভিমানপূর্ব্বক অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরকে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন—"গোঁসাই! আপনার এ সাধন আপনি ফিরিয়ে নিন। আমি এ সাধন কর্‌তে পার্‌ব না।"

ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন—কেন কি হয়েছে?

গুরুভ্রাতা—হবে কি মশাই? এ সাধন কি কখন আমরা কর্‌তে পারি? আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে, সমাজ আছে, দশটা বড়লোকের সঙ্গে সদ্ভাব, আত্মীয়তা রক্ষা করে আমাদের চল্‌তে হয়। আমরা কি এ সাধনের নিয়ম রক্ষা করে চল্‌তে পারি?

ঠাকুর—শুধু মদ, মাংস, উচ্ছিষ্ট মাত্র খেতে নিষেধ। এ ছাড়া বিশেষ আর নিয়ম কি আছে? মাংস, মদ না খেয়ে পার্‌বে না?

গুরুভ্রাতা—মশাই মদ, মাংস চিরটা কাল খেয়ে এলাম। ওসব না খেলে আর খাব কি? আজ কাল ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা রাখ্‌তে হলেই ওসব খেতে হয়। আমাদের সমাজ আছে, দশ বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে হয়। ঘরেই ত উচ্ছিষ্ট বিচার চলে না, সমাজে উচ্ছিষ্ট-বিচার রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব।

ঠাকুর—আচ্ছা, একটু চেষ্টা ক'রো; তারপর না পার্‌লে আর কি কর্‌বে?

গুরুভ্রাতা—আজ্ঞে ও কথা আমাকে বল্‌বেন না। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌তে পার্‌ব না। ও বিষয়ে আমার কোন চেষ্টাই আসে না। কর্‌ব কোত্থেকে?

ঠাকুর—ভালো, নাম তো কর্‌তে পার্‌বে? তা হ'লেই হবে।

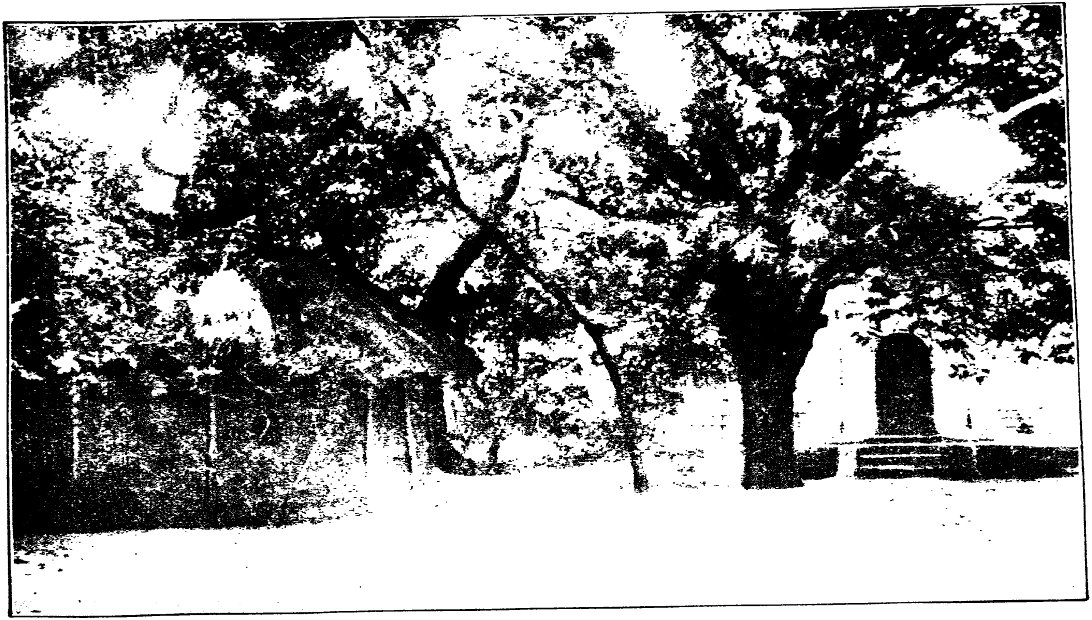
গুরুভ্রাতা—গোঁসাই! নাম করব কি? ও তো মনেই থাকে না।

ঠাকুর—বেশ, তুমি এক কাজ করো। ঐ সময়ে আমাকে স্মরণ করো। আর এটি জেনে রেখো, তুমি যাহা কিছু অপরাধ কর্‌বে, তার দণ্ড সব আমি ভোগ করব। তোমার অপরাধের জন্য তোমাকে আর ভুগ্‌তে হবে না।

ঠাকুর গদ্‌গদ কণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়া ছলছল চক্ষে উহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন। তখন গুরুভ্রাতাটি হঠাৎ যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া ঠাকুরের পায়ের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রভো! আমার অপরাধের দণ্ড আপনি ভুগ্‌বেন? আমার এ প্রাণও যদি যায়—আজ থেকে আর আপনার আদেশ লঙ্ঘন কর্‌ব না। এই বলিয়া গুরুভ্রাতাটি ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। এখন দেখিতেছি, তাঁর অদ্ভূত পরিবর্ত্তন। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে ঠাকুরের বিষয়ে আলাপ করার সময়ে তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান; এবং আক্ষেপ করিয়া প্রায়ই বলেন, ঠাকুর আমাকে স্বর্য্যের ষাঁড় করে ছেড়ে দিয়েছেন—আর আমার অপরাধের শাস্তি সব তিনিই ভুগ্‌ছেন; আমার প্রতি তাঁর এ দয়ার কি সীমা আছে?

ঝড়বৃষ্টিতে আসনে স্থির।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। ঝড় তুফানের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর ধ্যানস্থ। শ্রীধর ও অশ্বিনীকে লইয়া ঠাকুরের মস্তকে ও দুইপাশে ছাতা ধরিয়া রহিলাম। কোনও প্রকারেই ঠাকুরকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমরাও ভিজিয়া গেলাম। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। জলের ধারায় কাদার উপরে আসন খানা উল্টাইয়া ফেলিলেন এবং পায়ের দ্বারা উহা রগ্‌ড়াইতে লাগিলেন। তৎপরে পূবের ঘরে যাইয়া গা পুছিয়া বসন ত্যাগান্তে নিজ আসনে বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বৃষ্টির আরম্ভে ঘরে আসিলে আর এভাবে ভিজিতে হইত না। মৃগচর্ম্মখানাও নষ্ট হইত না। ঠাকুর কহিলেন—আসনে বস্‌লে কি আর সব সময়ে আসা যায়?



মাঠাকুরাণীর (শ্রীশ্রীমতি যোগমায়া দেবী) সমাধি মন্দির
সেই আম্রবৃক্ষ যাহা হইতে মধুক্ষরণ ও রক্তপাত হইয়াছিল
গোস্বামী প্রভুর সাধন-কুটীর

কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অবস্থা আসে। কখনও কখনও নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ হয়। ঐসময়ে আসনটী ত্যাগ করলে সে অবস্থাটী হারাতে হয়। এজন্য মৃত্যু স্বীকার ক'রেও মহাত্মারা আসন ত্যাগ করেন না—আসনে স্থির থাকেন।

কৃষ্ণসার মৃগের উৎকৃষ্ট চর্ম্মখানা ঠাকুর আজ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন—বড়ই দুঃখ হইল। উহা বুড়ীগঙ্গায় দিতে বলিলেন। বহুক্ষণ আজ ঠাকুর বৃষ্টিতে ভিজিলেন। আজ সমস্ত দিনই থাকিয়া থাকিয়া জল হইল।

ঠাকুরের ভজনস্থান, আম্রবৃক্ষে মধুক্ষরণ।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার—মেঘের লেশমাত্র নাই, খুব রৌদ্র উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারত শ্রবণান্তে বেলা প্রায় ২ টার সময়ে ঠাকুর বলিলেন—**আমগাছ হ'তে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে—দেখ্‌তে পাচ্ছ?** আমি হেঁট মস্তকে থাকি বলিয়া ওদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। ঠাকুর বলামাত্র একটু মাথা তুলিয়া দেখি, গাছ হইতে অবিশ্রান্ত শিশির-বিন্দুর মত কি যেন পড়িতেছে। আমতলার শুষ্ক তৃণপত্র ও তুলসী গাছগুলি তেলপানা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের রোয়াকে ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দুর মত মধু পড়িয়া ভিজিয়া রহিয়াছে। তাহাতে বিস্তর ডেয়ে, পিঁপড়া প্রভৃতি আসিয়া জড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য মধুমক্ষিকা গুণ গুণ করিয়া ঘুরিতেছে। একপ্রকার সদ্গন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। ঠাকুর আবার বলিলেন—**কি, মধু ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌ছ?** এ সময়ে শ্রীধর ও অশ্বিনী আসিয়া পড়িলেন; তাহারা দু তিনটী শুষ্কপত্র চাটিতে চাটিতে বলিলেন—বাঃ, এতো বেশ মিষ্টি; মধুই বটে। আমার তেমন বিশ্বাস হইল না। আমি বৃক্ষের নিম্ন শাখার দুটী পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, ঠাকুর শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—**উঃ কি কচ্ছ? ওভাবে পাতা ছিঁড়্‌তে আছে?** আমি পাতা দুইটী হাতে লইয়া দেখিলাম—ঠিক যেন তরল আঠা মাখানো রহিয়াছে। চাটিয়া দেখিলাম খুব মিষ্টি। তখন আশ্রমস্থ দশবারজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া দিলাম। সকলেই আমপাতার মধুর স্বাদ পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমগাছে এরূপ মধু পড়ে নাকি?

ঠাকুর বলিলেন—**শুধু আমগাছ কেন? যে সব বৃক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার**

সহিত হোম, যাগ, যজ্ঞ, সাধন ভজন, তপস্যা হয়, অথবা যে সকল বৃক্ষের নীচে মহাত্মা মহাপুরুষদের আসন থাকে, সে সব বৃক্ষ মধুময় হয়ে যায়। সময়ে সময়ে সে সব বৃক্ষে মধু ক্ষরণ করে। খুব ভক্তির সহিত পূজা কর্‌লে জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধুপোকা পড়্‌ছে উঠ্‌ছে দেখে সন্দেহ হল। জল একটু খেয়ে দেখ্‌লাম, মিষ্টি-মধুর গন্ধ। বহুপ্রাচীন নিমগাছ, তেঁতুলগাছ দেখেছি, তা থেকে ঝরণার মত মধু পড়ে। কমণ্ডলু ভরে খেয়েছি—পরে অনুসন্ধানে জেনেছি—ওসব বৃক্ষের তলায় কোন সিদ্ধপুরুষের বা মহাপুরুষের আসন ছিল। এই বলিয়া ঠাকুর একটী বেদের বচন বলিলেন—

* ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ ওঁ মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতি র্মম্মাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

অনেকদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি, আসনের বৃক্ষটীর গায়ে বহু দেবদেবীর চিত্র পড়িতেছে। ভাবিয়াছিলাম ওসব ভাবুকতার কথা; আজ ঠাকুরের নিকটে দাঁড়াইয়া বৃক্ষটীকে ভাল করিয়া দেখিলাম। সুগোল, স্থূল, প্রাচীন বৃক্ষটী পাঁচ ছয় হাত ঊর্দ্ধদিকে সরলভাবে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে সমানায়তনে বিস্তারলাভ করিয়াছে। উহার শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লবাদি সমস্তই দেখিতে পরমসুন্দর, সতেজ ও জীবন্ত। বৃক্ষের গায়ে ছোট বড় নানা রকমের চটা উঠিয়া স্থানে স্থানে ওঁকার ও বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়েও বৃক্ষতলা উত্তপ্ত হয় না; উদয়াস্ত শীতল ছায়া রহিয়াছে। একটু বসিলেই শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়; মন প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। আম্র-বৃক্ষের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে ঠাকুরের আসন। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুই পাশে সুন্দর সুন্দর নয়ন স্নিগ্ধকর তুলসী বৃক্ষ। সম্মুখে ধুনীর কুণ্ড। আসনের ১৫।২০ হাত অন্তরে দক্ষিণদিকে পরিষ্কার পুষ্করিণী থাকায় বায়ুর স্বচ্ছন্দ গতি। পূর্ব্বদিকে অঙ্গনের পূর্ব্বধারে ছোট ছোট কাঁটা

---

* বায়ু মধু বহন করুন। সমুদ্র সকল মধু ক্ষরণ করুন। আমাদের ধান্যাদি ওষধি সমূহ মধুপূর্ণ শস্য প্রদান করুন। রাত্রি সকল মধুরূপ হউক। ঊষা সকল মধু যুক্ত হউক। পার্থিব ধূলি সমূহ মধু পূর্ণ হউক। আকাশ মধুময় হউক। আমাদের পিতৃগণ মধুযুক্ত হউন। আমাদের বনস্পতি সমূহ মধুফল প্রসব করুক। সূর্য্য মধুময় হউক। আমাদের ধেনুগণ মধুময়দুগ্ধবতী হউক।

গাছের ও লতার বেড়া ; দেখিতে বড়ই মনোরম। সারাদিনই এই স্থানটী নীরব নিস্তব্ধ, পাখীর কলরব ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। অপরাহ্নে গুরুভ্রাতারা ও দর্শনার্থীরা আসিয়া উপস্থিত হইলে ঠাকুরের সঙ্গে এখানে দেখা সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হয়। মধুময় বৃক্ষ জীবনে আর কখনও দেখি নাই- গাছের সমস্ত গুলি পাতা যেন জল দিয়া ধুইয়া রাখিয়াছে— অবিশ্রান্ত উহা হইতে কোয়াসার মত মধুক্ষরণ হইতেছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য।

কুস্বপ্ন—তার হেতু।

৮ই আষাঢ়।

গত রাত্রি আমার এক বিষম রাত্রি গিয়াছে। দুটীবার কুস্বপ্নে আমাকে কাতর ও কলুষিত করিয়াছে। শরীর আজ নিস্তেজ, অবসন্ন—মনটীও অবসাদ-গ্রস্ত, উদ্বেগপূর্ণ। কোন প্রকারে স্নান তর্পণ ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলাম। ঠাকুরের নিকটে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। শিরঃপীড়ায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলাম। আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইতি মধ্যে এমন কি অনিয়ম করিয়াছি, যাহার ফলে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে? মিষ্টি খাইতে আমার নিষেধ সত্ত্বেও পরশ্বদিন লোভে পড়িয়া কতকগুলি আম ও কাঁঠাল খাইয়াছিলাম। গত কল্য ঝড় বৃষ্টিতে বেলা ঠিক না পাইয়া রাত্রিকালে রান্না করিয়া আহার করিয়াছি। ইহা ছাড়া আর একটী অজ্ঞাত অত্যাচারও ঘটিয়াছে—গতকল্য অপরাহ্নে তিনটার সময়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কয়েকটী সুশিক্ষিতা মহিলা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই তিনটী আমার বহু দিনের পরিচিতা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠা ছিলেন। সেই সময়ের একটী মহিলা কিছুকাল পূর্ব্বে আমি কঠোর বৈরাগ্য পথ অবলম্বন করিয়াছি—সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, শুনিয়া উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। শুনিলাম তাহারা নাকি অনিমেষে মনোযোগ পূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া আমাকেই দেখিয়া গিয়াছেন। আমি হেঁট মস্তকে ছিলাম বলিয়া কিছুই জানিতে পারি নাই। বোধ হয় তাহাদের ভাব দুষ্ট দৃষ্টিতে আমার অন্তরের দূষিতভাবকে জাগাইয়া দিয়াছে ; তাহারই এই পরিণাম।

ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে পদ্মগন্ধ ও মধুক্ষরণ।

আজ ঠাকুরেরও শরীর সুস্থ নয়। মধ্যাহ্নে আমতলায় গেলেন না। আমি মাথার যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিলাম—

আজ মহাভারত পাঠ করিতে না বলিলে বাঁচি। ঠাকুর একটু পরেই মাথা তুলিয়া বলিলেন—**আমার মাথাটা একবার দেখ ত! পিঁপড়ায় বড় কাম্‌ড়াচ্ছে।** মহাভারত পাঠের পর প্রায় প্রত্যহই কিছুক্ষণ ঠাকুরের মাথা দেখিয়া থাকি। জটার ভিতর হইতে রাশীকৃত ছারপোকা ও উকুন বাছিয়া ফেলি। ঠাকুর আজ পিঁপড়ার কথা বলায় ভাবিলাম—মাথায় পিঁপড়া থাকিবে কেন? বোধ হয় উকুন বা ছারপোকায় কাম্‌ড়াইতেছে। মাথায় হাত দিয়া দেখি, জটার গোড়া একেবারে ভিজা রহিয়াছে। কেহ যেন সমস্ত মাথায় তেল দিয়া রাখিয়াছে। ঘাড়ে ও উভয় কাণের পাশে বিস্তর পিঁপড়া। প্রায় প্রত্যহই জটা বাছিবার কালে ঠাকুরের মাথা সামান্য ভিজা দেখিতে পাই। গরমে ঘর্ম্মে মাথা ভিজিয়া যায়—আমার এইরূপই ধারণা ছিল। আজ অতিরিক্ত ভিজা দেখিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আজ সমস্ত মাথা ভিজে গিয়ে জটার গোড়ার চুলগুলি চপ্‌ চপ্‌ কর্‌ছে। আর একটা সুগন্ধ বের হচ্ছে।

ঠাকুর—**কিরূপ গন্ধ?**

আমি—পদ্মের মত গন্ধ।

ঠাকুর—**হাঁ, তাই। ঐ গন্ধ পেয়েই পিঁপড়া এসেছে।**

ঠাকুরের মস্তক স্পর্শমাত্র দুই মিনিটের মধ্যেই আমার মাথা ধরা কমিয়া গেল, শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইতে লাগিল, মনটাও খুব প্রফুল্ল হইল, সরসভাবে আপনা আপনি নাম চলিতে লাগিল। বিস্মিত হইয়া আমি ঠাকুরকে ছাড়িয়া দিয়া একটু তফাতে যাইয়া বসিলাম; নানা প্রকার ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর আমাকে আবার জটা বাছিতে বলিলেন; আমি জটা বাছিতে বাছিতে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সমস্ত মাথায় চুলের গোড়ায় সাদা সাদা পাতলা মোমের মত দেখিতেছি, তোলা যায় না—চুলে জড়িয়ে যায়, এগুলি কি?

ঠাকুর—**যা বল্‌লে তাই, মোম। জমাট হয়ে হয়ে ওরূপ হয়েছে।**

আমি—কিছুদিন থেকে আপনার মাথা, ঘামে প্রায় সর্ব্বদাই ভিজা থাকে, দেখ্‌তে পাই।

ঠাকুর—**ঘাম নয়। ঘাম ত শুকিয়ে যায়। ঘাম কি জ'মে মোম হয়? প্রতিদিন দেখ্‌ছ, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—ওযে মধু!**

আমি—মানুষের শরীর দিয়েও মধু চোয়ায়?

ঠাকুর—হাঁ, গাছের যেমন দেখেছ তেমনই। একটু পরে ঠাকুর আবার বলিলেন—গাছের নীচে বসা এখন সুবিধা নয়, কত ডেয়ে পিঁপড়ে ও মাছি এসে মাথায় পড়ে। এখন ঘরে থাকাই ভাল।

কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের শরীরে সর্ব্বদাই বিন্দু বিন্দু ঘামের মত দেখিয়া আসিতেছি—বেগে বাতাস করাতেও তাহা শুকায় না দেখিয়া সময়ে সময়ে সন্দেহও জন্মিয়াছে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। ঠাকুর সময়ে সময়ে ভিজা গামছা লইয়া নিজেই গা পুঁছিয়া থাকেন, পিঠে হাত চলেনা বলিয়া আমি পিঠ পুঁছিয়া দেই। প্রচুর পরিমাণে তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া উঠিলে যেরূপ দেখায়, ঠাকুরকে কয়দিন যাবৎ সেই প্রকার দেখিতেছি। মানুষের শরীর হইতে ঘর্ম্মাকারে মধু বাহির হয়, কোথাও শুনি নাই, কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। ঠাকুরের এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখিতেছি। স্নিগ্ধ, সুমিষ্ট পদ্মগন্ধে সর্ব্বদাই ঘরটী আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। বোল্‌তা, প্রজাপতি ও মধুমাছি ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের মাথার উপরে দুই চারি পাক ঘুরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; হাতপাখার ঝাপ্‌টা হাওয়াতে তাহারা ঠাকুরের শরীরে বা মস্তকে বসিবার অবসর পাইতেছে না। অসংখ্য পিঁপড়াও সময়ে সময়ে ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে আসিয়া পড়িতেছে। দেখিলেই উহা ঝাড়িয়া সরাইয়া দিতেছি। ঠাকুর নতমস্তকে মুদ্রিত নয়নে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তৈলধারার মত অবিরল অশ্রু বর্ষণে ঠাকুরের বক্ষস্থল ভাসিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস ভিজিয়া যাইতেছে। ধ্যানমগ্নাবস্থায় ঠাকুরের মস্তক প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে বামদিকে হাঁটুর উপরে আসিয়া পড়ে। ঠাকুর এই অবস্থায় ৮।১০ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠিয়া বসেন। পুনঃ পুনঃ এইভাবে পড়িয়া উঠিয়া অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ঠাকুরের দেহে যে সকল অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা আমার ব্যক্ত করিবার উপায় নাই; ঠাকুরের অসীম কৃপাতে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছি।

স্বপ্নদোষের হেতু—উপদেশ।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন, মাথা তোলা মাত্র আমার দুর্দ্দশার কথা সমস্ত জানাইলাম।

ঠাকুর কহিলেন—কতবার তোমাকে ব'লেছি ওতে কোন অনিষ্ট হয় না।

অনর্থক সংস্কারে বৃথা বৃথা কষ্ট পাও কেন? ইচ্ছা করে বীর্য্য নষ্ট কর্‌লেই অপরাধ হয়। তাতে অনিষ্টও হয়।

আমি—ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য্যধারণই প্রধান সাধন। যেরূপেই হউক তাহা নষ্ট হলেই কষ্ট হয়।

ঠাকুর—স্বপ্নদোষ যেরূপ তোমার হয়, তাতে বীর্য্যধারণের কোন ক্ষতিই করে না। বীর্য্যধারণ ঠিক মতই হচ্ছে।

আমি—ওরূপ হ'লে শরীর যে অসুস্থ হয়—নিস্তেজ, অবসন্ন হ'য়ে পড়ে; মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, সাধন করিতে পারি না, আপনার কাছে ঘেঁসিতেও প্রবৃত্তি হয় না। স্বপ্নদোষ আমার কেন হয়?

ঠাকুর কহিলেন—ও সব অনেক কারণে হয়। তার উপায় সহজ নয়। তবে সাধারণ নিয়মগুলি তো রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার? রসাস্বাদনের লোভটী ত্যাগ কর।

আমি—চেষ্টা তো কম কর্‌ছি না, হয়রান্ হ'য়ে প'ড়েছি—আর পারি না।

ঠাকুর—হয়রান্ হ'য়েছ সে কিছু নয়। হয়রান্ হ'লেও চেষ্টা কর্‌তে হবে। এ কি একদিন ছুদিনের কাজ? এই ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বে ঋষিকুমারেরা ছত্রিশ বৎসর কর্‌তেন। কেহ কেহ বা বার বৎসর কর্‌তেন। কিন্তু ছটি বৎসরের পূর্ব্বে কখনও ঠিক হয় না। তুমিও খুব চেষ্টা কর—হঠাৎ যে হবে তা নয়, ক্রমে ক্রমে সব হবে। কাম ক্রোধ লোভাদি যখন ছুট্‌বে—আপনা আপনি ছুট্‌বে। কিন্তু তা ব'লে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে নাই। অভ্যাস কর্‌তে হয়। এখন খুব অভ্যাস কর।

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—যে পথ ধ'রে চ'লেছ তাতে আহারের নিয়মটি খুব ঠিক্ রেখে না চল্‌লে ক্ষতি হবে। আহারের পরিমাণ যেমন প্রত্যহ সমান থাক্‌বে, আহারের সময়টিরও ব্যতিক্রম না হয়। এ ছুটির কোন প্রকার অনিয়ম হ'লেই শরীর অসুস্থ হবে। নিজের নিয়মের বিরুদ্ধে কারও কোন প্রকার উপরোধ, অনুরোধ শুন্‌বে না। যে কোন প্রকারের মিষ্টি তোমার পক্ষে অনিষ্টকর—বিষবৎ উহা ত্যাগ করবে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সমস্তই বুঝিলাম। আমার স্বেচ্ছাকৃত অনিয়মের কথা উল্লেখ করিয়া যদি এ সকল উপদেশ দিতেন—আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। আমার ত্রুটি বিষয়ে কিছুই যেন জানেন না—এ ভাব দেখাইয়া, প্রয়োজনীয় কথাগুলি মাত্র বলিলেন, ইহাতে বড়ই লজ্জিত হইলাম।

আত্মদর্শন, ছায়াদর্শন, জ্যোতিঃদর্শন।

১০ই—আষাঢ়। শেষরাত্রে তন্দ্রাবস্থায় দেখিলাম, আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করিয়া নাম করিতেছি, অকস্মাৎ ঝিকিমিকি করিয়া নিজের রূপ প্রকাশিত হইল। ঠিক যেন আয়নায় নিজের মুখ নিজে দেখিতে লাগিলাম। পরিষ্কার দেখিলাম শুভ্রবর্ণ, উজ্জ্বল, পবিত্রমূর্ত্তি, মুণ্ডিতমস্তক, শিখা-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আমার পানে চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরেই বাহ্যজ্ঞান হইল, জাগিয়া উঠিলাম। সমস্ত দিন চিত্তটি সরস ও প্রফুল্ল রহিল। মধ্যাহ্নে অবসর বুঝিয়া ঠাকুরকে সমস্ত বলিলাম; তিনি শুনিয়া কহিলেন— **এরূপ দেখা ভাল। জাগ্রতাবস্থায় যখন ওরূপ দর্শন হবে তখনই ঠিক হলো। একেই আত্মদর্শন বলে। কাম ক্রোধাদি রিপু থাক্‌তে যে আত্মদর্শন হয় তাহা স্থায়ী হয় না। সময়ে সময়ে দর্শন হয় মাত্র। আর রিপু সমস্ত দমন হয়ে গেলে যে আত্মদর্শন হয়, তাহা আর ছোটে না স্থায়ী হয়।**

জিজ্ঞাসা করিলাম—কালো, অস্পষ্ট ছায়ার মত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মনুষ্যাকৃতি যে সর্ব্বদাই এদিকে ওদিকে দেখ্‌তে পাই, তাহাও কি এই?

ঠাকুর—**না, তা নয়। সে ভিন্ন। আত্মদর্শন তা নয়।**

আমি—হোমের সময়ে আগুনের মধ্যে গৈরিক বসন পরা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতি দেখ্‌তে পাই—

ঠাকুর— **হাঁ, চিত্ত শুদ্ধ যত হবে, ততই উহা পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবে।**

আমি—উজ্জ্বল শুভ্র-জ্যোতিঃ যাহা সর্ব্বক্ষণই চক্ষে লে'গে র'য়েছে, কখনও কখনও তাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখ্‌তে পাই, আবার কোন কোন সময়ে ম্লান হয় কেন?

ঠাকুর—**চিত্ত যত শুদ্ধ ও পবিত্র থাক্‌বে, ঐ জ্যোতিঃ ততই উজ্জ্বল দর্শন হবে। চিত্ত মলিন ও অপবিত্র হলে জ্যোতিঃ অস্পষ্ট হয় ও ক্রমে অদৃশ্য হয়;**

চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয় আর নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জ্যোতিঃ দেখায়।

আমি—কিছুকাল যাবৎ কথা বলিতে গেলেই আপনা আপনি মনে আসিয়া পড়ে 'সত্য বলিতেছি কি না'—অমনি কথা বলায় বাধা হয়, ভাবিয়া কথা বলায় কথা অল্পও হ'য়ে পড়ে।

ঠাকুর—ইহাই প্রণালী; একদিনেই কি সব হয়? প্রণালী ধ'রে চল্‌তে থাক, অবস্থা সময়ে হবে। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে লক্ষ্য স্থানের জন্য উদ্বেগ ভোগ ক'রে লাভ কি? সত্যবাদী কি একদিনেই হওয়া যায়! এতই সহজ! কথা বলার সময়ে ঐ প্রকার মনে হলেই সত্য কথা বলা যায়। এই প্রণালী। কোন অবস্থালাভের জন্যই ব্যস্ত হ'য়ো না। প্রণালী মত চল্‌লেই তোমার কর্ত্তব্য করা হ'লো, অবস্থা যখন হবার হবে; সে জন্য উদ্বেগভোগ অনর্থক। কাজটি করে গেলেই হলো।

অবস্থালাভ বা ঠাকুরের সেবাভোগ একই কথা।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম। ঠাকুর প্রাণপণে উৎসাহ উদ্যমের সহিত সাধনভজন ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে বলিতেছেন। অথচ 'তাহাতে কোন অবস্থালাভ হইবে'—এরূপ কল্পনা করিতেও নিষেধ করিতেছেন। ফলে উদ্দেশ্যশূন্য হইলে কর্ম্মে উৎসাহ বা প্রবৃত্তি জন্মিবে কি প্রকারে? ফলের জন্যই তো কর্ম্ম করা। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—'অবস্থালাভ সাধনসাপেক্ষ নয়, উহা কৃপাসাপেক্ষ।' অপ্রাকৃত অবস্থা সমস্তই গুরুদেবের হাতে—তিনি দয়া করিয়া দিলেই তাহা পাইব, নচেৎ সহস্র সাধন ভজনেও উহা লাভ হইবে না। ঠাকুর স্বয়ং ফলদাতা। তিনি যেমনই পরম দয়াল, তেমনই আবার মহাসমর্থী, সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে কৃপা করিতে পারেন, এরূপ প্রত্যাশা সর্ব্বদাই আমি করিতে পারি। ঠাকুরের আদেশ মত কার্য্যগুলি সমস্তই আমি করিয়া যাইব, অথচ তাঁর নিকটে কোন প্রকার শুভ অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করিব না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? ঠাকুরের এ কথার তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতেছি না। মনে হইতেছে, ঠাকুরের আদেশে সাধন ভজন ও নিয়ম প্রতিপালন যেমন আমার কর্ত্তব্য, আমাকে যাবতীয় উৎকৃষ্ট অবস্থা দান করাও সেই প্রকার ঠাকুরেরই কার্য্য। আমার কর্ত্তব্যপালনে পদে পদে শিথিলতা ও অক্ষমতা জন্মিতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের কার্য্যে কখনও বিন্দুমাত্র অন্যথা

হওয়ার যো নাই; কারণ তিনি মহাসমর্থী। ঠাকুর আমাকে কোন অবস্থা দিন আকাঙ্ক্ষা করা, আর তিনি আমার জন্য কিছু করুন ইচ্ছা করা একই কথা। আমাকে কৃপা করা অর্থই যখন আমাকে সেবা করা দাঁড়াইতেছে, তখন প্রাণান্তেও, ঠাকুর আমাকে কৃপা করুন—কোন অবস্থা দিন, এরূপ ইচ্ছা আমি করিব না। ওরূপ আকাঙ্ক্ষা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই মনে হয়। এই জন্যই বোধ হয় অনুগত ভক্তেরা কোন প্রকার ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শুধু আদেশ পালন ও সেবাতেই পরমানন্দ লাভ করেন। তাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন।

স্বপ্নে গুরুরূপে আদেশও অসত্য হয়।

গতকল্য ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি ভিতরে ভিতরে একটা উদ্বেগ চলিয়াছে। সাধন ভজন ও নিয়ম প্রতিপালনের সহিতই যখন আমার সম্বন্ধ, উহার ফলাফলে যখন আমার কোনও হাতই নাই, তখন কোন অবস্থা লাভের লোভে পড়িয়াই হউক বা অনুরাগবশেই হউক—কার্য্যটি হইলেই হইল, কার্য্যটির সঙ্গেই মাত্র আমার সম্বন্ধ। কিন্তু কোন অবস্থা লাভের লোভে সাধন ভজন করিলে অনিষ্টেরও আশঙ্কা আছে, ঠাকুর এইরূপ বলিলেন কেন? পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—অবস্থা লাভের প্রত্যাশা তো একমাত্র গুরুরই উপরে, সুতরাং অনিষ্ট হবে কিরূপে?

ঠাকুর—তা কি সহজ? তুমি একটা অবস্থা লাভের জন্য বহুকাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করে আস্‌ছ, হচ্ছে না। একটি সাধু এসে বল্‌লেন—এরূপ কর, হবে। তখন সেটি না করা কি সহজ কথা? এই প্রলোভন কেহ সহজে ছাড়াতে পারে না। ওরূপ ক'রে অনেকেই বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। স্বপ্নেও এরূপ প্রলোভন উপস্থিত হয়।

আমি—স্বপ্নে দেখ্‌লাম গুরু এসে একটা আদেশ ক'রে গেলেন বা উপদেশ দিলেন, তাও কি অসত্য হয়?

ঠাকুর—হাঁ, তাও হয়, গুরুর রূপে অন্যেও এসে পরীক্ষা কর্‌তে পারেন।

আমি—তবে উহা গুরুরই আদেশ কি না, সত্য কি মিথ্যা কিরূপে বুঝ্‌ব?

ঠাকুর—নাম কর্‌লে যদি ঐ রূপ অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হলেই বুঝ্‌বে ঠিক

নয়। আর নাম কর্‌লেও যদি থাকে তা হলেই সত্য মনে কর্‌বে। নাম কর্‌লে কখনও মায়া, অসত্য টিক্‌তে পারে না।

আমি—স্বপ্নের অবস্থায় যদি নাম কর্‌তে স্মরণ না হয় তা হলে কি কর্‌বো? যথার্থ গুরু কিনা তাই বা কি প্রকারে বুঝ্‌বো?

ঠাকুর—গুরুকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়। না হলে যদি সন্দেহ হয় সেই উপদেশ মত চল্‌তে নাই। তবে স্বপ্নে সদ্‌গুরু কিছু আদেশ কর্‌লে বা উপদেশ দিলে, সে বিষয়ে কোন প্রকার সংশয়ই মনে উদয় হবে না।

বোলতার দংশন। হিংসাজনিত অপরাধ খণ্ডন। ছু'টী হিংসার স্মৃতি। কারও প্রাণে আঘাত দেওয়াও হিংসা।

মধ্যাহ্ন আহার কালে ঠাকুরকে পরিবেশন করিয়া দরজার ধারে দাঁড়াইয়া আছি। একটী বোলতা আসিয়া হঠাৎ আমার বাম হাতে পড়িয়া কামড়াইয়া গেল। বিষাক্ত ক্ষুদে বোলতা, মনে হইল যেন জলন্ত লোহার কাঠি হাতের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। বারান্দায় আসিয়া ছু চা'র বার হাত আছ্‌ড়াইয়া ডলিয়া মলিয়া অতি কষ্টে একটু স্থির হইলাম। ঠাকুরের আহারান্তে মহাভারত লইয়া যেমন ঠাকুরের নিকটে বসিয়াছি, আর একটী বড় বোলতা হাতের ঠিক সেই স্থানেই আসিয়া উড়িয়া পড়িল এবং হুল বসাইয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে হাতখানা আমার ফুলিয়া উঠিল এবং অবশ হইয়া গেল। একটু পরে মহাভারত পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে আর একটী বোলতা আসিয়া ঐ হাতের ধারেই ভন্ ভন্ করিতে লাগিল, এবং পুনঃ পুনঃ হাতের উপরে উঠা-পড়া করিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর কহিলেন—বোলতার প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করেছ?

আমি—না।

ঠাকুর বলিলেন—ভগবান্ সর্ব্বভূতে রয়েছেন। হিংসা করতে নাই, কোনও প্রাণীকেই কষ্ট দিতে নাই। মানুষ তা পারে না বটে, কিন্তু খুব সাবধান হতে হয়। আজ তুমি প্রাণী হিংসা করেছ, কতকগুলি প্রাণীকে খুব ক্লেশ দিয়াছ। তাই ভগবান্ বোলতার ভিতরে থেকে তোমাকে জানায়ে দিলেন।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া স্মরণ হইল আজ কতকগুলি প্রাণী হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি। ঠাকুরকে বলিলাম— আজ সকালে আসনে অসংখ্য পিঁপ্‌ড়া উঠেছিল, একটী একটী ক'রে তুলে ফেলা যায় না। তাই অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে ফেলেছিলাম। তাতে অনেকগুলি মারা গিয়াছে। আপনার আহারের সময়েও চিনি বাছিতে কতকগুলি পিঁপ্‌ড়ার হাত পা ভাঙ্গা গিয়াছে।

ঠাকুর—যাক্, ভগবানের বড় দয়া। তোমার দোষ দেখেই তিনি এই শিক্ষা দিলেন। পুনঃ পুনঃ বোলতা এসে একই স্থানে না কামড়ালে তোমার মনোযোগ হ'ত না, এতে তোমার এপর্য্যন্ত হিংসা জনিত সমস্ত অপরাধ কেটে গেল।

ঠাকুরকে আমি বলিলাম। একবার ছোটবেলা, তখন আমি নেংটা থাকি, একদিন বৃষ্টির পর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি ছাঁচতলায় জল জমিয়াছে। একটি কেঁচো জল হইতে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না। আমি একটী কাঠি দ্বারা উহাকে জলের উপর তুলিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখিলাম অসংখ্য বড় বড় লাল পিঁপ্‌ড়ায় উহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে, কেঁচোটি ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইল; মনে হইল আমি যদি জল হইতে ইহাকে না তুলিতাম, কেঁচোটির এ দশা হইত না। কেঁচোটিকে বাঁচাইবার অন্য উপায় নাই বুঝিয়া উহাকে আবার জলে ফেলিলাম। তখন কতকগুলি পিঁপ্‌ড়া জলে ডুবিয়া মরিয়া গেল, কতকগুলি জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। জলের উপরের পিঁপ্‌ড়াগুলিকে বাচাইতে, জল হইতে একটী একটী করিয়া তুলিতে লাগিলাম। কয়েকটি পিঁপ্‌ড়ায় আঙ্গুলে কামড়াইয়া দিল, তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সরিয়া পড়িলাম। কেঁচোটির যন্ত্রণার চিত্র এখনও সময়ে সময়ে মনে হয়—ভুলিতে পারি নাই। ছেলেবেলা সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশে কচ্ছপ ও মৎস্যাদি ধরেছি—কত মেরেছি। তারপর আর একটী গুরুতর অপরাধ করেছিলাম, এখনও সর্ব্বদা তা মনে হয়—ভুল্‌তে পারি না। একদিন আমার মাঠাকুরাণীর আহারের সময়ে একটী বিড়াল ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ কর্‌লো। বিড়ালটাকে তাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও পার্‌লাম না। তখন একখানা মোটা কাঠ বিড়ালের গায়ে ছুঁড়ে মার্‌লাম। কাঠখানা বিড়ালের ঘাড়ে পড়্‌ল। অমনি বিড়ালটি প'ড়ে গেল, নাক কান দিয়ে রক্ত ছুট্‌ল—গর্ভবতী ছিল—পেটের ভিতরে ছানাগুলি নড়্‌চড়্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। বড়ই কষ্ট হ'ল; অমনি পুরোহিত এনে বিড়ালের ওজনে লবণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম। সজ্ঞানে জীবনে আর কখনও জীবহত্যা করেছি

বলে মনে হয় না। ঠাকুর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং যাক্, যাক্ বলিয়া আমাকে থামাইয়া কহিলেন—

তুমি খুবই অন্যায় করেছিলে। উঃ কি ভয়ানক! যা হ'ক, সেজন্য আর তোমার কোন শাস্তি পেতে হবে না। বোলতার কামড়েই তোমার সকল অপরাধের শাস্তি হয়ে গেল। এ পর্য্যন্ত যত হিংসা করেছ, ওতে সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল। এখন আর তোমার কোন পাপই নাই। এখন হতে খুব সাবধান হ'য়ে চল। আর কখনও হিংসা ক'রো না। একটী গাছের পাতাও বৃথা ছিঁড়্‌বে না। কারও প্রাণে আঘাত দিবে না। কটুবাক্য দ্বারা কারও প্রাণে দারুণ আঘাত দেওয়াও প্রাণী হিংসার তুল্য পাপ, এটী মনে রেখো।

আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরের কৃপা—প্রত্যক্ষ অনুভূতি—দৈনিক পাপ স্খালনার্থ পঞ্চসূনার উপদেশ।

আশ্চর্য্য দেখিলাম! ঠাকুরের বাক্যমাত্রে আমার দেহটি হাল্‌কা বোধ হইতে লাগিল। শরীরের যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। চিত্তে প্রফুল্লতা ও মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের অসীম দয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলাম। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণীহত্যা করিতেছি, অসংখ্য জীবের ক্লেশের কারণ হইতেছি। সমস্ত জীবনের সৎকার্য্য ও পুণ্যের ফলেও বোধ হয় একটী দিনের দুষ্কার্য্য ও অপরাধের স্খালন হওয়া সম্ভব নয়। ২।১টী সামান্য বোলতার কামড়ে আর কতটুকু পাপের দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তই বা হইতে পারে। সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনাও তো একটী ক্ষুদ্র প্রাণীর অঙ্গভঙ্গের ক্লেশের সহিত তুলনা হয় না। ঠাকুর নিজকে আড়ালে রাখিয়া আমাকে কৃপা করিতে যাইয়া বোলতার কামড় উপলক্ষ করিলেন —ইহা পরিষ্কার বুঝিলাম। বহুক্ষণ হয় বোলতায় আমাকে দংশন করিয়াছে, সেই হইতে দৈহিক দারুণ যাতনা ও মানসিক বিষম উদ্বেগ ভোগ করিতেছিলাম। ঠাকুরের বাক্য মাত্রে তাহা অকস্মাৎ অবসান হইল, দেহ মনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। ইহাতো কল্পনা নয়, কোন প্রকার ভাবুকতাও নয়; সন্দিগ্ধ চিত্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যে ঠাকুরের বাক্যে এত বল, প্রাণে এত দয়া, তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন—তাঁর আশ্রয় আমি

পাইয়াছি—আমার মত সৌভাগ্যবান্ কে? আমার আর চিন্তা কি? জিজ্ঞাসা করিলাম সমস্ত পাপের ফল যদি মানুষকে ভোগ কর্‌তে হয়, তা'হলে একটী দিনের ভোগও একটী জন্মেও শেষ হয় না—উপায় কি?

ঠাকুর—উপায় সমস্তই ঋষিরা করে গেছেন। প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চসূনা কর্‌লে পঞ্চসূনা জনিত দৈনিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, দেহ পবিত্র হয়, চিত্তও নির্ম্মল হয়। পঞ্চসূনা কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—চুল্লি, জলকুম্ভ, উদূখল, ঝাঁটা ও শিলনোড়া—এই পাঁচটীর দ্বারা জীবহত্যা অনিবার্য্য ব'লে এই পাঁচটীতে ভগবানের পূজা কর্‌তে হয়। প্রতিদিন সকালে চুল্লী লেপে পরিষ্কার ক'রে জলের কলসী মেজে, উদূখল বা ঢেঁকি পরিষ্কার ক'রে, ঝাঁটা ও শিলনোড়া ধুয়ে, ফুল, চন্দন, জল দিয়ে পূজা ক'রে নমস্কার কর্‌তে হয়। এটী সমস্ত গৃহস্থেরই নিত্য কর্ত্তব্য। পঞ্চযজ্ঞও প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী প্রতিদিন কর্‌তে হয়। এসকল লোপ পাওয়াতেই যতপ্রকার অনর্থ ঘট্‌ছে।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া পঞ্চসূনা ও পঞ্চযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিলেন।

ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য। কাঁড়াকাটা। কুতুর আরতী—সংকীর্ত্তন।

আষাঢ়মাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের অন্তরে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কোন দিন, কোন সময় ঠাকুরের কি হয়। ঠাকুর সকালে কুটীরে, মধ্যাহ্নে আমতলায় এবং সন্ধ্যার পর রাত্রিতে পূবের ঘরে আপন আসনে অবস্থিতি করেন। মধ্যাহ্নে বৃষ্টি ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিলে ঠাকুর আমতলায় না গিয়া পূবের ঘরেই থাকেন। সকালে চা সেবার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ হয়। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত অনেক গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের নিকটে বসিয়া উহা শ্রবণ করেন। গ্রন্থসাহেব ও ভাগবতাদি পাঠের পর ১১টার সময় ঠাকুর শৌচে যান। পাতকুয়া তলায় সাধারণের পাকা পায়খানাই ঠাকুর ব্যবহার করেন। শ্রীধর জল তুলিয়া দেন এবং কৌপীন বহির্ব্বাস কাচিয়া আনেন। শ্রীধর অসমর্থ থাকিলে বা উনুপস্থিত হইলে এই কাজ আমাকে করিতে হয়। পণ্ডিত মহাশয় ও নবকুমার বাবুর আশ্রমত্যাগের পর ঠাকুরকে আবার পূবের ঘরেই আহার করিতে দেওয়া হইতেছে। ১২ টার সময়ে তিলকসেবার পর ঠাকুর আহার করেন। অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে কেহ থাকেন না। গুরুভ্রাতারা অনেকে আপন

আপন কার্য্যস্থলে চলিয়া যান। আশ্রমবাসী গুরুভ্রাতারা আহারান্তে নিজ নিজ আসনে বিশ্রাম করেন। পাড়ার গুরুভগ্নীরা ও কখনও কখনও সহর হইতে মেয়েরা মধ্যাহ্নে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। মহাভারত পাঠ ২টার মধ্যেই হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের জটা বাছিয়া থাকি, অথবা হাওয়া করি। অপরাহ্নে প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুর সমাধিস্থ থাকেন। আজ নিয়মিতরূপে যথাসময়ে মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল—ঠাকুর সমাধিস্থ। বেলা প্রায় ১ টার সময়ে ঠাকুরের শরীর স্থির নিশ্চল, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চিহ্নমাত্র নাই দেখিলাম। আমি পাঠ বন্ধ করিয়া ঠাকুরকে হাওয়া করিতে লাগিলাম। তিনটার সময়ে ঠাকুর মাথা তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—**সকলে এসে আমাকে অনেক দূর নিয়ে গেলেন। পরমহংসজী তাঁদের বল্‌লেন—'একে আরও কিছুকাল দেহে থাক্‌তে হবে—অনেক কাজ কর্‌বার রয়েছে।' এই বলে তিনি আমাকে এনে আবার দেহে প্রবেশ করায়ে দিলেন।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বিষম উদ্বেগের শান্তি হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাহারা আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কোথায় নিয়েছিলেন ?

ঠাকুর—**কত দেবদেবী, ঋষি-মুনি ছিলেন। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছিলাম না। কত পাহাড় পর্ব্বতে সুন্দর সুন্দর স্থানে বেড়িয়েছিলাম।**

বিকালবেলা বহু লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না। ঠাকুর সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসন হইতে উঠিয়া শৌচে গেলেন। তৎপরে আর আর দিনের মত মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কুতুবুড়ী শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপধূনা ও পঞ্চপ্রদীপাদি লইয়া প্রতিদিনের মত মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। মহাসমারোহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রত্যহই সঙ্কীর্ত্তনে গুরুভ্রাতাভগ্নীদের ভাবাবেশ এক অদ্ভুতব্যাপার। তাহা লিখিতে গিয়া আক্ষেপ হয়; কিছুই প্রকাশ করা যায় না। অতিশয় লজ্জাশীলা অল্পবয়স্কা কুলবধূরাও গুরুজনের সমক্ষে আত্মসংবরণ করিতে পারেন না। তাঁহারা অনেকে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে, বহু জনতার ভিতরে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া পড়েন। সকলেই মত্ত, ভেদাভেদ অধিকাংশ সময়েই থাকেনা।

সাধনের অবস্থা—প্রত্যক্ষ অনুভূতি। নিজের উন্নতি না দেখা অকৃতজ্ঞতা।

ঠাকুরের কৃপায় আষাঢ় মাসটি ভালই গেল। নাম করিতে ভিতরে যে বিষম শুষ্কতা ও দারুণ জ্বালা অনুভব হইত, তাহা এখন আর নাই। ঠাকুরের কৃপায় নামে এখন আনন্দ পাই। স্থির ভাবে সরু নালে নাম করিতে আরম্ভ করিলে মনটিকে ধীরে ধীরে ভিতরদিকে টানিয়া নেয়; বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। উত্তরোত্তর নামের আনন্দে নিবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি। সমস্ত স্মৃতির অবসান হওয়ায় নামটিই আমার অস্তিত্ব—এরূপ অনুভব হইতে থাকে। অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ দর্শনের নূতনত্বেও চিত্ত আকৃষ্ট হইতে চায় না। নাম ব্যতীত সমস্তই অভিনিবেশের অন্তরায় বলিয়া মনে হয় এবং উহাতে প্রত্যেকটি নামে নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দিতে বিঘ্ন বোধ হয়। নাম করি না অপর শক্তিতে করায়—তাহাও বুঝিতেছি না। স্বভাব হইতে নাম আপনা আপনি হয়—উহা আমি শ্রবণ করি—এইমাত্র অনুভব হইয়া থাকে। জপকালে নামের অর্থ-ধ্যানে বা তাৎপর্য্য—স্মরণে প্রবৃত্তি হয় না। নাম শুধু অক্ষর নয় বা শব্দ নয়—শক্তিযুক্ত সারবান্ কিছু, এইরূপ মনে হয়। বীজসংযুক্ত সমস্ত নাম অথবা তাহার একাক্ষর স্মরণকালে কখনও কখনও একই প্রকার বোধ হয়। ঠাকুর গায়ত্রীজপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। উহা করিয়া উপকার পাইতেছি। গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্রে প্রায় একই রকম কার্য্য করে দেখিতেছি। গীতা ও চণ্ডী প্রত্যহ পাঠ করি। সংস্কৃত জানিনা বলিয়া উহার অর্থ বুঝি না। বুঝিতে তেমন প্রবৃত্তিও হয় না। আবৃত্তি মাত্র করিয়া যাই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ। ঋষি প্রণীত সমস্ত শাস্ত্রই ভাগবানের রূপবর্ণনা।** ঠাকুরের এই কথা শোনার পর হইতে পাঠকালে মনে হয়, যাবতীয় সত্যই ভগবানের রূপ; শাস্ত্র সত্যেরই বর্ণনা মাত্র। চিদ্‌ঘন সত্যস্বরূপ ভগবানের রূপেরই কোন অঙ্গের স্তব করিতেছি। ইহাতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টধ্যান প্রস্ফুটিত হয়। কখনও কখনও সঞ্চারীভাবের আধিক্যে শ্লোকসমূহ মন্ত্র বলিয়া মনে হয়। বুঝি আর নাই বুঝি, ঋষিবাক্য শ্রবণ করিলেই ভিতর যেন ঠাণ্ডা হইয়া যায়; অন্তরে বিমল আনন্দ অনুভব করি। ঋষিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া নানা মত বিরোধ ও অশান্তি। কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমাকে ভাষাজ্ঞানশূন্য করিয়া শব্দমাত্র শ্রবণে তৃপ্তিপ্রদান করিতেছেন।

মলিন অন্তরে শাস্ত্রোক্ত সদাচারে আকর্ষণ যদিও আমার জন্মিতেছে না, তথাপি ইষ্টবীজের অঙ্কুরোদ্‌গমে উহা একান্ত আবশ্যকীয় মনে হয়। এতকাল কামের উৎপাত ভজনপথে বিশেষ বিঘ্নজনক মনে করিতেছি, কিন্তু এখন লোভ তদপেক্ষাও বহুগুণে অনিষ্টকর দেখিতেছি। ঠাকুরকে ভালমন্দ সমস্তই জানাইলাম; ঠাকুর কহিলেন—**নিজের ভিতরে দোষগুলি যেমন দেখ্‌বে, উন্নতি কতটা হ'ল তাও সেইপ্রকার দেখ্‌তে হয়। নিজের যথার্থ উন্নতি না দেখ্‌লে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা হয়। সাধন ভজনেও উৎসাহ থাকে না। ক্রমে অবিশ্বাস জন্মে। সর্ব্বদা এসব বিচার ক'রে চল্‌বে।**

আমি—নিজের উন্নতি দেখা নাকি অনিষ্টজনক?

ঠাকুর - **না, না, তা না দেখ্‌লে হবে কেন? অভিমানই অনিষ্টজনক। রিপুর হাত হ'তে মানুষ একদিনেই নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ কি? তেমন আর একটা ধর্‌তে না পেলে, থাক্‌তে পার্‌বে কেন? পাগল হ'য়ে যাবে।**

আজ ঠাকুরের সঙ্গে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল—বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম।

ঠাকুরের জটা ছিঁড়িবার চেষ্টা—ন্যাস চাহিতে নস্য দেওয়া—অবাক কাণ্ড। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিতে আদেশ।

মহাভারত পাঠকালে প্রত্যহই ঠাকুর কি যেন এক অমৃত পানের নেশায় বিভোর হইয়া পড়েন। আজ ঠাকুরকে অতিশয় অভিভূত দেখিয়া মহাভারতপাঠ সংক্ষেপ করিলাম; এবং ধীরে ধীরে ঠাকুরের জটা বাছিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিলেন—**না, না, জটা খুলে কাজ নাই।** আমি কহিলাম—কি বল্‌লেন বুঝ্‌লাম না। ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া মাথা তুলিলেন এবং কহিলেন—**দেখ্‌ছ না! কেমন দুষ্টু। আমার জটা ছিঁড়ে দিতে চায়। বারংবার নিষেধ কর্‌লেও শুন্‌ছে না। একবার যদি একটু সায় দেওয়া যায়, তা হ'লে কি রক্ষা আছে? সবগুলি জটা ছিঁড়ে দেবে।**

শ্রাবণ—১২৯৯।

আমি—কিরূপে ছিড়্‌বে? আমি যে এখানে রয়েছি।

ঠাকুর—**তোমার দ্বারাই ছেঁড়াবে। যখনই আমার নেশার মত হয়, তখনই**

এ'রা এসে আমাকে ধ'রে টানাটানি করেন। একটু আল্‌গা দিলেই দফা শেষ। কি কাণ্ড! ইহা বলিয়াই ঠাকুর আবার ঢলিয়া প'ড়লেন। আমি কিছুক্ষণ জটা বাছিয়া ঠাকুরের পাশে নিজ আসনে বসিয়া রহিলাম। কিছু সময় পরে ঠাকুর একটু মাথা তুলিয়া ঢুলু ঢুলু অবস্থায় আমার সাম্‌নে হাত পাতিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—ন্যাস দেও, ন্যাস দেও। ঠাকুর ইহা বলিয়াই ভাবাবেশে আবার ঢলিয়া পড়িলেন। আমি আসন হইতে উঠিয়া বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াইয়া নিকটস্থ লোহারপোলে উপস্থিত হইলাম, এবং মস্‌লিপটাম্ নস্য এক কৌটা কিনিয়া ঠাকুরের নিকটে আসিলাম। দেখিলাম ঠাকুর একই ভাবে আমার আসনের সাম্‌নে হাত পাতিয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। একটু পরে মাথা তুলিয়া আবার বলিলেন—দিলে না? দেও, ন্যাস দেও। আমি অমনি কতকটা নস্য ঠাকুরের হাতে ঢালিয়া দিয়া বলিলাম 'এই নিন্ নস্য'। ঠাকুর উহা হাতে লইয়াই আবার ধ্যানস্থ হইলেন। একটু পরে মাথা তু'লতেই আমি বলিলাম—নস্য আপনার হাতে দিয়েছি। একবার নাকে টেনে দেখুন কি রকম। ঠাকুর উহা আঙ্গুলের টিপে ধরিয়া অভিভূত অবস্থায়ই নাকে টানিয়া নিলেন। নাকের ভিতর নস্য প্রবেশ মাত্র হাঁচির উপরে হাঁচি হইতে লাগিল। ভাবের নেশা বোধ হয় ছুটিয়া গেল—হাঁচির উপরে হাঁচি দশ বারটি দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, এবং আমাকে বলিলেন—এ কি দিয়েছ?

আমি—আপনি চেয়েছিলেন, তাই নস্য এনে দিয়েছি। আমার কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব উচ্চশব্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমিও বোকার মত না বুঝিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিতে লাগিলাম। হাসিতে হাসিতে আমার পেটে ব্যথা ধরিল। অতি কষ্টে আমাদের হাসির বেগ থামিল। পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হাস্‌লেন কেন? ঠাকুর কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, আরও হাসিতে লাগিলেন। পরে একটু সাম্‌লাইয়া নিয়া কহিলেন—তোমার নিকট ন্যাস চেয়েছি, তুমি নস্য এনে দিয়েছ, বেশ। কেন, তুমি শুন নাই? ব'লে গেলেন কুলদার ন্যাস আছে চেয়ে নেও। তুমি যেমন বোকা।

আমি—আপনি দেখে শুনে নস্য টেনে নিলেন আর আমি বোকা হলাম? ন্যাস আবার কি? আমি তো নস্য মনে ক'রে লোহারপোল থেকে নস্য এনে দিয়েছি।

ঠাকুর—ন্যাস কি জান না? অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস, তোমার তা আছে—চেয়ে নিতে ব'লে গেলেন।

আমি—কে ব'লে গেলেন ? আমার তো কিছু নাই।

ঠাকুর—হাঁ তোমার আছে। এই যে পরমহংসজী এসেছিলেন, বলে গেলেন—এই মাত্র কহিয়া ঠাকুর শ্রীমদ্‌ভাগবতখানা আনিতে বলিলেন ; আমি উহা ঠাকুরের নিকটে লইয়া আসিলাম। ঠাকুর আমাকে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে বলিলেন। আমি পড়িলাম। ঠাকুর কহিলেন—অর্পণকে ন্যাস বলে। তুমি প্রত্যহ এই ভাবে ন্যাস করো।

আমি বলিলাম—প'ড়ে কিছুই তো বুঝ্‌লাম না—কি ভাবে কর্‌তে হবে ? ঠাকুর তখন ঐ অধ্যায়ের শেষ অংশের কয়েকটি শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌, কর্ণ ; ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ ; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের ন্যাস কি ভাবে করিতে হয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন ; এবং কহিলেন—ন্যাসের পর নিজকে তন্ময়রূপে ধ্যান কর্‌বে, সেই ভাবেই থাক্‌তে চেষ্টা করো। আগামী কল্য হইতেই এইভাবে ন্যাস করিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্বে প্রতিদিন এইভাবে সারাজীবন আমাকে ন্যাস করিতে হইবে, ঠাকুর এইরূপ বলিলেন।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই ন্যাস করায় কি হয় ?

ঠাকুর কহিলেন—কর্‌লেই ক্রমে বুঝ্‌বে।

ঠাকুরের অসাধারণ কৃপায় বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। একটু পরে ঠাকুর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—এ সকল আজকাল কেহ জানে না, করেও না। আর শ্রদ্ধা ক'রে করেনা ব'লে কেহ জান্‌লেও শিক্ষা দেন না। এসব করায় যে কত উপকার, কর্‌লেই বুঝা যায়। শিক্ষার কত বিষয় রয়েছে। সকলই লোপ পেয়ে গেল। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একটী লোকেও যদি কর্‌তো, কত ছিল ; শিক্ষা দেওয়া যেত। বড়ই কষ্ট হয়—এসব শিক্ষা দেবার মত কারোকে পেলাম না।

ইহা বলিয়া একটু পরেই ঠাকুর চোখ বুজিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমি মনে মনে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর ! যাহা তোমার ইচ্ছা দয়া ক'রে শিক্ষা দেও। প্রাণপণে আমি চেষ্টা করিয়া যাইব।' শ্রীমদ্‌ভাগবতে যাহা পড়িলাম এবং ঠাকুর যাহা

বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, এই ন্যাস যথামত করিতে পারিলে আমাদের মন্ত্রের তাৎপর্য্য ও সাধনের লক্ষ্য অতি সহজে সুসিদ্ধ হয়।

ইতিপূর্ব্বে আরও দুদিন মহাভারত পাঠের পর ঠাকুর আমাকে এই অধ্যায় পাঠ করিতে বলেন। একই অধ্যায় দুদিন ঠাকুর পাঠ করাইলেন কেন, তখন কিছুই বুঝি নাই। এখন আমার মনে হইতেছে, ঠাকুর এই সাধন আমাকে দিবেন পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁর কৃপা, তাঁর সহানুভূতি আমার কোন প্রকার অবস্থারই অপেক্ষা করে না। ধন্য গুরুদেব! তোমার আশ্রয় লাভ মাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছি—এটী বুঝিবার জন্যই এই সকল সাধন প্রণালী; তা ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই নয়।

নমস্কারের বিধি ও নিষেধ।

আজ মধ্যাহ্নে ঠাকুর পূবের ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, একটী গুরুভ্রাতা আসিয়া ঠাকুরের আসনের সাম্‌নে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর একটু চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিলেন—**একি? সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়্‌লেই নমস্কার হলো? এদের একটা কিছু জ্ঞান নাই। নমস্কার যদি ভাবের সহিত করে, উভয়েরই উপকার। না হ'লে যিনি করেন এবং যাকে করেন উভয়েরই ক্ষতি হয়।**

আমি বলিলাম—নমস্কার আমার আসে না। আমি কারোকেই নমস্কার কর্‌তে পারি না। কিন্তু স্বপ্নে দেখ্‌লাম, খুব ভাবের সহিত এখানে নমস্কার কর্‌ছি, আপনি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন।

ঠাকুর—**ওরূপ দেখা খুব ভাল। শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত না কর্‌লে নমস্কার ক'রো না, ওতে ক্ষতি হয়। ভাবের সহিত কর্‌লে উপকার পাবে। নাম কর, নামেই সব হয়। নাম করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা; যিনি সর্ব্বদা নাম করেন, তিনিই যথার্থ সেবা করেন।**

স্বপ্ন—সংসার-শিশুকে ছুড়ে ফেল্‌তে হবে।

ঠাকুরকে এইরূপ বলিলাম—একটী স্বপ্ন দেখে মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে, অর্থ কিছুই বুঝি না।

ঠাকুর কহিলেন—কেন, তুমি তো বেশ ভাল ভাল স্বপ্ন দেখ। কি দেখ্‌লে?

আমি স্বপ্নটি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম—কোন স্থানে পঁহুছিব সংকল্প করিয়া বাহির

হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখি, আপনি চৌমাথায় দাঁড়ান। চারটি পথের একটী দেখাইয়া বলিলেন—এই পথ ধ'রে সোজা চলে যাও—ঠিক স্থানে গিয়ে পৌঁছিবে। আমি চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জ্জন শুনিয়া দাঁড়াইলাম। অনুপায় দেখিয়া রাস্তার পাশে একটী প্রাচীরের উপরে উঠিলাম। বাঘ অন্য শিকার পাইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি প্রাচীর হইতে নামিয়া দেখি, আপনি আমার পিছনেই ছিলেন। ভয় নাই, ভয় নাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি সম্মুখে আর একটী পরিষ্কার প্রশস্ত পথ দেখিয়া সেই পথে চলিব, স্থির করিলাম। কয়েক পা চলিয়াই দেখি, সুন্দর একটী শিশু বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হাত বাড়াইতেছে। আমার বড়ই দয়া হইল। শিশুটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলাম। এই সময়ে দেখি আর একটী প্রকাণ্ড বাঘ। সে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। ছেলেটির জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহাকে খুব আঁকড়াইয়া ধরিলাম। বাঘ আমার সাম্‌নে আসিয়া থাবা পাড়িল এবং আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমি তখন বিষম বিপদ্ বুঝিয়া ঘাড়ের ছেলেটিকে পিছনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম এবং বাঘের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া নাম করিতে লাগিলাম। বাঘটি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন আরম্ভ করিল এবং আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে পড়িয়া বাঘটি ক্রমশঃ ছোট হইতে লাগিল। আমি মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বাঘটি বিড়াল হইয়া গেল। তখন উহাকে দু এক ঘা মারিতেই মরিয়া গেল, আমিও অমনি জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্নটির তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতেছি না।

শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন—ঠিক দেখেছ। খুব সত্যি; এরূপই হয়। লিখে রেখো। ছেলেটিকে ছুড়ে না ফেল্‌লে তোমাকে ঐ বাঘে খেতো। ছেলেটি সংসার। স্নেহ-শিশুর রূপ ধারণ ক'রে আছে। উহাকেই কাঁধে নিয়ে চল্‌ছ। ঐ বাঘে সংসারীকেই বিনাশ করে। ঐভাবে বাঘের প্রতি দৃষ্টি করায় যে বিড়ালের মত হ'লো, তাও সত্য। বাঘও বিড়াল হয়। খুব তীব্র বৈরাগ্য না জন্মালে সংসার ছাড়ে না। খুব সাবধান।

মহাপুরুষদের কল্পনাতীত দারুণ ভোগ।

আজ ঠাকুর মগ্নাবস্থায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—উঃ কি কষ্ট! কি কষ্ট! দেখা যায় না। পিতামাতার উপরে কি বিষম অত্যাচার! কি ভয়ানক! সমস্ত সংসারেই ধর্ম্মের গ্লানি। আর এখানে থাক্‌তে চাই না। ভগবান্! এবার সব শেষ কর। সরায়ে নেও—আর দেখ্‌তে পারি না। উঃ।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন চোখ মুখ পুঁছিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সংসারের দুরবস্থা দেখে মহাত্মারাও ক্লেশ পান?

ঠাকুর—ক্লেশ মহাত্মারা পান না ত কে আর পান? এসব দেখে তাঁরা যে কষ্ট পান, তা অন্যে কল্পনাও কর্‌তে পারেন না। সংসারী লোকে তার এক আনিও পায় না। সাধে কি আর মহাত্মারা চলে যান? এসব দেখে সহ্য কর্‌তে পারেন না। চক্ষে পড়ে, না দেখেও উপায় নাই। সমস্ত সংসার পাপে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে। ধর্ম্ম আর নাই।

আমি—এই সংসার ছেড়ে গেলেই কি এসব আর তাঁদের চক্ষে পড়্‌বে না?

ঠাকুর—এ সংসার ছেড়ে গেলে, এসব দেখ্‌তে তাঁরা এখানে আস্‌বেন কেন? যেখানে থাকেন, সেখানকার অবস্থাই দেখেন।

সহানুভূতিহেতু মহাত্মারা সংসারীলোকের জন্য যে কষ্ট ভোগ করেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। মনে হইল, ক্লেশ ভোগই যদি হয়, তাহ'লে আর মহাত্মা হ'য়েই বা লাভ কি? ক্লেশের অত্যন্তনিবৃত্তির জন্যই ত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বরং আমরা ঢের ভাল আছি, নিজেদের ভোগমাত্র নিজেরা ভুগ্‌ছি। মহাত্মারা যে অসংখ্য জীবের ভোগ ভুগ্‌ছেন। আমাদের অপেক্ষা মহাত্মারা সুখী কিসে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেই স্মরণ হ'ল, ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন--**আনন্দও তাপ।** এই কথার অর্থ তখন ঠাকুরের কথায় বুঝিয়াছিলাম, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পরে জড়িত। যার যত দুঃখ বোধ, তার তত সুখের অনুভূতি। বিচ্ছেদে যার যত ক্লেশ, মিলনে তার তত আনন্দ। ক্লেশের স্মৃতি বা সংস্কার না থাকিলে আনন্দের অনুভূতি কি প্রকারে হইবে? দৃশ্যবস্তু বিষয়ে সংস্কার-বর্জ্জিত জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনও দর্শনের আনন্দ বা দর্শনাভাবের দুঃখ জানে না।

ভগবৎপদাশ্রিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা সুখ দুঃখ ও আনন্দ নিরানন্দের অতীত। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সুখ দুঃখাদি অঙ্গীকার করেন। আবার প্রত্যাহার করাও তাঁহাদেরই ইচ্ছাধীন। সাধারণের সেরূপ নয়। সাধারণে বদ্ধ, আর মহাত্মারা মুক্ত। যাহারা মায়ার অধীন, প্রারব্ধের অধীন, ছোটই হউক বা বড়ই হউক, তাহাদের সকলেরই সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, গড়ে ঠিক একই প্রকার।

ঠাকুরকে বলিলাম—ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে গুরুগীতা পাঠ করিতে লাগিলাম। নমস্কারমন্ত্র পাঠ যেমনই শেষ হইল, অমনি জাগিয়া পড়িলাম। আর একদিন ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় প্রাণায়াম কুম্ভকও চলিতে থাকে।

ঠাকুর বলিলেন—এ সব খুব ভাল। দিবসের ঐরূপ নিত্যকর্ম্মগুলি যখন নিদ্রাতেও হবে, তখনই ঠিক হলো। ওরূপ হ'লে বাসনা কামনা সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যায়। ক্রমে ক্রমে নামও নিদ্রাতে হয়। এসব প্রকাশ কর্‌তে নাই, নষ্ট হ'য়ে যায়।

তৃতীয় বৎসরে ৪ বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দান। ৬ বৎসরেই পূর্ণ হবে।

অদ্য প্রত্যুষে স্নান করিয়া নূতন উপবীত ও স্ফটিকের মালা লইয়া মন্দিরের সম্মুখে
২০শে শ্রাবণ ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরকে বলিলাম—গতকল্য
শুক্লাদশমী। আমার ব্রহ্মচর্য্য দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

ঠাকুর বলিলেন—বেশ, এখন কি চাও?

আমি—আপনি যা বল্‌বেন। যদি ব্রহ্মচর্য্য আবার দেন, তাই কর্‌বো।

ঠাকুর বলিলেন—ব্রহ্মচর্য্য যা দিয়েছি, তাই কর। ব্রহ্মচর্য্যের যে সকল নিয়ম বলা হ'য়েছে, এখন হ'তে খুব উৎসাহের সহিত তাই করবে। ব্রহ্মচর্য্য কিছু দীর্ঘকাল না কর্‌লে কিছুই ঠিক হয় না। ব্রহ্মচর্য্যই সকলের গোড়া। এটী ঠিক হ'লে অন্যান্য সাধন কিছুই কঠিন নয়। বার বৎসরের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য প্রায় হয় না। নয় বৎসর কর্‌লেই তোমার ব্রহ্মচর্য্য হ'য়ে যাবে বলেছিলাম—কিন্তু এখন দেখছি ততদিনও লাগ্‌বে না; এভাবে চল্‌লে

৬ বৎসরেই তোমার ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ হবে। দুই বৎসর হ'য়েছে—এখন ৪ বৎসরের জন্য নেও। ছয় বৎসর পূর্ণ হ'লে আমাকে জানাইও। ইচ্ছা হ'লে তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারবে। ছয় বৎসর ঠিকমত ব্রহ্মচর্য্য করলে এর পর অন্যান্য সাধন স্পর্শ-মাত্র হয়ে যাবে। বিশেষ চেষ্টাও করতে হবে না। ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনের ভিত্তি। এটী ঠিকমত হ'লে আর কোন উৎপাতই থাকে না। রিপু ছয়টী সংযত করতে পারলেই হলো। কাম ক্রোধাদি রিপু-গুলিকে বেশ ক'রে বশ কর। ইন্দ্রিয় সংযমই ব্রহ্মচর্য্যে প্রধান সাধন। কোনও রিপুর উত্তেজনা ক'মে গেলে তা কোথায়ও প্রকাশ করতে নাই। প্রকাশ করলে ঐ অবস্থা থাকে না—নষ্ট হ'য়ে যায়। কাম অপেক্ষাও ক্রোধ ভয়ানক। কাম রিপু সজন-নির্জ্জন, স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র, সুস্থাসুস্থ বুঝে কাজ করে, কিন্তু ক্রোধের সে সব বিচার নাই। যেখানে সেখানে যে কোন ব্যক্তির উপরে সুস্থাসুস্থ যে কোন অবস্থায় উহা মূর্ত্তিমান হয়। এজন্য ক্রোধকেই চণ্ডাল বলেছেন। ক্রোধের আবির্ভাব মাত্রে সাধক পতিত হয়। ক্রোধটিকে একেবারে দমন করার চেষ্টা কর। লোভের জন্য চিন্তা ক'রো না—ও ঠিক হ'য়ে যাবে। একবারেই ত সব হয় না। নিয়মমত কাজ ক'রে যাও—ধীরে ধীরে সমস্তই ঠিক হ'য়ে আস্‌বে। এখন হ'তে অধ্যয়ন কমায়ে দাও। গুরুগীতা এবং এক অধ্যায় ভগবদ্গীতা নিত্য পাঠ করো। গীতার একটী ক'রে শ্লোক রোজ মুখস্থ করো। সর্ব্বদা নাম করবে। নামে ডুবে থাক্‌বে। নামে যখন অবসাদ আস্‌বে, তখন কিছু সময় পাঠ ক'রে নিবে। বেশী পাঠ নিষেধ। অধিক পাঠে শুষ্কতা আসে। একথা তোমাকে আরও পূর্ব্বে বলবো মনে করেছিলাম। নামে রুচি জন্মিলে আর কিছু না করলেও হয়। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাক্‌লেই হয়।

আহারের নিয়ম যেমন পূর্ব্বে বলেছি—তাই। তবে এখন হ'তে অন্যের রান্না কোন বস্তুই গ্রহণ করবে না। আর ভিক্ষা ব্রাহ্মণের বাড়ী ব্যতীত অন্যত্র ক'রো না। তবে এই সাধনের লোক যে কোন জাতি হউন, তাঁদের নিকটে

ভিক্ষা কর্‌তে পার্‌বে। অর্থ কারও নিকটেই প্রার্থনা কর্‌বে না। অর্থের সংশ্রব ত্যাগ কর্‌বে। অন্য দশ জন যেমন দাদাদেরও তেমনি মনে কর্‌বে। বিশেষ বলে ভাব্‌বে না। নিজের জন্য কোন বস্তু সঞ্চয় করে রাখ্‌বে না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি যথামতে প্রতিপালন কর্‌বে। আর ৪ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর। তাহা হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। পরে যা কর্‌তে হবে, তখন বলা যাবে।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে স্ফটিকের মালা ও পৈতা নিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর ২।৩ মিনিট উহা ধরিয়া থাকিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন—**এই নেও, ধারণ কর।**

আমি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্ফটিক ও উপবীত ধারণ করিলাম। আমার উপরে ঠাকুরের অসাধারণ দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। প্রথম বৎসর ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—**ব্রহ্মচর্য্য অন্ততঃ বার বৎসর কর্‌তে হয়। কিন্তু এই ভাবে চল্‌লে তোমার বার বৎসরও কর্‌তে হবে না। নয় বৎসরেই হ'য়ে যাবে। তবে এখন এক বৎসরের জন্য নেও।** দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইলে, এবার ঠাকুর কহিলেন—**তোমার নয় বৎসরও কর্‌তে হবে না। ছয় বৎসরেই হয়ে যাবে। এবার ৪ বৎসরের জন্য নেও।**

গুরুতে এক নিষ্ঠাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের একমাত্র প্রয়োজন ও সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। একাগ্র মনে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতেছি, যদি তিনি আমার ব্রহ্মচর্য্যে সন্তুষ্ট হন ও কৃপা করেন—তাহা হইলে এই করুন, যেন তাঁর শ্রীচরণ ব্যতীত অন্য কিছুতেই আমার আনন্দ, আরাম ও অন্তরের আকর্ষণ না থাকে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যই যেন এ জীবনের অবলম্বন হয়। এখন আমার মনে হইতেছে, সর্ব্বগুণের আধার সদ্‌গুরুর উপাসনাই সার। অন্তঃবিশিষ্ট সীমাবদ্ধ জীবের অনন্ত অসীমের ধ্যান ধারণা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আমার স্বতন্ত্র পৃথক্ অস্তিত্ব বোধই আমি অসীম অনন্তকে অন্তঃবিশিষ্ট করিতেছি। আর ক্ষুদ্র আমি, গণ্ডুষমাত্র জলে যদি পিপাসার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তিলাভ করি, তাহা হইলে সাগর শুষিবার অনর্থক প্রয়াসে আমার প্রয়োজন কি? অন্তরের পূর্ণ তৃপ্তিই যখন জীবের একমাত্র লক্ষ্য, তখন তাহা ক্ষুদ্র লইয়াই হউক বা বৃহৎ লইয়াই হউক একই কথা। সমস্ত বাসনার নিবৃত্তির অর্থও নিজের অস্তিত্বমাত্র অনুভূতিতে পরিতৃপ্তি, ইহাই বুঝিতেছি। ভগবান্ কাহাকে বলে, জানি না।



শ্রীযুক্তেশ্বরী-মা-ঠাক্‌রুণ শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী

শুধু লোকের মুখে শুনিয়া অজ্ঞাত বস্তুর জন্য লোভও জন্মিতেছে না। গুরুদেব! দয়া কর, তোমার শান্তিময় শ্রীচরণে চিত্ত সংলগ্ন হেতু সমস্ত বাসনার উপশমে যেন চিরশান্তি লাভ করি।

মাঠাকুরাণীর ঝুলন, চণ্ডীপাঠে পূজা।

২৪শে—শ্রাবণ, রবিবার।

আজ মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর বলিলেন—আহা কি সুন্দর! কি শোভাই হয়েছে। ঝুলনের সিংহাসনে বসে ভগবতী ঝুল্‌ছেন।

আমি—কোথায় ভগবতী ঝুল্‌ছেন?

ঠাকুর—তা কি বলা যায়? চোখে পড়্‌ল, দেখ্‌লাম। বোধ হয় ঢাকায়ই।

আমি—ঢাকায় ত কোথায়ও ওরূপ ঝুলন দেখি নাই, শুনিও নাই। মাকে ঝুলনে তুল্‌লে হয় না? মা তো আমাদের আদ্যাশক্তি ভগবতী; শুধু চণ্ডীপাঠ কর্‌লে তাঁর পূজা হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, তাতেই ঠিক হয়। কিন্তু কে পাঠ কর্‌বে? তুমি রোজ একটু একটু মন্দিরে চণ্ডীপাঠ কর্‌লে পার। কিন্তু নিত্য কর্ম্মের পূর্ব্বে পাঠ কর্‌তে হবে। রোজ এক অধ্যায় ক'রে পাঠ করো। আগামী কল্য হইতে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ মাঠাকুরাণীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করিব স্থির করিলাম।

২৫শে—শ্রাবণ, ঝুলন পূর্ণিমা।

আজ সকালবেলা হইতেই ছেলেদের মনে মহা উৎসাহ। ঝুলনের সাজ সজ্জা করিয়া মাকে দোলায় তুলিতে সকলেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষা। তাহারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পত্র পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মাঠাকুরাণীর মন্দির ও চৌচালার দক্ষিণদিকের বারান্দা পরিপাটি করিয়া সাজাইল। পরে একখানা জলচৌকি সুসজ্জিত করিয়া তদুপরি রাধাকৃষ্ণ ঠাকুরের সহিত মাঠাকুরাণীকে বসাইয়া দোলাইতে লাগিল। বড়ই চমৎকার শোভা হইল। ঠাকুর দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ছেলেদের সৎউৎসাহ ও সৎভাবের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই উৎফুল্ল মনে ছেলেদের উৎসবে যোগ দিলেন। বহু লোকের সম্মিলনে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুরুভ্রাতারা ঝুলন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সকলে সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দ করিয়া লুটের প্রচুর প্রসাদ সংগ্রহান্তে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

আমগাছের নালিস, গায়ে পেরেক মেরেছে।

ঠাকুর প্রত্যূষে আসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই বলিলেন—**আহা! আমগাছটি বড়ই ক্লেশ পেয়েছে। আমাকে বল্‌লে, আমার বুকে পেরেক মেরে রেখেছে, যন্ত্রণায় সারারাত আমার ঘুম হয় নাই।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা আমতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুরের আসনের উপরে চাঁদোয়া টাঙ্গাইবার জন্য গাছটিতে ছেলেরা একটী লোহা পুঁতিয়া রাখিয়াছে। রক্তের মত লাল রস ঐ স্থান দিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুরের আদেশ মত তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া ফেলা হইল। প্রতিদিন ঠাকুর সকালে আসন হইতে উঠিয়া যেমন পাখীদের চাউল ছড়াইয়া দেন, সেই প্রকার আশ্রমস্থ বৃক্ষলতাদির নিকটে যাইয়াও প্রত্যেকটীর খবর লইয়া থাকেন। ইহারা নাকি ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন। স্ব স্ব গণ্ডীতে ইহারাও নাকি ঠিক মানুষেরই মত সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন প্রয়োজনে অনুভবশীল। মনুষ্য, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির দেহ সংরক্ষণ ও পোষণার্থে পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভগবান্ যেমন চৈতন্য সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, বৃক্ষলতা স্থাবর জঙ্গমাদিরও পুষ্টিসাধন কল্পে তিনি সেই প্রকার তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ ইন্দ্রিয়ে যথাযোগ্য চৈতন্য সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্ভুত ভগবানের সৃষ্টি কৌশল!

২৬শে—শ্রাবণ,
৮ই আগষ্ট ১৮৯২।

ভোজনারম্ভে ঠাকুরের শ্রীহস্ত—আমাকে এক গ্রাস দাও।

আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঠাকুর আহারান্তে পূবের ঘরেই রহিলেন। অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে অন্যান্য দিনের মত কাটাইয়া রান্না করিতে আসিলাম। চাল, ডাল, নুন, লঙ্কা ও ঘৃত একেবারে উনানে চাপাইয়া খিঁচুড়ি রান্না করিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—**রান্না যেমন হ'য়ে যাবে, অন্ন অমনি ঢেলে নিয়ে নিবেদন ক'রে আহার কর্‌তে আরম্ভ করো।** আমি উনান হইতে খিঁচুড়ি কলাপাতার উপরে ঢালিয়া ঠাকুরকে নিবেদনান্তে নমস্কার করিলাম। পরে উত্তপ্ত খিঁচুড়ি নাড়াচাড়া করিয়া আহারের জন্য যেমন গ্রাস তুলিতে প্রবৃত্ত হইলাম, হঠাৎ দেখি বাহির হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া সরসর্ শব্দে ঠাকুরের হাতখানা পাতার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর ধীরে ধীরে বলিলেন—**ব্রহ্মচারী! তোমার রান্না**

অন্ন আমাকে এক গ্রাস দেও—আমি খাবো। আমি অমনি ঐ গ্রাস ঠাকুরের হাতে দিয়া আরও দিব বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঠাকুর খাইতে খাইতে বলিলেন—কি চমৎকার স্বাদ! তোমার মত সুস্বাদু অন্ন এদেশে কেহ খায় না। আর অপেক্ষা ক'রো না। প্রসাদ পাও। আমি ঠাকুরের কথামত আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। ঠাকুরের হাতে একটু জল দিতেও স্মরণ হইল না। ঠাকুর উঠানে দাঁড়াইয়া অন্নের প্রশংসা করিতে করিতে শান্তি, কুতু প্রভৃতিকে বলিলেন—তোরা এক একদিন এক একজনে ব্রহ্মচারীর রান্না এক গ্রাস ক'রে খেয়ে দেখিস্। কি অপূর্ব্ব স্বাদ, বুঝ্‌তে পার্‌বি। আমাকে কহিলেন—তোমার আহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ। এক গ্রাসের অধিক দিও না। প্রতিদিন এক গ্রাস ক'রে দিও।

আহারের সময়ে ঠাকুরের দয়া স্মরণ করিয়া কেবলই কান্না পাইতে লাগিল। অকস্মাৎ নিজ হইতে ঠাকুর এই দুরাচার পাষণ্ডকে কেন এত দয়া করিলেন, বুঝিলাম না। ৪।৫ সেকেণ্ড পরে যদি ঠাকুর হাত পাতিতেন, তবে আমি কি করিতাম? কোন্ সময়ে আমি আহার করি কোন প্রকারেই কারও জানিবার উপায় নাই। ঠাকুরের সমস্তই অদ্ভুত! এত কাণ্ড দেখিয়াও মনটি আজও গুরুমুখী হইল না। দুর্দ্দশা আর কাকে বলে?

আমার পরমায়ুঃ পরিষ্কার দর্শন।

২৬শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

আজ মহাভারত পাঠান্তে আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া নাম করিতেছি, মনটি নামে একেবারে ডুবিয়া গেল। নয়ন মুদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মত দেখিলাম—উজ্জ্বল কাল একখানা চতুষ্কোণ মার্ব্বেল পাথরের 'সাইনবোর্ড' আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুরের সম্মুখে আমার নিকটে আসিয়া থামিল। তাহাতে অঙ্কিত একখানি মুষ্টিবদ্ধ হস্ত তর্জ্জনী সঙ্কেতে উজ্জ্বল জ্যোতিঃসমন্বিত নিম্নলিখিত স্বর্ণ অক্ষরগুলি নির্দ্দেশ করিতেছে—"প্রাণায়াম ও কুম্ভকযোগে তোমার পরমায়ুঃ (* *) বৎসর।" আমার দেখার পরই 'সাইনবোর্ড' খানা উড়িয়া অদৃশ্য হইল। আমিও অমনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া ঠাকুরকে সমস্ত জানাইলাম। ঠাকুর কহিলেন—দেখ্‌লে, সে তো ভালই হলো। তবে যা দেখেছ, ঠিক্ তাই যে হবে—

তাও বলা যায় না। হ'তেও পারে, আবার কোন কারণে নাও হ'তে পারে। সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌তে হয়। ঠাকুরের কথায় মনে হইল, মৃত্যুর একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহাই মাত্র দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর ইচ্ছা করিলে যতকাল তাঁর অভিপ্রায়, সংসারে রাখিতে পারেন।

ঠাকুরের জটা বাছা—প্রাণধারণ করিতে জীবহিংসা অনিবার্য্য।

মধ্যাহ্নে পাঠের পর প্রত্যহই কিছু সময় ঠাকুরের জটা বাছিয়া থাকি। সম্মুখের বড় জটাটির গোছার ভিতরে স্থানে স্থানে অসংখ্য ছারপোকা বাসা করিয়াছে। এক একটী আড্ডায় প্রায় ৩০।৪০টী বা ততোধিক ছারপোকা জড় হইয়া রহিয়াছে। একটীকে তুলিতে গেলে অবশিষ্টগুলি ছুটিয়া পালায় এবং জটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হয়। এই জন্য আড্ডার ছারপোকা তুলিতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া, অঙ্গুলিদ্বারা উহা একেবারে ডলিয়া ফেলি। মাথার সর্ব্বত্র যে সকল উকুণ ও ছারপোকা চলিয়া বেড়ায়, তাহাইমাত্র ধরিতে পারি। রক্তখেয়ে ছারপোকাগুলি এত পুষ্ট হয় যে স্পর্শ মাত্রে গলিয়া যায়। এইরূপে প্রত্যহ অসংখ্য প্রাণী বধ করিতেছি। কি করিব? উপায় নাই। ভাবিলাম শরীরের বহুবিধ রোগ অসংখ্য বিজাতীয় অনিষ্টকর কীটাণু সমাবেশেই উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগে সে সকলের বিনাশ সাধন না করিলে রোগের শান্তি হয় না। দৈহিক উৎকট ব্যাধির উপশমার্থে প্রাণীবধ অপরিহার্য্য। হিংসা বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রণোদিত নয় বলিয়া তাহাতে অন্তরকে স্পর্শ করে না—পাপ বলিয়াও মনে হয় না; বরং রোগের আরোগ্যে প্রাণে আনন্দই অনুভব হয়। ছারপোকা বাছিবার কালে ঠাকুর ধ্যানস্থ থাকেন। আমি কি করি না করি, তাহাতে ঠাকুরের মনোযোগ না পড়িবারই কথা। কিন্তু গোছা ডলিয়া দিলে ঠাকুর মধ্যে মধ্যে **হরিবোল, হরিবোল** বলিয়া উঠিয়া পড়েন। ঠাকুর সোজা উপবিষ্ট থাকিলে আমি পশ্চাৎদিকে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ছারপোকা দেখি, কখনও কখনও বামপার্শ্বেও বসিতে হয়।

হুঁকা-কল্কিভাঙ্গা—তামাক ত্যাগ। ঠাকুরের তামাক সেবন।

গতকল্য ঠাকুর আমার মুখের গন্ধ পাইয়া বলিলেন—**তামাক খেয়ে এসেছ?—বড় দুর্গন্ধ!** ঠাকুরের কথা শুনিয়া লজ্জা ও দুঃখে নিজ আসনে আসিয়া চুপ করিয়া

বসিলাম এবং স্থির করিলাম, কল্য হইতে ধূমপান ত্যাগ করিব; না হ'লে ঠাকুরের অঙ্গসেবা আর করিব না। অদ্য প্রত্যূষে আসন হইতে উঠিয়া হুঁকা কল্কি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া আনিলাম। পরে ফুল জল দিয়া উহা পূজা করিয়া নমস্কার করিলাম। তৎপরে কল্কির উপরে হুঁকার খোল দ্বারা সজোরে আঘাত করিয়া দুইটীই চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরের চা সেবার সময়ে গুরুভ্রাতারা এই কথা তুলিয়া খুব হাসাহাসি করিলেন। তামাক না খাওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—কি? তুমি হুঁকা কল্কি ভেঙ্গে ফেলেছ? কেন? তামাক খেলে মুখে গন্ধ হয় ব'লে? জটার ছারপোকা যখন বাছ্‌বে, মুখ ধুয়ে নিও—তা হ'লেই গন্ধ থাক্‌বে না। সুগন্ধ তামাক খেলেও তো পার। তাতে তামাকের গন্ধ হয় না। তামাক না খেলে যখন কষ্ট হয়, খাবে না কেন? নিষেধ তো নাই। যাও, এখন গিয়ে এক ছিলিম তামাক খাও।

অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ঠাকুর বলিলেন—একটী হুঁকা পেলে আমিও তামাক খেতাম। ঠাকুরের কথা শুনামাত্র গুরুভ্রাতারা দু তিন জন বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পটুয়াটুলি ও ইস্‌লামপুর ঘুরিয়া সুগন্ধি তামাক ও একটী হুঁকা নিয়া আসিলেন। ঠাকুরকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হলো। ঠাকুর তামাকে একটী টান দিয়াই কাশিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। বাবা! এই নেও—রক্ষা কর! বলিয়া হুঁকাটি সাম্‌নে ধরিলেন। জগবন্ধুবাবু হুঁকাটি প্রসাদী বলিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য লইয়া গেলেন। উহা লইয়া গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একটু মনান্তর হইল।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি আর কখনও পূর্ব্বে তামাক খেয়েছেন?

ঠাকুর—হাঁ, আমি যে খুব তামাক খোর ছিলাম। কারোকে তামাক খেতে দেখ্‌লেই তামাক খেতে ইচ্ছা হতো। একদিন কলিকাতায় রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে একটী বড়লোকের বাড়ীর দরজায় দারোয়ান তামাক খাচ্ছে, দেখে খেতে ইচ্ছা হলো। তার খাওয়া শেষ হ'তেই আমি কল্কির জন্য হাত বাড়ালাম। দারোয়ান হিন্দুস্থানী, আমাকে খুব গালি দিয়ে তাড়ায়ে দিলে। আমার বড়ই অপমান বোধ হলো। ভাব্‌লাম আমি অদ্বৈতবংশের গোস্বামী;

একটু তামাকের জন্য একটা সাধারণ দারোয়ান আমাকে এত গালি দিলে? আর আমি তামাক খাব না। সেই হ'তে আর তামাক খাই নাই। জাতির অভিমান, বংশের অভিমান, এ সকলে অনেক সময়ে মানুষকে রক্ষা করে। একটু থামিয়া আবার বলিলেন—যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁদের অনেকের তামাক খাওয়া প্রয়োজন হয়। অনেকের তামাকে উপকারও হয়। 'রম্‌তা' সাধুরাও একটা কিছু না হ'লে পারেন না, তাঁদের অনেকেই হয় গাঁজা, না হয় চরস অথবা তামাক খেয়ে থাকেন।

পূর্ব্বজন্মে নিষ্ফল ব্রহ্মচর্য্য, ঠাকুরের সার উপদেশ—সাধন ভজন জেগে থাক্‌বার জন্য, কৃপাই সার।

আজ মধ্যাহ্নে অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি পূর্ব্বে কখনও কি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলাম? ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, গতবারও সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলে।

আমি—আমার কি গতবারও ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হ'য়ে ছিল?

ঠাকুর—হাঁ; তবে তা কিছুই হয় নাই।

আমি—সেদিন আপনি স্বপ্নে আমাকে বলেছিলেন, দশ বৎসর তুমি ব্রহ্মচর্য্য কর্‌লেই সন্ন্যাস অবস্থা লাভ কর্‌বে।

ঠাকুর—স্বপ্নে যা বলা হয়, তার অর্থ কি সব সময়ে বুঝা যায়? দশ বৎসর বল্‌তে কত সময়, তা তো বলা যায় না।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। ভাবিলাম এ কি সর্ব্বনাশ! গতবার সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভের পরও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম? প্রবৃত্তির প্রতিকূলে কোন সাধন ভজনই কি আমি করিয়াছিলাম না? অথবা প্রারব্ধ এতই বলবান্ যে ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না? তবে এবার আবার ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিলেন কেন? মুনি ঋষিদের কলিজার ধন পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত এবারও কি আমাদ্বারা কলঙ্কিত হইবে? দুটী বৎসর প্রাণপণে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াও ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা বা দৈহিক বিকারের কোন একটীর এপর্য্যন্ত শান্তি হইল না। মনের মলিনতা দূর তো

বহু দূরে। কঠোর বৈরাগ্য বা তীব্র সাধন ভজনে আমার সামর্থ্য নাই—প্রারব্ধ কাটিবেই বা কি প্রকারে? শুনিতে পাই, 'ঠাকুরের কৃপায় সবই হয়,' কিন্তু ঠাকুরের কৃপার উপরে আমার নির্ভর বা ভরসা কোথায়? প্রাণে যথার্থ কাতরতা না আসিলে নির্ভর বা ভরসা তো অর্থ শূন্য কথা। উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত নিরুপায় রোগী যে ভাবে চিকিৎসকের নিকট আরোগ্য আকাঙ্ক্ষা করে, একটী বারও কি আমি সেইভাবে ঠাকুরের পানে তাকাইতে পারিয়াছি? আমার যিনি ঠাকুর তিনি পরম দয়াল, তিনিই আবার মহাসামর্থ্যী, বিশেষতঃ আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, ইহা যদি একটুকু বিশ্বাস করিতাম, তা হ'লে আর চিন্তা ছিল কি? সকল দুরবস্থায়ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া আনন্দে বগল বাজাইয়া বলিতাম 'সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়, চিরজীবী করিলেন গোঁসাই'—এই সকল ভাবিয়া প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল; দারুণ ক্লেশ হইতে লাগিল। কান্নার বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, ঠাকুর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন—এই সময়ে মাথা তুলিয়া আধফুটন্তস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—ভগবানের কৃপাই সার। আর কিছুই কিছু নয়। সাধন ভজন শুধু জেগে থাক্‌বার জন্য—যেন তাঁর কৃপা এলে ধর্‌তে পারি। সাধন ভজন ক'রে কার সাধ্য তাঁকে লাভ করে? সাধন ভজন ক'রে তাঁকে লাভ কর্‌তে হয়, একথা কিছু নয়। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁর কৃপা হ'লেই তাঁকে পাওয়া যায়। একটু থামিয়া আবার বলিলেন—নিজের তৃপ্তির জন্যও লোকে সাধন ভজন করে। মানুষের যেমন ক্ষুধা পায়, পিপাসা পায়, তখন অন্ন জল না পেলে স্থির থাক্‌তে পারে না, অভাবে খুব কষ্ট হয়; ভগবানের নাম নেওয়া, তাঁর পূজা অর্চ্চনা করাও সেই প্রকার। উহা না ক'রে পারা যায় না। কর্ম্ম শেষ না করলে তাঁকে পাওয়া যায় না—একথাও ঠিক্ নয়। কর্ম্ম শেষ হ'তে কি আর লাগে? তাঁর কৃপা হ'লে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যায়। মহারাণী যখন এম্‌প্রেস্ হ'লেন তাঁর একটী হুকুমে কত শত লোকের বহুকালের মিয়াদ একবারে খালাস হ'য়ে গেল। ভগবানের কৃপা হ'লে, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে, সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত প্রারব্ধ, এক মুহূর্ত্তেই শেষ হ'য়ে যায়। তাঁর কৃপাই সব। আর

কিছুই কিছু না। কাতরভাবে তাঁরই দিকে তাকায়ে থাক। তাঁর কৃপাই সার।

ন্যাসের উপকারিতা—অনুভূতি পরমানন্দ।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর আমাকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে ন্যাস করিয়া দেখিতেছি, ইহা এক অদ্ভুত জিনিষ। নিজ শরীরে প্রত্যেকটী তত্ত্বের ন্যাসকালে সেই সেই তত্ত্বের আধার স্থানে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্মৃতি আপনা আপনি সমুদিত হয়। নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া চিত্তটিকে উহাতে নিবিষ্ট করিয়া ফেলে। তখন নামটি আধারে মিলিয়া যায় এবং ঠাকুরের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। একটী তত্ত্বে মনের অভিনিবেশ হইলে তাহা ছাড়িয়া অপরটিতে প্রবেশে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি ও ক্লেশ অনুভব হয়। বাক্, পানি, পায়ু, পাদ, উপস্থ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত; ইহার প্রত্যেকটী ইষ্টমন্ত্রে, ইষ্টদেবে ন্যাস করিয়া উহাতে ইষ্টদেবকেই মাত্র দর্শন করিয়া থাকি। এই সময়ে নিজের অস্তিত্ব বুদ্ধি—একমাত্র দর্শনানুভূতি—নাম সংযোগে ইষ্টমূর্ত্তিতে সংলগ্ন হওয়ায়, নাম, নামী ও নামকারী একই হইয়া যায়—পৃথকবোধ আর থাকে না; উহাতে পরমানন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমস্তটি দিন এই ন্যাস লইয়াই থাকিতে ইচ্ছা হয়। কখনও কখনও ফুল, তুলসী, চন্দন লইয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূজা করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ঠাকুরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—যাহা কর, মনে মনে করাই ভাল। বাইরে ওসব কিছু কর্‌তে নাই। ন্যাসের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় রেখো। নিত্য-ক্রিয়ার প্রথমেই ন্যাস কর্‌তে হয়। ন্যাসের ভাব সর্ব্বদা অন্তরে রাখ্‌তে হয়।

৩০শে শ্রাবণ, শনিবার।

মনসা পূজা। ইষ্টমন্ত্রে তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর পূজা হয়।

সকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, শ্রীযুক্ত কুঞ্জঘোষ মহাশয়ের বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—'আজ মনসাপূজা। আমাদের বাড়ী মনসা-পূজা হবে, পুরোহিত কোথা থেকে আন্‌ব?'

১লা—৭ই ভাদ্র, ১২৯৯ সন।

ঠাকুর বলিলেন—**কেন? ব্রহ্মচারী গিয়ে পূজা ক'রে আস্‌বে।** বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন, পরে ঠাকুরকে বলিলাম—মনসা পূজা কর্‌বো ব'লে দিলেন। কিন্তু আমি তো মনসা পূজা জানি না।

ঠাকুর বলিলেন—**ইষ্টনামে পূজা ক'রো, তাতেই হবে। ঐ নামে তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীরই পূজা কর্‌তে পার।**

আমি ঠাকুরের অনুমতি লইয়া বেলা প্রায় ১ টার সময়ে মনসা পূজা করিতে কুঞ্জবাবুর বাড়ী গেলাম। পশ্চিমের ঘরে পূজার বিবিধ প্রকার আয়োজন দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি পূজায় বসিলাম। কুঞ্জবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া পূজার অনুষ্ঠান দেখিয়া একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন যে তিনি এ সকল পূজার কিছুই আবশ্যকতা মনে করেন না; আর যার তার দ্বারা এসব পূজা ঠিকমত হয়ও না। কুঞ্জবাবুর এইরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়া আমার প্রাণে একটু লাগিল। যাহা হউক, আমি মনসা দেবীকে আহ্বান করিয়া ইষ্টমন্ত্রে দেবীমূর্ত্তিতে নিজ ইষ্টদেবেরই পূজা করিলাম। দক্ষিণা গ্রহণ করিতে ঠাকুর নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং পূজার পর তাহা না লইয়া আশ্রমে আসিলাম, এবং ঠাকুরের নিকট বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর আমাকে পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি সমস্ত বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—**গৃহস্থ-ঘরে এসব পূজা অর্চ্চনা ব্রত উপবাসাদি বিশেষ প্রয়োজন। এতে ধর্ম্ম জাগ্রত থাকে।** অপরাহ্নে কুঞ্জবাবু আসিয়া একটু যেন সলজ্জভাবে আমাকে বলিলেন—"দেখুন, আপনি পূজা ক'রে এসেছেন, পরে ঘরখানা আশ্চর্য্য সুগন্ধময় হ'য়েছে; ঐ ঘরে প্রবেশ করা মাত্র আমার শরীর মন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল; কতবার গিয়ে দেখ্‌লাম—সমস্তটি দিন ঐ ঘরে এমন একটা সুগন্ধ র'য়েছে যে ওরূপ গন্ধ আর আমি কখনও পাই নাই। মনসা দেবী যেন ওখানে আবির্ভূত, এরূপ পরিষ্কার বোধ হচ্ছে। বড়ই আশ্চর্য্য।"

কুঞ্জবাবুর কথায় আমার আনন্দ হইল, প্রাণে যে ক্লেশ পাইয়াছিলাম তাহা একেবারে মুছিয়া গেল। মনে হইল, এ সমস্তই ঠাকুরের কৃপা। ঠাকুরের পূজা যেস্থলে হইয়াছে তাহা সাধারণের নিকটে অজ্ঞাত থাকিলেও ঠাকুরের একান্ত ভক্তজন সেইস্থলে আপনা আপনি অবশ্যই আকৃষ্ট হইবেন, এবং অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেই স্থানের বিশেষত্বও কিছু না কিছু নিশ্চয়ই অনুভব করিবেন। পূজাটি যে আমার ঠিকভাবে হইয়াছে,

কুঞ্জবাবুর এই পরিবর্ত্তনই তাহার একটী নিদর্শন মনে হয়। ঠাকুর দয়া করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করিলেন, ভাবিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর দয়া কর। সর্ব্বঘটে তোমারই অধিষ্ঠান বুঝিয়া ও তোমার পূজা করিয়া যেন ধন্য হই।

ঠাকুরের দন্তের কথা—পৈতা নাই ?—সূক্ষ্মশরীরে মহাপুরুষের কার্য্য।

আমাদের আশ্রম হইতে দু তিন মিনিটের পথ দক্ষিণে বড়পুকুরের পূর্ব্বপারে আশানন্দ বাউল একটী আখ্‌ড়া করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তিনি ঠাকুরের নিকটে আসিয়া থাকেন। ঠাকুরের নিকটে বহুলোকের সমাবেশ দেখিলেই সাধারণতঃ তিনি নিজের অলৌকিকত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার তত্ত্বকথা উপদেশ করিতে থাকেন। যাঁহারা ঠাকুরের মুখে দুচারিটী কথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় আশ্রমে আসেন, তাঁহারা উঁহার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যান। গতকল্য মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া, আশানন্দ বলিলেন—গোঁসাই! আমাকে দেখে কি কিছু বুঝ্‌তে পারেন ?

ঠাকুর—কি বুঝ্‌ব ?

আশানন্দ—আপনার দৃষ্টিশক্তি আছে, কিছু তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করেছেন। আচ্ছা, আমার দিকে একবার একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি ক'রে দেখুন দেখি।

ঠাকুর বলিলেন—কৈ ? কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

আশানন্দ একটুকু যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না ? দৃষ্টিটা এখন ততদূর পরিষ্কার হয় নাই। ভাবুন, আমার ৮।১০ হাজার শিষ্য, সকলেই আমাকে অবতার বলে। তারা যে ভাবুকতা ক'রে বলে তা নয়—তারা বাস্তবিকই এমন সব বিভূতি আমার ভিতরে দেখে যে, তাদের ওরূপ না ব'লেই উপায় নাই। আর দেখুন, শাস্ত্রে কল্কি অবতারের যে সব লক্ষণ আছে, আমার সঙ্গে তার অক্ষরে অক্ষরে মিল।

ঠাকুর—কি কি লক্ষণের সঙ্গে মিল আছে ?

আশানন্দ—কারোকে বল্‌বেন না, আপনাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাচ্ছি, এই দেখুন। এই বলিয়া নাকের এক পার্শ্বে একটী তিল দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন ত ? আপনি বুঝি এটা লক্ষ্য করেন নাই ?" আমি আশানন্দের ভঙ্গী দেখিয়া

কিছুতেই আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুর কোনই কথা না বলিয়া চোখ্ বুজিলেন ; আশানন্দও আপন আখ্ড়ায় চলিয়া গেলেন।

আজকাল 'অবতারের' ছড়াছড়ি। অনেকেই অবতারের 'সার্টিফিকেট' পাইতে গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হন। পরে নিরাশ হইয়া ক্রোধবশে গালাগালি দিয়া চলিয়া যান। আজ অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময়ে আশানন্দের এক শিষ্য ঠাকুরের নিকটে আসিলেন। পূবের ঘরে বহু লোকের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং আশানন্দের অদ্ভুত শক্তির বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুরকে বলিলেন—"সহরে বুঝি এখন আর কল্কি পান না ? গুণ সকলেই টের পেয়েছে ; তাই জঙ্গলে এসে এখন সাধু হ'য়ে বসেছেন। অদ্বৈত বংশের কুলাঙ্গার ! পৈতা ফেলে, জাতি-ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হ'য়ে, বহুলোকের এখন সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন। হুঁঃ! ব্রাহ্মণদেরও আবার দীক্ষা দিচ্ছেন ; গোঁসাইরা কবে, কোথায়, কে পৈতা ফেলেছেন ?" উহার এই প্রকার গালি শুনিয়া সকলেই অবাক্, ঠাকুরও চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ খুব তেজের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"পৈতা নেই ? দশ গণ্ডা পৈতা এখনই বের ক'রে দিতে পারি। তুই কি ক'রে দেখ্‌বি ? তুই যে অন্ধ !" কথা শেষ হওয়া মাত্রই সুভড্যা নিবাসী সাধু যদুবাবু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। "একি রে ! একি রে !" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই এসময়ে যদুবাবুকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সেই গোলমালের ভিতরে আশানন্দের শিষ্যটি বাহিরে আসিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পালাইলেন। যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে যদুবাবু ক্রমশঃ সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কোনরূপ কথাবার্ত্তা না বলিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অদ্য মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে বলিলাম—"লোকটা কাল আপনাকে গালাগালি ক'রে, ভয়ে ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল ; না হ'লে আমাদের কারও কারও হাতে হয়ত সে মারই খেতো। আপনাকে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর কখনও এমন দম্ভের সহিত এভাবে কারোকে ধমক দিতে দেখি নাই।"

ঠাকুর—কি ? ধমক দিয়েছিলুম ? কৈ ? আমার ত কিছুই মনে নাই।

আমি—'দশগণ্ডা পৈতা এখনই বের ক'রে দিতে পারি, তোর চোখ নাই, অন্ধ ; দেখ্‌বি কি ক'রে ?' এই সব কথা খুব জোর ক'রে তাকে শুনিয়ে দিয়েছেন।

আমার কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—**কি ব'লছ? আমি ওরূপ বলেছি? না, আমি বলিনি ত?**

আমি—হাঁ, আপনিই বলেছেন, আপনারই ত গলার আওয়াজ পেয়েছি।

ঠাকুর—**এ সব কথা যে আমার মুখ দিয়ে বের হয়েছে, আমার মনেই পড়ে না। তবে একটী ব্রাহ্মণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে ওরূপ কি কি বলেছিলেন বটে। বলেই অমনি তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। তোমরা তা লক্ষ্য কর নাই?** একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন—**আশ্চর্য্য! মহাত্মাদের ভিতর দিয়ে কত প্রকার ঘটনাই হয়। ভগবানের আশ্রিত জনের প্রতি কোনও প্রকার অত্যাচার অপমান হলে তা তাঁরা সহ্য করেন না। মহাপুরুষেরা যে শাসন করেন, দেখা যায়, তা অনেক স্থলে প্রায় এইরূপই হয়। অনেক সময়ে তাঁরা নিজেরা কিছুই করেন না।**

গত কল্য উক্ত ঘটনার পরে হঠাৎ যিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন অদ্য সেই যদুবাবু আশ্রমে আসিয়া সকলের নিকটে বলিলেন—"মহাপুরুষদের সমস্তই অদ্ভুত! লোকটা যখন গোসাইকে ঐ রকম গালাগালি কর্‌ছিল, একটী গৌরবর্ণ পবিত্রমূর্ত্তি তেজস্বী ব্রাহ্মণ গোঁসাইয়ের ঠিক দক্ষিণপার্শ্বে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে লোকটাকে খুব ধমক দিয়ে বল্‌লেন, 'পৈতা দেখ্‌বি কি ক'রে? চোখ নাই, তুই ত অন্ধ।' এই সব দেখে শুনে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। ব্রাহ্মণটিও তৎক্ষণাৎ এইখান থেকে চলে গেলেন।"

যদুবাবুর কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। যদুবাবুর মুখে এই সব কথা না শুনিলে আমার ভিতরের এ খট্‌কা দূর হইত কি না বিশেষ সন্দেহ। হা অদৃষ্ট!

ঠাকুরের মুখে ছোটদাদার কথা—পিতার চরিত্র।
তান্ত্রিক সাধন বড় কঠিন।

আজ মহাভারত পাঠের পর পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, ঠাকুর নিজ হইতেই ছোটদাদার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—ছোটদাদা পাঠ্যাবস্থায় পড়া-শুনা ছাড়িয়া কফাশ্রিত বায়ুরোগে দুই বৎসর বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। বহুবিধ চিকিৎসাতেও বিশেষ কিছু উপকার হইল না। এখনও তিনি ঐ রোগে সময় সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা পান।

ঠাকুর কহিলেন—সারদা একটী বিশেষ ব্যক্তি। আহা! এরূপ লোকও আবার সংসারে আসে? বড়ই চমৎকার! এরকম হৃদয় দেখা যায় না, কোন গোলমাল নাই, ভিতর বাহির এক। উহার সেবা ভাব বড়ই অদ্ভুত সাধারণের মত নয়। উহার প্রকৃতিই ঐ প্রকার, বড়ই সুন্দর।

ঠাকুর কথায় কথায় আমার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিছুই জানিনা, সুতরাং খুব সঙ্ক্ষেপে বলিলাম। আমার ৪।৫ বৎসর বয়সে পিত্তশূল রোগে পিতা কলিকাতায় গঙ্গার তীরে দেহত্যাগ করেন। তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন। সাধনভজনেই দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। পরিবার ভরণ পোষণ করিয়া সমস্ত অর্থ লোকের হিতার্থে ব্যয় করিতেন। সঞ্চয় কখনও করিতেন না; বরং দেহত্যাগকালে বিস্তর ধার রাখিয়া গিয়াছিলেন। বেলপুকুরের রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে একটী তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষ বাবার গুরু ছিলেন। সংসারে থাকিয়া সাধন-ভজন রীতিমত হয় না বুঝিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। বাবার গুরুদেব নানাস্থান অনুসন্ধানের পর বাবাকে পাইয়া আবার গৃহে নিয়া আসেন। তান্ত্রিক সাধনে নাকি কালো মেয়ের প্রয়োজন হয়, এজন্য অধিক বয়সে তিনি আবার বিবাহ করেন। মদ কখনও খাইতেন না, কিন্তু মহাশঙ্খের মালার জন্য মদ ব্যবহার করিতেন। অনেক সময়ে সমস্ত রাত্রি ঐ মালাজপে কাটাইয়া দিতেন। অত্যন্ত চরিত্রবান্ ছিলেন। বাড়ীতে ও পাড়ার বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাই, তাঁকে কখনও কেহ কোন অবস্থায় ক্রোধ করিতে দেখেন নাই; ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

ঠাকুর—তোমার সেই বিমাতা বুঝি বর্ত্তমান নাই?

আমি—না; আমার ছোট ভাই রোহিণীকে ছ'মাসের রেখে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুর—হাঁ, ছেলে হ'ল ব'লেই তিনি মারা গেলেন। ওসব তান্ত্রিক সাধন বড়ই কঠিন। আজকাল ওতে কৃতকার্য্য হ'তে বড় দেখা যায় না।

হঠকারিতায় রোগবৃদ্ধি—দুগ্ধপান ব্যবস্থা।

কিছুকাল যাবত আমার শরীর পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রোগের হেতু কি নিশ্চয় বুঝিতেছি না। মনে হয়, আহারের অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতাই ইহার কারণ। সকালে একবার একটু চা খাই মাত্র। পরে সন্ধ্যার সময়েও শুধু নুন দিয়া জলভাত খাইয়া থাকি। অন্নের পরিমাণও কমাইয়া, ক্রমশঃ জলের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছি; কিন্তু শরীর

বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। হাত পা কিছুক্ষণ এক অবস্থায় রাখিলেই ঝিম্ ঝিম্ করে ও বেদনা বোধ হয়, এবং সময়ে সময়ে আপনা আপনি বিভিন্ন সন্ধিস্থলে খিল ধরে; সাধন ভজনে আর তেমন উৎসাহ নাই। সামান্য চলাফেরাতেও কষ্ট অনুভব হয়। এখন কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে গিয়া সমস্ত বলিলাম।

ঠাকুর কহিলেন—তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম, অভ্যাসটি খুব ধীরে ধীরে কর্‌বে। তাড়াতাড়ি কর্‌তে গেলে কিছুই সুসিদ্ধ হয় না, বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জলভাত খাওয়া ছেড়ে দাও। খিচুড়ি বা ভাতে সিদ্ধ ভাত খেতে আরম্ভ কর; ঘি একটু বেশী পরিমাণে খেও। এখন কিছুদিন এক পোয়া করে দুধ খাও, তা হ'লে অসুখ সেরে যাবে।

বহুকাল আমি দুধ ছাড়িয়াছি এজন্য এখন দুধ খাইতে একটু আপত্তি করিলাম।

ঠাকুর কহিলেন--না, কিছুদিন দুধ খেতে হবে। শোওয়ার সময়ে এক বল্‌কা দুধ খেয়ে নিও।

আমার প্রতি ঠাকুরের দুগ্ধপানের ব্যবস্থা আমার হঠকারিতারই দণ্ড মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কোথায় এখন দুধ পাই ভাবিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। অগত্যা দুধের অনুসন্ধানে আশ্রম হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় একটী হিন্দুস্থানীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে দুধ কোথায় পাওয়া যায়, বলিতে পার?" সে বলিল, "কত দুধ আপনার চাই? বিকালে নিলে এক পোয়া করিয়া দুধ আট সের দরে আমি দিতে পারি। আপনাদের আশ্রমের পাশেই আমার বাসা; আপনার সাম্‌নে আমি দুধ দোহাইয়া দিব।" রাধারমণ বাবুর পশ্চিম দিকের বাগানে এই লোকটি বাস করে, দেখিয়া আসিলাম। আশ্চর্য্য ঠাকুরের দয়া! হুকুমটি করিবার পূর্ব্বেই তিনি সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

এঁটো বাটলই মাজিল কে?

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রান্না প্রস্তুত না হইলে সে দিন আমার আহার হয় না। নানা কাজের

৩ই ভাদ্র, শনিবার। গোলমালে রান্নার সময় অতীতপ্রায় দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হওয়াতে রান্না করিতে গেলাম। এই সময়ে হঠাৎ মনে হইল, গতকল্য রান্নার বাসনটি মাজিয়া রাখিতে পারি নাই। আজ মাজিব স্থির

করিয়া বারান্দার এক কোণে এঁটো বাটলইটি রাখিয়া দিয়াছিলাম। সন্ধ্যা আসন্ন, এখন বাসন মাজিয়া রান্নার পর নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আহার শেষ করা অসম্ভব বুঝিয়া আজ অগত্যা আহারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। শুধু বাসনটি মাজিয়া রাখিব স্থির করিয়া উহা আনিতে গিয়া দেখি, কে যেন বাটলইটি মাজিয়া রাখিয়া গিয়াছে; দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। কে আমার এঁটো বাসন মাজিয়া রাখিল, একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু আশ্রমস্থ সমস্ত স্ত্রীলোক পুরুষ কেহই উহা করেন নাই বলিলেন। রান্নার সময় অতিক্রান্ত হইলেও এই ঘটনায় আমার আহার করা ঠাকুরেরই অভিপ্রায় অনুমান করিয়া খিচুড়ি পাক করিলাম, এবং পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিলাম। অমন সুন্দররূপে বাসনটি কে মাজিয়া রাখিল, এই চিন্তায় সারারাত আমার কাটিয়া গেল। সাধারণ সাধারণ ঘটনায়ও পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের অপরিসীম কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রমশঃ যেন অবাক্ হইয়া বোকা বনিয়া যাইতেছি। কিন্তু অবিশ্বাসী মন ঠাকুরকে তবুও ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সঙ্কল্পমাত্র বস্তু লাভ—অবিশ্বাসী মন।

আজ সকালবেলা হইতে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হোম, পাঠ সমাপনান্তে আসনে বসিয়া আছি; মনে হইল, এ সময়ে বাড়ীতে থাকিলে চালভাজা খাইতাম। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই দেখি, শ্রীযুক্ত বিধু ঘোষ মহাশয়ের কন্যা দামিনী এক বাটী গরম চালভাজা লঙ্কা ও কাঁটাল বিচি ভাজা আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "মা আপনাকে খেতে দিয়েছেন।" আর একদিন আহারের পূর্ব্বে কলা খাইতে ইচ্ছা হইল, তখনই ফণীভূষণ পাঁচটী মর্ত্তমান কলা আনিয়া দিয়া বলিল, "দিদিমা আপনাকে এই কলা পাঁচটী খেতে দিয়েছেন।" ইহাতে ঠাকুরের কৃপা একবারও মনে করিলাম না। বুড়ীর অসাধারণ স্নেহের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। গত পরশ্ব সকাল বেলা মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল; ঘরের বাহির হওয়া যায় না। আসনে বসিয়া মনে করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর! এ সময়ে গরম চা পাইলে কতই আরাম হইত।" পাঁচ ছয় মিনিট পরেই দেখি, বৃষ্টিতে ভিজিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় গরম গরম চা ও মোহনভোগ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, "আপনার কি কোনও অসুখ করেছে? গোস্বামী মহাশয় এই চা ও মোহনভোগ আপনার জন্য পাঠাইলেন।" ইহাতেও ঠাকুরের দয়ার কথা মনে হইল না। ভাবিলাম, বোধ হয় বৃষ্টি বলিয়া অধিক পরিমাণে চা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাই চা ভালবাসি বলিয়া ঠাকুর আমার জন্য পাঠাইয়াছেন। হায় কপাল! বিন্দুমাত্র বিশ্বাসের নিদর্শন পাইলে, কোথায়

তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিব ; না, তাহা না করিয়া কল্পনা দ্বারা সহজ সত্যেরও মিথ্যা হেতু সৃষ্টি করিয়া, এই উদ্ধত ও অবিশ্বাসী মনকে প্রবোধ দিতেছি।

বিগ্রহ বিহারীলালজীকে প্রসাদের জন্য বলা।

গত রাত্রে শান্তিসুধা কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, সনাতন বাবুর আখ্‌ড়ায়

৬ই ভাদ্র, রবিবার। বিহারীলালজী ঠাকুর আছেন; তাঁর প্রসাদ একদিন পেতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর কহিলেন,—**কি প্রসাদ পেতে ইচ্ছা হয়, বল।**

শান্তি,—ভাল মালপোয়া প্রসাদ।

ঠাকুর—**আচ্ছা, বিহারীলালজীকে তোর কথা জানালাম, জগবন্ধু কাল যেন প্রসাদ নিয়ে আসে।**

অদ্য বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় জগদ্বন্ধু বাবু আখ্‌ড়ায় গিয়া আমাদের আশ্রমের নামে প্রসাদ চাহিলেন। শুনিলাম, সেবক খুব আদর করিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ দিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের এখানে প্রত্যহ অন্ন ভোগই হয়, আজ সকালে হঠাৎ একটী বড়লোক আসিয়া প্রচুর পরিমাণে মালপোয়া ভোগ দিয়াছেন।" আশ্রমস্থ আমরা সকলেই সেই মালপোয়া প্রসাদ পাইলাম। শান্তি বলিলেন,—"এরূপ সুস্বাদু মালপোয়া আর কখনও খেয়েছি বলে মনে হয় না।" ঠাকুরের সমস্তই অদ্ভুত! এ সব ব্যাপারের হেতু কি দিব? বিশ্বাসের অভাবে আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিতেছি!

"হাঁ। তোমারও লীলা নিত্য!"—তপস্যার উপদেশ। শ্যামভাষা

আজ রৌদ্রের বিষম তেজ, ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নে ঠাকুর বলিলেন—

৭ই ভাদ্র, সোমবার। **ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেও।** আমি আসন হইতে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিতে যেমন উহা ধরিয়া টানিলাম, ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—**একটু থাম, দেখে নিই। কি সুন্দর পর্ব্বত! হিমালয় দেখা যাচ্ছে—সোনার মত শৃঙ্গ, কি চমৎকার!** দেখিতে দেখিতে ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও দরজাটি বন্ধ করিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম এবং ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—**"হাঁ, হাঁ, তোমারও, তোমারও**

লীলা নিত্য ! এই বলিয়া দুর্গাদেবীর স্তবস্তুতি করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। বাহ্য সংজ্ঞা লাভের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমারও লীলা নিত্য' কাকে বলিলেন ?

ঠাকুর কহিলেন,—ভগবতী দুর্গা এসেছিলেন। বল্‌লেন 'তুমি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা নিত্য বল। কেন ? আমার লীলা কি নিত্য নয় ? দেখ দেখি।' এই বলে তিনি সব পুত্র কন্যার সহিত প্রকাশ হ'য়ে আশ্চর্য্য লীলা দর্শন করাতে লাগ্‌লেন। বড়ই চমৎকার ! তাই বল্‌লাম, 'তোমারও লীলা নিত্য।'

ইহার পরে ঠাকুর নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—যোগ বড় কঠিন কথা। আমাদের এই পন্থাকে ঠিক যোগও বলেনা—যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হ'তে ব্রহ্মা উৎপন্ন হ'য়ে সর্ব্বপ্রথম যে সাধন করেছিলেন—'তপ, তপ' বাণী শ্রবণ ক'রে তিনি যে ভাবে তত্ত্ব জান্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের এই সাধনাই তাই। আমাদের সাধনটি সমস্তই ভিতরের ক্রিয়া, বাহিরের কিছুই নয়। একটু পরে আবার বলিলেন—সর্ব্বদা শম, সন্তোষ, বিচার ও সৎসঙ্গ চাই।

(১) মনের শাম্য অবস্থাকেই শম বলে। নিন্দা প্রশংসা, মান অপমান, সুখ দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট সকল অবস্থায়ই মন একই প্রকার অটল অচল থাক্‌বে। বাইরে যমনিয়মের অভ্যাস ও ভিতরে বৈরাগ্য দ্বারা এটী সুসিদ্ধ হয়।

(২) সকল সময়েই সন্তুষ্ট চিত্ত থাক্‌বে, কোন কারণেই যেন মনে উদ্বেগ অশান্তি প্রবেশ না করে। এজন্য সর্ব্বদা খুবই সাবধান থাকা আবশ্যক। অশান্তিই নরক, চিত্ত প্রফুল্ল না থাক্‌লে কোন কাজই হয় না।

(৩) সর্ব্বদা সব অবস্থায় ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, বিচার ক'রে চল্‌বে। কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম কিছুই সৎউদ্দেশ্য ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে কর্‌বেনা। ভগবানকে লক্ষ্য রেখে যা কিছু করা যায়, তাহাই সৎ ; তাঁকে ছেড়ে সবই অসৎ। প্রতি কার্য্যে এরূপ বিচার ক'রে চল্‌লে আর কোন ভাবনাই নাই। এতেই সমস্ত লাভ হয়।

(৪) প্রতিদিন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সৎসঙ্গ কর্‌বে। ভগবানই সৎ।

ভগবৎসঙ্গই সৎসঙ্গ। ভগবদাশ্রিত সাধু সজ্জন গণের সঙ্গও সৎসঙ্গ। তাঁরা কি ভাবে সময় অতিবাহিত করেন, তাঁদের কার্য্য কলাপ, আচার ব্যবহার কিরূপ তা শ্রদ্ধার সহিত দেখ্‌বে। প্রয়োজন বোধ হলে তাঁদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গও কর্‌তে পার। সদ্‌গ্রন্থ, ঋষি প্রণীত শাস্ত্র পুরাণাদি পাঠও সৎসঙ্গ। তাতে ঋষিদেরই সঙ্গ করা হয়। প্রত্যহই কিছু সময় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর্‌বে। এখন থেকে বেশ ক'রে এসব নিয়ম রক্ষা ক'রে চলো।

একটু পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—এই চারিটীর সঙ্গে আরও চারিটী নিয়ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য—স্বাধ্যায়, তপস্যা, শৌচ ও দান।

(১) স্বাধ্যায় শুধু অধ্যয়ন নয়। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করাকেও স্বাধ্যায় বলে, ইহাই প্রকৃত স্বাধ্যায়। নাম কর্‌তে কর্‌তে অবসাদ বোধ হ'লেই কিছুক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে নিবে।

(২) তপস্যা—এখন থেকেই খুব অভ্যাস কর্‌বে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যতপ্রকার তাপ আছে, কিছুতেই যেন চিত্তটিকে বিচলিত না করে। ত্রিতাপের জ্বালা বড় জ্বালা। শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, নিন্দা প্রশংসাদিতে মনের অবস্থা যেন একই প্রকার থাকে; ধীরে ধীরে এই অভ্যাস কর্‌বে। সকল অবস্থায় ধৈর্য্যই হ'চ্ছে তপস্যা।

(৩) শুচি অর্থ, সকল অবস্থায় বাহ্য ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা। মনটিকে যেমন নির্ম্মল রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বে, বাহিরেও সেই প্রকার খুব পবিত্র থাক্‌বে। বাহ্য পবিত্রতা বিশেষ প্রয়োজন। শরীর পবিত্র না থাক্‌লে অন্তঃশুদ্ধ হয় না, চিত্তশুদ্ধ না হ'লে নামে যথার্থ রুচি, ভগবানে শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই হয় না।

(৪) প্রতিদিনই কিছু দান কর্‌বে। দয়া, সহানুভূতি হ'তেই প্রকৃত দান। প্রতিদিনই কারো না কারো ক্লেশ দূর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। অন্য কিছু না পারো, কারোকে অন্ততঃ দুটী মিষ্ট কথাও বল্‌বে—তাও দান। প্রত্যহ এই কয়টী বিষয়ে দৃষ্টি রেখে চল্‌লে আর কোন চিন্তাই নাই।

ঠাকুর প্রায়ই মগ্নাবস্থায় কত কি বলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিনা। তাহা

না হিন্দি, না পারসী, না সংস্কৃত, না ইংরাজী—পরিচিত কোন ভাষাই নয়। এমন ভাষা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। কতকটা যেন সংস্কৃতের মত মনে হয়। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সমাধির সময়ে আপনার মুখ দিয়ে সংস্কৃতের মত কতকগুলি কথা বের হ'য়ে পড়ে, শুন্‌তে বড়ই সুন্দর। ও কি ভাষা? কিছুই ত বুঝিনা।"

ঠাকুর বলিলেন—ওঃ তুমি শুনেছ নাকি? বুঝ্‌বে কি? ও ত পৃথিবীর ভাষা নয়?—গোলোকের ভাষা, শ্যামভাষা। ঐ ভাষায়ই সেখানে কথাবার্ত্তা হয়। সংস্কৃত দেবভাষা।

বিবাহের প্রলোভন। সাবধান, প্রার্থনা করিলেই তাহা মঞ্জুর হবে।

ভাল উৎপাতেই পড়িলাম! গত বৈশাখ মাস হইতে যোগজীবন আমার পিছনে লাগিয়াছেন। কুতুকে বিবাহ করিবার জন্য ভয়ানক জেদ্ করিতেছেন। সে দিন ঠাকুরের কাছে ঠাকুরমাও আমাকে বলিলেন, 'কুলদা তুমি কুতুকে বিবাহ কর—আমার কথা শুন, কল্যাণ হবে। বিয়ে কর্‌লে কি ধর্ম্ম হয় না? গোঁসাই ত বিয়ে করেছেন, তাঁর ধর্ম্ম হয় নাই?' ইত্যাদি। আমি কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া লজ্জায় অধোমুখে বসিয়া রহিলাম। যোগজীবন বলিলেন—"কুতুকে তুমি বিবাহ কর, মাঠাকুরুণেরও এরূপ ইচ্ছা ছিল। ওকে বিবাহ কর্‌লে তোমার ধর্ম্মলাভের কোনই ক্ষতি হবে না, বরং অনেক সাহায্য হবে। এমন অসাধারণ মেয়ে বর্ত্তমান সময়ে সংসারে আর আছে কিনা সন্দেহ। ওর উপরে ভগবানের বিশেষ কৃপা, দেখে অবাক্ হয়েছি। ওকে বিবাহ কর্‌লে তোমার ব্রহ্মচর্য্যের কোন বাধাই ঘটিবেনা। তুমি যেমন ব্রহ্মচারী, কুতুও সেই প্রকারই ব্রহ্মচারিণী থেকে তোমার সহধর্ম্মিণী হবে। ওকে নিয়া তোমার সংসার করিতে হবে না। চিরকাল এই আশ্রমে আমাদের সঙ্গেই বাস কর্‌বে। তা ছাড়া গোঁসাই চিরকালের জন্য ত তোমাকে এ ব্রহ্মচর্য্য দেন নাই! নির্দ্দিষ্ট কালে এ ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে তুমি কুতুকে বিবাহ কর।"

৯ই ভাদ্র, বুধবার।

এখন দেখিতেছি, আশ্রমে থাকাই আমার পক্ষে শক্ত হইয়া পড়িল। কুতু নিতান্ত ছেলেমানুষটি নয়, বিবাহের বয়স হইয়াছে। সুতরাং লোক পরম্পরায় পুনঃ পুনঃ এ সকল কথা শুনিয়া, আমার সম্বন্ধেও উহার স্বভাবতঃই একটু সঙ্কোচ ভাব আসিয়াছে। যোগজীবনের কথা বারংবার শুনিতে শুনিতে আমারও চিত্ত কখনও কখনও চঞ্চল

হইয়া পড়িতেছে। আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, সারাজীবন কুমার থাকিয়া একমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিব স্থির করিয়াছি। এ আবার কি উৎপাৎ আরম্ভ হইল? অবশ্য কুতুর সদ্‌গুণের তুলনা নাই। তাহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণের অণুমাত্রও আমার সারাজীবনের সাধন-ভজন তপস্যায়ও লাভ করা সম্ভব নয়। যে ঠাকুরের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ বোধে কণামাত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম মনে করি, কুতু তাঁহারই শ্রীঅঙ্গের সারাৎসার বীর্য্যসম্ভূতা। উহার সৎসঙ্গে এজীবন যে পরম পবিত্র ও ধন্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা থাকিবে কিরূপে? একমাত্র ঠাকুর ব্যতীত পবিত্র অন্য যে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুতেও আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, উহা আমার লক্ষ্য বস্তু লাভের অন্তরায়, সুতরাং মহা অনিষ্টকর মনে করি। অথণ্ড ব্রহ্মচর্য্য উপলক্ষ করিয়া দয়াল ঠাকুরের কৃপায় যদি একমাত্র তাঁর শ্রীচরণে চিত্ত সংলগ্ন করিতে পারি তাহা হইলে গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত দেবীরাও আমার সান্নিধ্যে ও সংস্রবে আগ্রহান্বিতা হইবেন। ঠাকুর কিছুকাল হয় একদিন বলিয়াছিলেন—**বিবাহের প্রলোভন তোমার ভবিষ্যতে। তখন উহা কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেই হলো।"**

ঠাকুরের এ ভবিষ্যৎ বাণীর তাৎপর্য্য মনে হয়, আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা। আহার, নিদ্রা, মৈথুনের সংযমও শুধু এই দেহেরই অবিকৃত অবস্থা লাভের জন্য। মৈথুন বর্জ্জিত ও অনাসক্তরূপে যদি আমার এই পরিণয় হয় তাহা হইলে ত সর্ব্বপ্রকারেই আমি লাভবান্ হইলাম। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরের চরণে উর্দ্ধরেতা অবস্থার জন্য প্রার্থনা করি। এই সঙ্কল্প করিয়া আজ বেলা ৯॥০ টার সময়ে দক্ষিণের ঘরে নিজ আসনে বসিয়া একান্ত প্রাণে নাম করিতে লাগিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিলাম—"গুরুদেব! কিসে আমার যথার্থ হিত, কিসে অহিত, কিছুই বুঝি না; তবু দারুণ যন্ত্রণার সময়ে তোমার দিকে তাকাই। দয়া করিয়া আমাকে উর্দ্ধরেতা করিয়া দাও! তাহা না হইলে আমার আর উপায় নাই। কামের টানে এ চিত্ত যদি কামিনীতেই আসক্ত রহিল, তা হ'লে সমস্তটি প্রাণ তোমাকে দিব কিরূপে? দয়া ক'রে আমাকে উর্দ্ধরেতা ক'রে তোমাতেই একনিষ্ঠ ক'রে দেও! আর আমার কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই।"

এই প্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলাম। এই সময়ে ঠাকুর পূবের ঘর হইতে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। শোনামাত্র আমি ছুটিয়া ঠাকুরের

নিকট উপস্থিত হইলাম। দরজার সম্মুখে পঁহুছিতেই ঠাকুর আমার পানে চাহিয়া খুব ধমক দিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মচারী, **খুব সাবধান! প্রার্থনা কর্‌লেই কিন্তু সেটী মঞ্জুর হবে। কিসে ভাল, কিসে মন্দ, কিছুই যখন বুঝনা, তখন প্রার্থনা কর্‌তে খুব সাবধান!** ইহা বলিয়াই ঠাকুর আবার ভাগবৎ পাঠ আরম্ভ করিলেন। আমি ধীরে ধীরে নিজ আসনে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—একি হ'ল? ঠাকুর আমাকে শাসন করিলেন কেন? আত্মার যাহাতে পরম কল্যাণ তাহাই ত ঠাকুরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলাম। মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। পরে ধীরে ধীরে একটু স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। একটু পরে মনে হইল, হায় অদৃষ্ট! ঠাকুরের বাক্যে ও ব্যবহারে শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা নাই বলিয়াই ত আমি এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিলাম; মায়ের কোলে থাকিয়া ছেলে দুগ্ধ পান করিতে করিতে জুজুর ভয়ে চীৎকার করিলে মা একটু ধমকও দিবেন না? ঠাকুর! প্রার্থনা করিয়া যথার্থই অপরাধ করিয়াছি,—দয়া করিয়া ক্ষমা কর।

দাদার নিকট যাইতে অকস্মাৎ অস্থিরতা—ঠাকুরের আদেশ।

আর আর দিনের মত শেষ রাত্রিতে উঠিয়া ন্যাসাদি সমাপনান্তে স্নান-তর্পন করিয়া আসিলাম। হোমের পর আসনে বসিয়া নাম করিতেছি, হঠাৎ বড় দাদার কথা মনে হইল। দাদাকে দেখিবার জন্য মনে অত্যন্ত অস্থিরতা আসিয়া পড়িল। কিন্তু এই অস্থিরতার হেতু কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম যে আজই দাদার নিকটে রওয়ানা হইতে ইচ্ছা হইল। দাদা আমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে কখনও বলেন নাই, ঠাকুরও কোন প্রকারে এরূপ কোন অভিপ্রায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। ঠাকুরের নিকটে যেরূপ আরামে ও আনন্দে আছি, সংসারে কোথায়ও তাহার বিন্দুমাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তবে অনর্থক আমার এই দুর্ম্মতি হইল কেন? শুনিয়াছি যথাবিধি তীর্থবাসে, অথবা যমনিয়মের দুর্ভেদ্য বেড়ার ভিতরে থাকিয়া ভগবৎ ভজনে, কিম্বা সর্ব্বোপরি একমাত্র সদ্‌গুরুর অবিচ্ছেদ সঙ্গে উৎকট প্রারব্ধও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বোধ হয়, আমার প্রারব্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীগণ তাঁহাদের ভোগক্ষেত্র এই দেহটি গুরুসঙ্গ হেতু বেদখল হইয়া যায় দেখিয়া ত্রাসান্বিত হইয়াছেন; এবং তাই ভোগকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে অবাধগতি দুষ্টাসরস্বতীকে আমার রাশিতে প্রেরণ করিয়া সৎসঙ্গ বিচ্যুতির এইরূপ মতি জন্মাইতেছেন; কিম্বা সর্ব্বনিয়ন্তা গুরুদেবই আমার কোনও কল্যাণকল্পে

১১ই ভাদ্র, শুক্রবার।

অকস্মাৎ এইরূপ ভাব আমার ভিতরে সঞ্চারিত করিলেন; কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঠাকুর ধ্যানস্থ। একটু পরেই আমার পানে তাকাইলেন। আমি বলিলাম—"আজ আসনে অন্যান্য দিনের মত বসিয়া নাম করিতেছি, হঠাৎ দাদার কথা মনে হইল। ক্রমে মনটা এত চঞ্চল হইয়া পড়িল, যে নিত্যকর্ম্মও ঠিকমত করিতে পারিলাম না। এইরূপ হইল কেন? অনেক সময়ে ত বিপথে চালাইতে সয়তানেরা দুর্ম্মতি জন্মায়। আপনার সঙ্গ ছাড়াইতে কি এ তাদেরই কার্য্য? না, আপনারই ইচ্ছায় এরূপ হইতেছে?"

ঠাকুর—হাঁ, তোমার দাদা অযোধ্যাতে অনেক সময় ভাল সঙ্গ পেতেন। সম্প্রতি যেখানে গিয়েছেন, ভাল সঙ্গের বড় অভাব। এখন কিছুদিন তুমি তাঁর নিকটে গিয়ে থাক্‌লে, তাঁর পক্ষে বড় ভাল হয়; আর তাঁর প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য আছে সেটীও করা হয়। কিছুদিন গিয়ে দাদার কাছে থেকে এস। শীঘ্রই তোমার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।

গুরুর এই দেহ অনিত্য। ছায়া ধ'রে কায়া পাওয়া যায়।

দাদার নিকটে অবিলম্বে যাইতে ঠাকুরের আদেশ হইল শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—আপনি যেমন বলিবেন, তেমনি করিব। তবে, আপনাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না, পারিও না। বড় কষ্ট হয়।

ঠাকুর—এরূপ হওয়া ঠিক্ নয়, ইহাও মায়া, বদ্ধতা। গুরু যে বস্তু তা তো এই দেহ নয়। এই দেহের ভিতরে অন্য কিছু, তিনি জড় নন্।

আমি—এ তো বড় বিষম কথা! এই দেহ গুরু নয়, তবে গুরু আবার কে? এই দেহের ভিতরে কি আছে না আছে, আমিত তা দেখিনি, জানিও না। গুরুর দেহ জড় নয়, নিত্য, এই ত শুনেছি, তাই এই রূপেরই ধ্যান করি। এ যদি কিছু নয়, তবে সবই ত বৃথা!

ঠাকুর—বৃথা নয়, গুরুর যে দেহ নিত্য, তা এ দেহ নয়। এই দেহেরই ভিতরে ঠিক্ এই রূপই অন্য এক দেহ আছে। তা সচ্চিদানন্দ-রূপ, তাই নিত্য; এই যে দেহ দেখ্‌ছ, এ তারই ছায়া। যেমন আয়নাতে মুখের ছায়া পড়ে, ছায়াটি ঠিক মুখেরই অনুরূপ, কিন্তু কোন বস্তু নয় ছায়া মাত্র; এই দেহও সেই

প্রকার। তার এই ছায়া দ্বারাই সেই রূপ ধর্‌তে হয়, অন্য উপায় নাই। এই রূপেরই ধ্যান দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দরূপ চোখে পড়ে। ছায়া না ধর্‌লে সে কায়া পাবে কি ক'রে ?

আমি—এই দেহরূপী ছায়ার ত পরিবর্ত্তন সময় সময় হয়, ভিতরের সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যরূপ এই অস্থির চঞ্চল ছায়া ধ'রে কিরূপে পাওয়া যাবে? কোন্ ছায়ার ধ্যান কর্‌ব?

ঠাকুর—যা পূর্ব্বে দেখেছ।

আমি—আমি পূর্ব্বে পরে বুঝি না। যখন আমার যেরূপ ভাল লাগে, তাই আমি ধ্যান করি।

ঠাকুর—তাতেই হবে, তাই কর। সবই নিত্য।

আমি—আপনার সঙ্গ ছেড়ে যাবার সময়ে আমার বিপদের আশঙ্কা কিসে? কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হব ?

ঠাকুর—তোমার নিত্যকর্ম্মটি যদি নিয়ম মত ক'রে যাও, তা হ'লে আর কোন ভয় নেই—যেখানেই থাক না কেন, কোন অনিষ্টই হবে না। আর নিত্যকর্ম্ম বন্ধ হ'লেই বিপদের সম্ভাবনা। আর একটী কথা মনে রেখো, সঙ্গেতে অনেক সময়ে ক্ষতি করে, সঙ্গ হ'তে অনেক সময় ভয়ানক প্রলোভন উপস্থিত হয়। হয় ত কেহ বল্‌বেন, এই ভাবে চল, তোমার এই এই অবস্থা লাভ হবে; আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ কর, এক ঘণ্টার মধ্যেই ঊর্দ্ধরেতা ক'রে দিচ্ছি। ঊর্দ্ধরেতা হ'তে তোমার বড় ঝোঁক। এসব কথায় পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ। এ সমস্ত প্রলোভনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াও বড় সহজ নয়। খুব বড় বড় লোকও এ সব প্রলোভনে পড়ে নষ্ট হ'য়ে যান। হঠাৎ একটা কিছু লাভ কর্‌তে গেলেই বিপদ্। নিজের কাজ ধীরে ধীরে ক'রে যাও; আর কারো দিকে তাকাতে হবে না। প্রয়োজনমত সব এখান থেকেই হবে। কারো নিকটে কিছু লাভ কর্‌বে মনে করে, সাধু-সঙ্গ ক'রো না। আর একটী কথা; দৃষ্টি সর্ব্বদা অধোদিকে রেখো, সাধনের কোন কথা কারোকে ব'লো না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি খুব কড়াক্কড় ভাবে রক্ষা করে চ'লো—কখনও শিথিল হ'য়ো না। তা হলেই নিরাপদ।

ঠাকুরের সমস্ত আদেশই কল্যাণকর—খুচিয়ে প্রশ্নে বিপত্তি।

গতকল্য ঠাকুরের কথা শুনার পর হইতে বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। আমার দয়াল ঠাকুরের দেবদুর্লভ সঙ্গ ছাড়িয়া সেই সুদূর বস্তি যাইতে আমার এ দুর্ম্মতি কেন হইল? ঠাকুরকে ছাড়িয়া কিরূপে দিন কাটাইব? কিন্তু আমার পক্ষে যাহা যথার্থ কল্যাণকর ঠাকুর তাহাই ব্যবস্থা করিতেছেন, সুতরাং আপত্তিই বা করিব কিরূপে? পাকা ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করিতে সুচিকিৎসক যেমন রোগীর কাতর আপত্তি শুনিতে চাহেন না, বেশী কান্নাকাটি করিলে অবশেষে অধিক যন্ত্রণাদায়ক পুল্‌টীশ্ দ্বারাই উহা ফাটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, আমি এখন আপত্তি করিলে, ঠাকুরও হয় ত সেইরূপই করিবেন। ব্যবস্থামত তিক্ত ঔষধ সেবনে রোগ উপশম হইবে, রোগীর এই নিশ্চিত ধারণা সত্ত্বেও যেমন তাহাতে তাহার স্বাভাবিক অরুচি হয়, আমার দশাও সেইরূপই হইয়াছে। এই প্রকার নানা যুক্তিতর্কে চিত্ত একটু স্থির করিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া বসিলাম। ঠাকুর নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন,—

১৬ই ভাদ্র, বুধবার।

বাড়ী গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে, অবিলম্বে পশ্চিমে চ'লে যাও। যেখানেই থাক না কেন, চণ্ডীপাঠ ও হোমটি ঠিক্ নিয়মমত ক'রে যেও। ব্রাহ্মণের প্রত্যহই অগ্নিসেবা কর্‌তে হয়। সৎসঙ্কল্প করে তুমি এই হোম কর্‌লে সেই সঙ্কল্প তোমার সুসিদ্ধ হবে। আভিচারিক ক্রিয়ার অনর্থেরও এই শান্তি-স্বস্ত্যয়নে নিবৃত্তি হবে। শ্বেত করবী, শ্বেত সরিষা, শ্বেত গোলমরিচ দ্বারা আহুতি দিতে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদার নিকটে থাকার সময়েও কি আমার ভিক্ষা কর্‌তে হবে?

ঠাকুর—**শুধু ভিক্ষা কেন? সবই কর্‌তে হবে। যেখানেই থাক না কেন নিয়ম কিছুই বাদ দিবে না। সমস্তই রক্ষা ক'রে চল্‌বে।**

আমি—দাদার নিকটে কতদিন অন্তর ভিক্ষা কর্‌তে পার্‌ব?

ঠাকুর—**যে দিন 'আর কোথাও ভিক্ষা না জুট্‌বে, সে দিন দাদার নিকটে কর্‌বে।**

আমি—ভিক্ষা কি শুধু ব্রাহ্মণের বাড়ীই কর্‌ব? না, যে কোন বাড়ী কর্‌তে পারা যায়?

ঠাকুর—**ভিক্ষান্ন সর্ব্বত্রই পবিত্র। সর্ব্বত্রই করা যায়। কিন্তু তোমার**

পক্ষে তা'ও ঠিক্ হবে না। তুমি সর্ব্বদা স্বপাকেই খেও। নিজের রান্না অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমি—দেবালয়ে দেবতাকে যা ভোগ দেয়, তা গ্রহণ করা যায়?

ঠাকুর—ভাল ব্রাহ্মণে রশুই করে ভোগ দিলে প্রসাদ পাওয়া যায়।

ঠাকুরকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, ভয় হইল। কিসে আবার কোন কথায় কি আদেশ করিবেন—শেষকালে মহামুস্কিলে পড়িব। সেদিন গুরুভ্রাতা সত্যকুমার গুহঠাকুরতা ঠাকুরকে বলিলেন—প্রাণায়াম করিতে পারি না বড়ই কষ্ট হয়; কি কর্‌ব?

ঠাকুর বলিলেন—কষ্ট হ'লে ক'রো না।

সত্যকুমার আবার ঠাকুরকে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রাণায়াম না কর্‌লে কি কোন অনিষ্ট হবে?

ঠাকুর একটু বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—পাল্‌টে আস্‌তে হবে। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না করিলে ঠাকুরের মুখদিয়া এই দণ্ডের ব্যবস্থা হইত না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। অদ্য দাদাকে লিখিয়া দিলাম "আমি শীঘ্রই বস্তি রওয়ানা হইতেছি। আমার পাথেয় কলিকাতায় ছোটদাদার নিকটে পাঠাইয়া দিন।"

ভীষণ পদ্মা। রাস্তায় ঠাকুরের কৃপা।

প্রত্যূষে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইলাম। অপরাহ্নে বাড়ী পৌছিলাম। মাতৃদেবীকে দর্শন করিয়া বড়ই আরাম পাইলাম। মার সন্তোষার্থে

১৭ই হইতে ২৪শে ভাদ্র।

৭।৮ দিন বাড়ী রহিলাম। মার কাছে আহারের কোন নিয়মই রাখিলাম না; যখন যাহা দিলেন, মার তৃপ্তির জন্য ভোজন করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমার কোন প্রকার ক্ষতিই বোধ হইল না; বরং সাধনে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দাদার নিকটে যাইতে অনুমতি দিলেন। ২৪শে তারিখে পশ্চিমে যাত্রা করিলাম। ষ্টীমারযোগে গোয়ালন্দ পৌছিবার জন্য বাড়ী হইতে ৪।৫ ক্রোশ অন্তর ভাগ্যকুল ষ্টেশনে নৌকাযোগে উপস্থিত হইলাম। পদ্মার রূপ দেখিয়া আতঙ্ক হইল, ঠিক্ যেন রক্তনদী। উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া খরস্রোতে সোঁ সোঁ শব্দে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। জীবনে পদ্মার এরূপ ভয়ঙ্কর

আকৃতি আর কখনও দেখি নাই। পদ্মার এপার হইতে অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় না। নদী আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। যথা সময়ে ষ্টীমারে উঠিতে বিছানা ও বস্তা লইয়া মুস্কিলে পড়িলাম, কুলি মজুর পাইলাম না। এই সময়ে দুটী ভদ্রলোক নিজ হইতে আসিয়া আমার বোঝা তুলিয়া লইলেন এবং ষ্টীমারে চাপাইয়া টিকেট করিয়া দিলেন। আমি ষ্টীমারে আসন করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার কিছুক্ষণ চলার পরে বিষম হৈ চৈ শব্দ পড়িয়া গেল। তিনটী লোক পদ্মায় ভাসিয়া যাইতেছে শুনিলাম। সারং ষ্টীমার থামাইয়া বহু চেষ্টায় জলীবোট পাঠাইয়া লোক তিনটীকে তুলিয়া আনিল। শুনিলাম তাদের সঙ্গে আরো তিনটী লোক ছিল, কিন্তু তাদের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময়ে ষ্টীমার গোয়ালন্দে পৌঁছিল। "আপনি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ থাকিতে কুলিকে পয়সা দিবেন কেন?" এই বলিয়া একটী ভদ্রলোক আমার জিনিষপত্র তুলিয়া নিয়া ট্রেণে চাপাইয়া দিলেন। ভোর বেলা শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ছোটদাদা মেছুয়াবাজারে কিম্বা ঝামাপুকুরে থাকেন, নিশ্চয় জানি না। ১২নং বাড়ীতে থাকেন, ইহাই মাত্র স্মরণ আছে।

মুটের মাথায় বোঝা তুলিয়া দিয়া সহরের দিকে চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছি। একটু চলিয়াই আমরা মেছুয়াবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে উপস্থিত হইলাম। মুটে কিঞ্চিৎ অগ্রে ছিল; সে চৌমাথায় পৌঁছিয়াই আমাকে বলিল—"বাবু! কোন্ দিকে যাইবে?" আমার চমক্ ভাঙ্গিল; চাহিয়া দেখি সম্মুখে তিনটী পথ। কোন্ দিকে যাইব ভাবিতেই হঠাৎ ছোড়দাদাই রাস্তার অপরদিক হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি? কুলদা? চল, বাসায় চল।" আমি ছোড়দাদার সঙ্গে ১২নং ঝামাপুকুরের বাসায় পঁহুছিলাম। তখন পর্য্যন্ত কেউ উঠে নাই; প্রায় সকলেই নিদ্রিত। অচেনা স্থানে চৌমাথার সংযোগস্থলে চল্‌তি মুখে অকস্মাৎ এই ভাবে ছোড়দাদাকে পাইয়া বিস্মিত হইলাম। ইহা ঠাকুরেরই প্রত্যক্ষ কৃপা বুঝিয়া সারাদিন ঐ ভাবে অভিভূত রহিলাম। কুঞ্জ বিহারী গুহ, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিন্ত্য বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাতে বড় আনন্দ পাইলাম।

অত্যদ্ভুত অনুভূতি ও নামের টান। বিচ্ছেদেই অবিচ্ছেদ সঙ্গ।

অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় আসিয়া নীচে একখানা নির্জ্জন ঘর পাইয়া তাহাতে আসন করিয়াছি। ন্যাস, হোম, পাঠ ও গায়ত্রী জপে বেলা এগারটা অতিবাহিত হয়। পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার

২৫শে ভাদ্র হইতে ৩১শে ভাদ্র।

আসনে বসি। অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত আমার কি ভাবে চলিয়া যায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। নাম করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন এতই পরিষ্কার অনুভব হইতে থাকে যে তাহাতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। ঠাকুরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাঁহার হাতনাড়া মুখনাড়া, চোখের ভঙ্গী প্রভৃতি যেন সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। অবিরল অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। কোন গুরুভ্রাতা আসিয়া ডাকিলে হঠাৎ জবাব দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। নামের সঙ্গে চিত্তটি সংলগ্ন হইলেই দেহের অভ্যন্তরে কোন্ স্থানে ঠাকুর আমাকে নিয়া ফেলেন বুঝিতে পারি না। সেখান হইতে উঠিয়া আসিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়; উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। কথাবার্ত্তায় চলাফেরায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঠাকুরের অনুপম রূপের স্মৃতি একই ভাবে রহিয়াছে। উহা এতই স্বাভাবিক হইয়াছে যে ভুলিবার যো নাই। এখন আমার মনে হইতেছে ঠাকুরের কাছে নিয়ত থাকা অপেক্ষা, দূরে থাকিয়া এভাবে তাঁর সঙ্গ আরও মধুর। সর্ব্বদা ঠাকুরের সম্মুখে থাকায় সান্নিধ্য হেতু প্রাণ ঠাণ্ডা থাকে, তাঁহার প্রভাবে চিত্ত উদ্বেগশূন্য হওয়ায় অবিচ্ছিন্ন সঙ্গের ঔৎসুক্যও ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়। তখন মনটি শুধু তাঁহাতেই নিবিষ্ট না থাকিয়া স্বভাব বশে অন্যত্র বিচরণ করে। কাজেই সঙ্গে থাকিয়াও বিচ্ছেদ ভোগ করিতে হয়। ঠাকুরের রূপে গুণে ও কার্য্যে চিত্তসংলগ্ন থাকিলেই যথার্থ তাঁর সঙ্গ হয়। সেই সঙ্গ তাঁর স্মৃতিতে বিচ্ছেদ অবস্থায়ই অধিক। অধিকন্তু ঠাকুরের কাছে থাকায় বাহ্যানুভূতির তুলনায়ই তাঁর মধুরতার আধিক্য; কিন্তু দূরে থাকায় কেবলমাত্র তাঁহাতেই চিত্তনিবিষ্ট হেতু মাধুর্য্যানুভূতি অতুলনীয়। গুরুদেব! তোমার সঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে চাহিয়া ছিলাম না। তাই কি তোমার এই বিরহের অপূর্ব্ব মাধুরী বুঝাইয়া দিলে?

পুরুষকারে ভরসা। কৃপার দান অগ্রাহ্য করার পরিণাম।

তিনদিন তিনরাত্রি এইভাবে অভিভূত হইয়া রহিলাম। চতুর্থদিনে মনে হইল, এই অবস্থা তো আমার স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার সম্ভোগে সর্ব্বদা মত্ত না থাকিয়া পুরুষকার সহকারে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই ক্রমশঃ উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং অনন্য মনে এখন তাহাই করি। ইহা করিলেই ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শানুভব সহজে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি রূপাভিনিবিষ্ট-চিত্তকে চেষ্টাদ্বারা আনিয়া শুধু শ্বাস প্রশ্বাসে সংলগ্ন পূর্ব্বক নাম করিতে লাগিলাম। ইহাতে ধীরে ধীরে রূপ ম্লান হইয়া ক্রমে, উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন শুষ্ক নামে শ্বাস প্রশ্বাস

চঞ্চল হওয়ায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। শ্বাসে বা নামে কিছুতেই চিত্ত সংযোগ করিতে পারিলাম না। সাধনচ্যুত হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলাম। ভিতরের অসহ্য জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আহা! বহু সাধন ভজন তপস্যার ফল যাঁহার ত্রিসীমায় পঁহুছিতে পারে না, ঠাকুরের সেই দুর্ল্লভ কৃপার দান পাইয়া হারাইলাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হ'লে কৃতজ্ঞতার সহিত কাতর প্রাণে তাঁরই পানে তাকাইয়া থাক্‌তে হয়—তাহা হইলে সেটি থেকে যায়।** হায়, হায়! কুবুদ্ধিবশতঃ এই সহজ পথ না ধরিয়া আমি এ কি করিলাম? পুরুষকারদ্বারা তাঁহার কৃপার স্রোত বৃদ্ধি করিতে গিয়া বিপন্ন হইলাম। এখন যে আমার সমস্তই গেল। দয়াল ঠাকুর! আমাকে দগ্ধ করিয়া নিয়া আবার তোমার চরণতলে স্থান দাও।

শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন অমৃত। খিচুড়িতে নারিকেল খণ্ড।

কলিকাতা পঁহুছিলাম। প্রথমদিন কুঞ্জ ও ছোড়দাদা রান্নার যোগাড় করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিন অচিন্ত্য দাদার বাসায় ভিক্ষা হইল। মুগ ডালের খিচুড়ি উনুনে চাপাইয়া অচিন্ত্য দাদার সহিত ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিলাম। এ দিকে খিচুড়ি পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল। ধোঁয়াতে ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। খিচুড়িতেও চট্‌পট্‌ শব্দ হইতে লাগিল। অচিন্ত্য দাদা 'সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া কপাল চাপ্‌ড়াইতে লাগিলেন। আমি খিচুড়ি নামাইয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলাম। পরে হোম সমাপন করিয়া অচিন্ত্য দাদাকে দুগ্রাস প্রসাদ পাইতে বলিলাম। আরও কেহ কেহ কিছু কিছু প্রসাদ নিলেন। আশ্চর্য্য এই ভোজনপাত্রে খিচুড়ি ঢালা মাত্র অপূর্ব্ব সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত ঘর, বাড়ী ঐ গন্ধে আমোদিত হইল। খিচুড়ির অদ্ভুত স্বাদ পাইয়া অচিন্ত্য দাদা কান্দিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধার দান কখনও নষ্ট হয় না—শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন অমৃত—এই ব্যাপারে পরিষ্কার বুঝিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আহারে বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম।

একদিন মহেন্দ্রদাদার নিকটে ভিক্ষা করিলাম। তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। চাল, ডাল, নুন্, লঙ্কা, ঘৃত, আলু আনিয়া উৎসাহের সহিত আমার রান্নার যোগাড় করিয়া দিলেন। উনন্ ধরাইয়া, খিচুড়ি চাপাইলাম। মহেন্দ্রদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার আর কি চাই? আমি বলিলাম যাহা চাই তাহা এখন আর সংগ্রহ হইবে না। এই খিচুড়িতে নারিকেল কুচো পড়িলে বড় চমৎকার হইত। মহেন্দ্রদাদা বলিলেন—আগে বলিলেই পারিতে, এখন আনিতে খিচুড়ি হ'য়ে যাবে। অল্পক্ষণ পরেই খিচুড়ি হইয়া

গেল। উহা ঠাকুরকে নিবেদনান্তে হোম করিয়া আহার করিতে বসিলাম। মহেন্দ্র দাদাকেও কিঞ্চিৎ দিলাম। অদ্ভুত ঠাকুরের লীলা—অদ্ভুত তাঁর মহিমা! প্রতি গ্রাস খিচুড়িতে নারিকেলখণ্ড পাইতে লাগিলাম—আমিও অবাক্—মহেন্দ্র দাদাও অবাক্। কি যে কি হইল কিছুই বুঝিলাম না। দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিতে স্পৃহাও জন্মিল না। প্রতিগ্রাস খিচুড়িতে আনন্দ স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—নাম আপনা আপনি সরস হইয়া উঠিল। ঠাকুরই যেন আমার মুখে আহার করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। আহার শেষ হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা অতীত হইল। ধন্য গুরুদেব!

বস্তি রওয়ানা হওয়ার কথা জানাইয়া—কলিকাতায় আমার পাথেয় পাঠাইতে দাদাকে লিখিয়াছিলাম। দাদা আমাকে সজনীর সঙ্গে বস্তি যাইতে লিখিয়াছেন। সজনীর স্কুলের ছুটী হইতে বিলম্ব আছে এখানেও আমার থাকার অসুবিধা, ভাগলপুরে যাওয়ার জন্য প্রাণ অকস্মাৎ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—এই অস্থিরতার কারণ কি জানি না—আগামী কল্যই ভাগলপুর রওয়ানা হইব স্থির করিলাম।

প্রেতের আর্ত্তনাদ, ফকিরের বাহন অদ্ভুত বৃক্ষ। সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি।

১লা আশ্বিন হইতে ৪ঠা আশ্বিন।

হাবড়াতে ট্রেণে চাপিয়া রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে ভাগলপুর ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। একটী কুলী সঙ্গে লইয়া খঞ্জরপুরে পুলীনপুরী চলিলাম। আজ ভয়ঙ্কর অন্ধকার। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া 'মশাইয়ের চকে' উপস্থিত হইলাম। বিস্তৃত ময়দানের ভিতর দিয়া রাস্তা, দুদিকে বড় বড় বৃক্ষ রহিয়াছে। হাঁসপাতালের বিপরীত দিকে একটী প্রকাণ্ড আমগাছের নিকটে উপস্থিত হওয়া মাত্র অতিশয় যন্ত্রণাসূচকশব্দ শুনিতে পাইলাম। উহা শুনিয়াই চমকিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম; সর্ব্বত্র জন-প্রাণী শূন্য অন্ধকারময়। শব্দটি আমার ১০।১২ হাত অন্তরে গাছের উপর হইতে আসিতে লাগিল। যেন উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ কোন মুমূর্ষু রোগী গোঁ গোঁ করিতেছে। সময় সময় গোঁ গোঁ শব্দ স্পষ্টও হইতেছে। সঙ্গী কুলী উহা শুনিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল। আমি নাম করিতে করিতে স্বাভাবিক গতিতেই চলিলাম। শব্দটি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় দুই মিনিট রাস্তা আসিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

মুটে আমাকে বলিল 'বাবা! এ সব গাছে এক সময়ে বহুলোকের ফাঁসি হইয়াছিল।

এস্থান অতি ভয়ঙ্কর। এই গাছের নীচে চলিবার সময়ে এই প্রকার শব্দ অনেকবার শুনিয়াছি।' আমার মনে হইল হাঁসপাতালের কোন রোগী মৃত্যুর পরে এই বৃক্ষে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। এই প্রকার সুস্পষ্ট প্রেতের আর্ত্তনাদ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই।

ভাগলপুর পঁহুছিয়া মহাবিষ্ণু বাবুর সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। একদিন তাঁহার সঙ্গে মেলা দেখিতে "কর্ণগড়ে" গেলাম। এই কর্ণগড়ই নাকি কলিঙ্গাধিপতি দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল। বহু বিস্তৃত উচ্চভূমি পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। স্থানটি দেখিয়া প্রাণ যেন উদাস হইয়া গেল। কিছুক্ষণ ওখানে বসিয়া রহিলাম। পরে সরকারী বাগানে গেলাম। বাগানে একটী পুরানো প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিলাম। বৃক্ষটির নাম কেহ জানে না। দশ বার হাত বেড়—অত্যন্ত মোটা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহার একটী সরু ডাল ধরিয়া ঝাঁকি দিলে ঝড়ের মত সমস্ত গাছটি নড়িয়া উঠে। জনশ্রুতি, কোন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ফকির পাহাড় হইতে এই বৃক্ষে চড়িয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বৃক্ষ এখানে আছে। বাসায় আসিবার সময়ে রাস্তার ধারে একটী কালীমন্দির দেখিলাম। শুনিলাম, কোন এক সাহেব কালীর অলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবীর স্থায়ী সেবা-পূজার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত সেবা-পূজা নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। চার পাঁচ দিন ভাগলপুরে থাকার পর বস্তি যাইতে অস্থির হইলাম। দাদা ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, ঠাকুরের আদেশ রক্ষার্থে আমাকে বস্তি যাইতেই হইবে। ভাগলপুর আসিয়া ভিক্ষা প্রত্যহই করিলাম। নিত্যক্রিয়ার কোনপ্রকার বিঘ্ন ঘটিল না।

কুক্ষণে যাত্রার দুর্ভোগ। পদে পদে ঠাকুরের দয়া
পরবর্ত্তী আদেশই বলবান।

৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।

ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে ভাগলপুর হইতে বস্তি রওয়ানা হইলাম। কুক্ষণে যাত্রার কুফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। গাড়ীখানা ষ্টেসনে পঁহুছিতে অর্দ্ধ রাস্তায় আসিয়াই অচল হইল। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে জনমানবশূন্য ময়দানে বিষম বিপদে পড়িলাম। ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত এই আপদে আর উপায় নাই

মনে করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একখানা খালি গাড়ী ষ্টেসনের দিকে যাইতেছে দেখিলাম। ঐ গাড়ীখানায় চাপিয়া ট্রেণ ছাড়িবার ৪।৫ মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। তাড়াতাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সমস্ত রাস্তায় কখনও দাঁড়াইয়া কখনও বসিয়া পরদিন বেলা প্রায় নয়টার সময়ে বাঁকীপুর ষ্টেশনে নামিলাম। গুরুভ্রাতা ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে কুঞ্জঠাকুরদা আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধানে অচেনা পথে দারুন রৌদ্রে তিন চারি মাইল ঘুরিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। কপালের ভোগ—কুঞ্জকে পাইলাম না; শুনিলাম ব্রজেন্দ্র বাবুও জগন্নাথ গিয়াছেন। সুতরাং তখনই আবার দুই প্রহর রৌদ্রে ষ্টেশনে আসিলাম। ক্ষুধায় ও পিপাসায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। মুসাফিরখানার এককোণে পড়িয়া রহিলাম। এই সময়ে একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন—"বাবা! থোড়া আচ্ছা দুধ হাম লেয়ায়া। গরম গরম পায় লেও, ঠাণ্ডা পানি ভি হ্যায়।" এই বলিয়া তিনি আমার হাতে একটী সন্দেশ দিলেন। প্রায় অর্দ্ধসের পরিমাণ দুধ ও পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পান করিয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। যথাসময়ে বস্তির টিকিট করিয়া ট্রেনে চাপিলাম। দিঘাঘাটে নামিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম, পরে সন্ধ্যার সময়ে পালিজা ঘাটে পঁহুছিলাম। একটু অধিক রাত্রিতে বস্তির গাড়ী আসিল—সময়মত তাহাতে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। একটী লোক সাধু বেশ দেখিয়া আমাকে কিছু দিতে চাহিল। আমি টাকা পয়সা নেইনা বলায় তাহার আরও ভক্তি হইল। সে একমুঠো পয়সা আমার পাশে বেঞ্চের উপর রাখিয়া বলিল—"ক্ষুধা পাইলে রাস্তায় খাবার কিনিয়া খাইবেন, এই পয়সা আপনারই রহিল।" কয়েক ষ্টেশন যাওয়ার পর আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতে লাগিল। ইচ্ছামত ভাল ভাল জিনিস কিনিয়া খাইলাম। একটু বেলা হইলে বস্তি পঁহুছিলাম। মুটের মাথায় বিছানা বস্তা তুলিয়া দিয়া, দাদার বাসায় উপস্থিত হইলাম। দাদা আমাকে দেখিয়া প্রথমেই বলিলেন—"তুমি নাকি ভিক্ষা করিয়া খাও? আমার এখানে তা কিন্তু হবে না। এ জন্যই তোমার পাথেয় পাঠাই নাই।" দাদা দুই এক মিনিট কথাবার্ত্তা বলিয়া হাঁসপাতালে চলিয়া গেলেন। আমি বিষম উদ্বেগে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন আমি কি করি—ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা স্বপাক আহার, আমার প্রতি ঠাকুরের আদেশ। আবার দাদার নিকটে থাকা, ইহাও এই সময়ের জন্য ঠাকুরের বিশেষ আদেশ। কিন্তু ভিক্ষা করিলে দাদা আমাকে তাঁর নিকটে থাকিতে দিবেন না। এখন একটী করিতে গেলে অপরটি লঙ্ঘন করিতেই

হইবে। এ অবস্থায় আমার কোনটি কর্ত্তব্য? দাদার সঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে রাস্তার দুর্ভোগ, নানাপ্রকার অনিয়ম ও ঠাকুরের দুর্ল্লভ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এতদূরে আসা সমস্তই নিরর্থক হয়। পক্ষান্তরে দাদার সঙ্গে থাকিতে পারিলে সমস্তই সার্থক। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা পরবর্ত্তী আদেশই বলবান। সুতরাং ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া দাদার সঙ্গেই থাকিব স্থির করিলাম।

দাদার পাঁচ পয়সা ঘুষ লওয়ার স্বপ্ন সত্য—প্রায়শ্চিত্ত।

বস্তি-হাঁসপাতাল বড় রাস্তার ধারে, প্রকাণ্ড ময়দানের উপরে। নিকটে কোন লোকালয় নাই, সহর অনেকটা দূরে। দাদার থাকিবার স্থানটিও তেমন সুবিধাজনক নয়। বাহিরে লম্বা একখানা 'খাপরার' ঘর। তার সংলগ্ন একটী ছোট কুঠরী। ভিতরে তিন চারিখানা পাকাঘর আছে, তাহাও তেমন স্বাস্থ্য কর নয়। আমি বাহিরের ছোট ঘরখানায় আসন করিলাম। আমার বস্তি আসিবার হেতু অবগত হইয়া দাদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। হাঁসপাতালের কাজ কর্ম্মের পর অবশিষ্ট সময় আমারই সঙ্গে থাকিতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ শ্রবণে দাদার বড়ই আনন্দ দেখিতেছি। একদিন দাদা বলিলেন—"আমার একটী স্বপ্ন বিষয়ে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলাম। স্বপ্নটি শুনিয়া তিনি কি বলিলেন?"

আমি—স্বপ্নটি আপনি বিস্তৃত রূপে কিছুইত লিখেন নাই।

দাদা—বিস্তৃত আর কি? শেষ রাত্রিতে দেখিলাম, একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন—'পাঁচটী পয়সা তুমি ঘুষ লইয়াছ।' স্বপ্ন দেখিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সারাদিন উদ্বেগে কাটাইলাম। আমি ঘুষ নিয়াছি—এ কেমন কথা? জীবনে কখনও কাহারও এক কপর্দ্দকও নেই নাই। ঘুষ নিলে রাজা হইতে পারিতাম—সেদিনও একটী রাজা চল্লিশহাজার টাকা পায়ের কাছে রাখিয়া কান্না কাটি করিল; সত্য গোপন করিয়া রিপোর্ট করিলে একটী মেয়েও আত্মহত্যা করিতনা। কিন্তু জানিয়াও তাহা আমি পারিলাম না। একপয়সার পান পর্য্যন্ত কেহ আমার বাড়ীতে দিতে পারেনা। আর আমি ঘুষ নিয়াছি?

আমি—ঠাকুর আপনার চিঠি শুনিয়া বলিলেন—স্বপ্ন যথার্থ। কোনদিন কোন সময়ে ঘুষ নিয়াছেন—তিথি নক্ষত্র ধরে বলা যায়। দাদাকে লিখে দেও—কোনও দেবালয়ে ভোগের জন্য অথবা সাধু কাঙ্গালীদের সেবার জন্য কিছু দান

করেন। তা'হ'লেই ঐ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আপনাকে ত এসব কথা লেখা হয়েছিল—আপনি কি তা করেন নাই ?

দাদা—না, এখনও তা করি নাই। দেবালয় এখানে নাই—নানক-সাহীদের একটী আখ্ড়া আছে, সেখানে ৫টী টাকা দিয়া আসিব।

মহাত্মা গোবিন্দদাসের বিস্ময়কর কার্য্য।

অন্যের উৎকট ভোগ গ্রহণ।

আমি—সাধু গোবিন্দদাসের কথা আপনি লিখিয়াছেন, তিনি কে ?

দাদা—তিনি উদাসীন, একটী মহাত্মা, আমাকে রক্ষা করিতেই এখানে আসিয়াছিলেন। লোক-সঙ্গ এখানে নাই, সর্ব্বদা একাকী থাকিতে হয়। এজন্য একটী সাধুকে রাখিয়াছিলাম। সাধু খুব শক্তিশালী ছিলেন। কাজকর্ম্ম বাদে সারাদিন আমি তাঁর কাছে থাকিতাম। তাঁর হাত-পা টিপিতাম, হাওয়া করিতাম। বাড়ীতে খরচ পাঠাইয়া বেতনের অবশিষ্ট টাকা গুলি তাঁরই হাতে দিতাম। তিনি যেমন বলিতেন, তেমনই খরচ করিতাম। দিন দিন তাঁর উপরে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম, যে তাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত না। সাধন ভজনও প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। উপকার তাহাতে কিছুই বোধ করিতাম না, অথচ তাঁহাকে ভাল লাগিত। আমাকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ একদিন গোবিন্দদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দদাস আসিতেই ঐ সাধুটি চলিয়া গেলেন। বোধ হয় গোবিন্দদাসই তাঁকে সরাইয়া দিলেন। গোবিন্দদাসের সঙ্গে বড়ই আনন্দে ছিলাম। গুরুতে ও সাধন ভজনে যাহাতে নিষ্ঠা-ভক্তি হয়, তিনি সেইরূপ উপদেশই করিতেন। বড়ই দয়ালু ছিলেন। কারও ক্লেশ দেখিলে, অস্থির হইয়া পড়িতেন। একদিন একটী খোঁড়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য আমার নিকটে আসিতেছেন দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আহা! এই গরীব ব্রাহ্মণটির সাম্‌নে প্রারব্ধের দারুণ ভোগ। এই ভোগে পড়িলে, ইহার জীবন ক্লেশে ক্লেশেই শেষ হইবে। জীবনে আত্মার কল্যাণকর কোন কর্ম্মই আর করিতে পারিবে না।" এসব কথা হইতেছে, এমন সময়ে সেই ভিখারী ব্রাহ্মণ আসিয়া, আমার নিকটে কিছু ভিক্ষা চাহিল। গোবিন্দদাস আমাকে কিছু সময়ের জন্য ভিতরে যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

গোবিন্দদাস ভিখারীকে গালি দিয়া বলিলেন—আরে শালা? কাঁহে ভিখ্ মাঙ্গ্‌নে আয়া? মজুরী নাহি কর্‌নে সেক্‌তা?

ব্রাহ্মণ—তোম্‌রা পাছ্ নাহি মাঙ্গ্‌তা।

গোবিন্দদাস—আরে শালা, লুচ্চা! তোহার বাপ্‌কা পাছ্ মাঙ্গ্‌তা হ্যায়?

ব্রাহ্মণ—তুতো বড়া সাধু বন্‌কে বৈঠা হ্যায়। চুপ রহো! গালি মৎ দেও!

গোবিন্দদাস অমনি "নিকাল্ শালা, নিকাল্ শালা" বলিতে বলিতে মোটা লাঠী দ্বারা ভিখারীকে এমন প্রহার করিলেন, যে তার একখানা হাত ভাঙ্গিয়া গেল। গোবিন্দদাস তখন আমাকে ডাকিয়া, উহাকে হাঁসপাতালে নিয়া ঔষধ দিতে বলিলেন। আঘাত গুরুতর ছিল, আমি সাংঘাতিক বলিয়াই রিপোর্ট করিলাম। মামলা আরম্ভ হইল। গোবিন্দদাস আমাকে বলিলেন—বাবু সাব! আব্ দু'তিন বরষকো লিয়ে হাম যাতা হ্যায় জেলখানা। উস্‌মে ক্যা? ব্রাহ্মণ তো বাঁচ্‌গিয়া। গোবিন্দদাসের দুইবৎসর সশ্রম জেল হইল।

আমি দাদাকে বলিলাম—ঠাকুর গোবিন্দদাসের কথা শুনিয়া, ঢাকার কয়েকটী সম্ভ্রান্ত লোককে তাঁর ক্লেশ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই মত কাজও হইয়াছে। গোবিন্দদাস কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশীর জেলখানায় ছিলেন। গোবিন্দদাসের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, যে—**গোবিন্দদাস যথার্থই মহাত্মা। ভিখারী ব্রাহ্মণের উৎকট প্রারব্ধের ভোগ কাটাইতেই তিনি তাঁহাকে প্রহার করেন, এবং তাঁর ভোগ লইয়াই তিনি জেলে যান। মহাত্মাদের কার্য্যের গূঢ় রহস্য বুঝা কঠিন।**

অপ্রাকৃত আরতির গন্ধ।

গতকল্য মহাষ্টমীতে নিরম্বু উপবাস করিয়া, জপ হোম ও চণ্ডীপাঠে সারাদিন অতিবাহিত হইয়াছে। আজ নবমীতেও দিনটি সাধন ভজনে বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যারপর আহারান্তে বাহিরের আঙ্গিনায় দাদার সঙ্গে বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতেছি, অকস্মাৎ দিব্য আরতির পবিত্র গন্ধ পাইলাম। ধূপ-ধূনা-চন্দন-গুগ্‌গুলাদি জ্বালাইয়া যেন মহা সমারোহে নিকটেই কোথায়ও মায়ের আরতি হইতেছে। এই অদ্ভুত সুগন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু, দাদা ও আমি অনুসন্ধান করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

১৫ই আশ্বিন, রবিবার।

হাঁসপাতালের তিন দিকে 'ধূ-ধূ মাঠ', একদিকে বড়রাস্তা, তাহারও নিকটে কোন লোকালয় নাই। গন্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরম পবিত্র সুগন্ধকে মায়ের অপ্রাকৃত প্রসাদজ্ঞানে প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিতে লাগিলাম। অন্যূন দেড়ঘণ্টাকাল এই গন্ধ আমাদিগকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিল। মনে হইতে লাগিল, যেন ঠাকুরেরই কাছে বসিয়া রহিয়াছি। দাদাও এই গন্ধ পাইয়া বিস্ময়ের সহিত দুঘণ্টা কাল একই ভাবে অবাক্ হইয়া রহিলেন।

ভিক্ষা করিতে দাদার অনুমতি।

বস্তি আসিয়া কয়েকদিন ভিক্ষা বন্ধ রহিল। প্রত্যহই আহারের সময়ে কান্না পাইতে লাগিল। ঠাকুরকে কাতরভাবে নিজের অবস্থা জানাইতে লাগিলাম। ভিক্ষান্ন বন্ধ হওয়াতে আহারে তৃপ্তি নাই, ভজনে উৎসাহ নাই, মনেও শান্তি নাই। বড়ই দুঃখে দিনরাত কাটিয়া যাইতেছে। আজ দাদা কথায় কথায় বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি ভিক্ষা করিয়া খাও কেন? ভিক্ষায় লাভ কি?" আমি বলিলাম—লাভালাভ ঠাকুর জানেন। তবে আমি তো দেখিতেছি, ভিক্ষান্নে যে তৃপ্তি, ঘরের অন্নে তাহা নাই। ঘরের অন্ন আহারে উৎসাহ উদ্যম যেন নিবিয়া যাইতেছে, মনে সর্ব্বদাই একটা উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। দাদা একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তা হ'লে আজ থেকেই আবার ভিক্ষা আরম্ভ কর। গুরুর যখন আদেশ—তখন ইহা কর্‌তেই হবে। তবে সহরে তুমি ভিক্ষা ক'রো না।"

১৮ই আশ্বিন, বুধবার।

সদ্‌ব্রাহ্মণের হস্তে প্রথম ভিক্ষা।

আমি সহরের বাহিরে প্রায় ৩।৪ মাইল অন্তরে পাড়াগাঁয়ে যাইয়া ভিক্ষা করিব স্থির করিলাম। ইহাতে আমার কোন ক্লেশই হইবে না—বরং উহা মনে করিয়া আনন্দই হইতেছে। একাদশীতে নিরম্বু করিয়া গতকল্য দ্বাদশীতেও অন্ন গ্রহণ করি নাই—লুচি খাইয়াছি। অদ্য ত্রয়োদশীতে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে বাসা হইতে ঘটি লইয়া বাহির হইলাম। জীবনে অপরিচিতের নিকটে কখনও ভিক্ষা করি নাই, আজই প্রথম। রাস্তায় চলিতে চলিতে বুদ্ধদেবের কথা মনে হইল। ভগবান্ গুরুদেব যেন বুদ্ধদেব রূপে আমার অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, মনে এরূপ একটা ভাব আসিয়া পড়িল। আমি পুনঃ পুনঃ বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। এক

১৯শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

সময়ে বুদ্ধদেব-রূপে গুরুদেব এই স্থানে বৈরাগ্যের কি দৃষ্টান্তই দেখাইয়া গিয়াছেন, স্মরণ করিয়া প্রাণ উদাস হইয়া উঠিল। ভিক্ষার জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে একটী গৃহস্থ-বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! কি চাই?" আমি বলিলাম—"আপনাদের সকলের আহার হইয়াছে?" তাঁহারা বলিলেন "মধ্যাহ্নে সকলেই আহার করিয়াছি।"

আমি—তা হ'লে আমাকে ভিক্ষা দিন্।

তাঁহারা খুব ভক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কয় জন?"

আমি—আমি একা।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খুব শ্রদ্ধার সহিত প্রচুর পরিমাণে চাল আলু ও নুন্ আনিয়া দিলেন। আমি নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ভিক্ষান্ন আহার করিয়া আজ বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। যদিও চাউলগুলি বাছিয়া নিলে প্রায় কিছুই থাকিত না, তথাপি রান্নার পরে উহার স্বাদ উৎকৃষ্ট হইল। মনে একটা ভরসা হইল—আজ প্রথম দিনে অপরিচিত স্থলে ভিক্ষায় যখন সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে শ্রদ্ধার অন্ন পাইলাম, তখন প্রত্যহই এই প্রকার পাইব।

ভিক্ষায় তাড়না ও সমাদর।

ঠাকুরের ইচ্ছা বুঝি না; আজ দুই ক্রোশ পথ চলিয়া ভিক্ষার জন্য একটী কসাইএর বাড়ী উঠিলাম। ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিতীয়বার একটী মেথরের বাড়ী পঁহুছিলাম। পরিচয় পাইয়া ওখান হইতে চলিয়া আসিলাম, এবং গ্রামান্তরে যাইয়া একটী গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা চাহিলাম। তাহারা হাতে ঠেঙ্গা লইয়া আমাকে তাড়া করিয়া আসিল, আমি দৌড় মারিলাম। তিন বাড়ী ভিক্ষার চেষ্টা করিয়া বাসায় আসিলাম। দাদার ঘরে ভিক্ষা করিলাম। দাদা আমার ভিক্ষার দুর্দ্দশা শুনিয়া পুরানো বস্তির বাজারে ভিক্ষা করিতে বলিলেন। বাজারে প্রত্যহই ভিক্ষায় উৎকৃষ্ট বস্তু পাইতে লাগিলাম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করি না দেখিয়া, সকলেই আমাকে মহাত্মা ঠাওরাইল। মিষ্টি, দুধ, রাবড়ি, তরিতরকারি লোকে প্রচুর পরিমাণে দিতে লাগিল। প্রত্যহই প্রয়োজন মত কিছু লইয়া অবশিষ্ট সবই ফিরাইয়া দিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার উপরে সাধারণের শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইল। কখন আমি আসিব ভাবিয়া অনেকেই আমাকে ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এ সব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে

২০শে আশ্বিন, শুক্রবার।

পাড়া গাঁয়েও ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। বস্তিতে আসিয়া ভিক্ষান্ন আহারে আনন্দ স্ফূর্ত্তি ও যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম, পূর্ব্বে আর কখনও তাহা পাই নাই। জয় গুরুদেব!

পর্য্যটন কালে সাধনে নিবিষ্টতা।

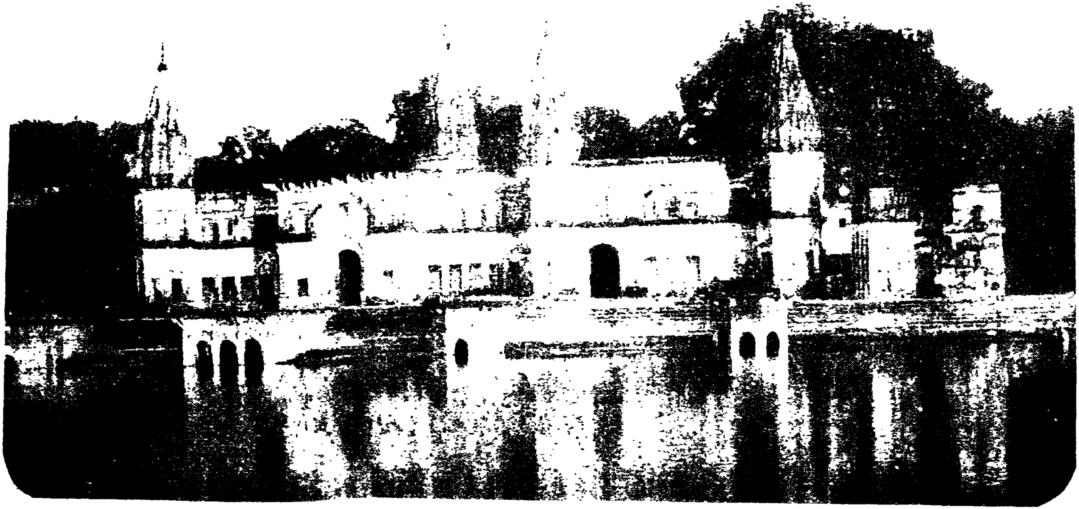
ভিক্ষার সূত্র ধরিয়া ঠাকুর আমাকে পর্য্যটনের এক আশ্চর্য্য উপকারিতা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। পর্য্যটনকালে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্বভাবতঃই স্থূল ও দীর্ঘ হওয়ায়, মনটিকে তাহাতে নিবিষ্ট রাখা খুব সহজ সাধ্য হয়। কিন্তু আসনে স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক স্বাভাবিক সরুনালের অনুগামী হওয়া অতিশয় শক্ত। কারণ, শরীরের অভ্যাসগুণে মনটিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, প্রতিনিয়ত বিষয়ান্তরে আকর্ষণ করে; কিন্তু ভ্রমণকালে সর্ব্বাঙ্গের চেষ্টা পর্য্যটনেই ন্যস্ত থাকায়, চৈতন্য প্রধানতঃ শ্বাসে প্রশ্বাসে সংযুক্ত হয়। তখন নিবিষ্টমনে নামটিকে উহাতে যোগ করিতে বিশেষ সাহায্য পওয়া যায়। বোধ হয় পরিব্রাজক, সাধু-সন্ন্যাসী, পরমহংসেরা সাধনে এই অসাধারণ সাহায্য লাভের জন্যই সর্ব্বদা পর্য্যটনে থাকেন। আহার নিদ্রা ব্যতীত কোথাও তাঁহারা অধিকক্ষণ একস্থানে অবস্থান করেন না। এতকাল ভাবিয়াছি, যাহারা সারাদিনই ঘুরিয়া বেড়ায় তাদের আর ভজন সাধন কি? ঠাকুর আমার এই ভ্রম পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন।

২২শে—২৫শে আশ্বিন।
১২৯৯।

উপরি শক্তির অনুভব। প্রেতের উপদ্রব।

রাত্রে নাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ি। যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয়, কে যেন খাটিয়াখানা শুদ্ধ আমার সর্ব্বশরীর ঝাঁকিয়া দেয়। আবার কখনও কখনও এই ঝাঁকুনিতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই ঝাঁকি প্রায় ১ মিনিটকাল, কখন কখন অধিক সময়ও থাকে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত এমন কাঁপিতে আরম্ভ করে, যে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে পারি না। এই সময়ে আপনা আপনি খুব নাম চলিতে থাকে, ঝাঁকুনিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলেও দেখি ভিতরে ভিতরে দ্রুতবেগে নাম চলিতেছে। এরূপ কেন হয়, অনুসন্ধানে কিছুই বুঝিতেছি না। মনে হয়, কোন শক্তিশালী ফকির আমার হিতোদ্দেশ্যেই এই প্রকার করিতেছেন। গেণ্ডারিয়ায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া নাম করিবার সময়ে, কখন কখন এরূপ ঝাঁকুনিতে আসন শুদ্ধ সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিত। ঠাকুরকে জ্ঞাত করায় তিনি বলিয়াছিলেন—ওরূপ হওয়া

খুব ভাল। এইরূপ ঝাঁকুনিতে আমি ভীত না হইয়া বরং আনন্দই অনুভব করিতেছি। এসব কথা দাদাকে বলায় দাদা কহিলেন—"হাঁসপাতালের মধ্যে থাকায় অনেক সময়ে প্রেতের উপদ্রব দেখিতে পাই। ফয়জাবাদ হাঁসপাতালে একটী রোগী অনেক দিন ভুগিয়া মারা যায়। তাহার স্থানে অন্য একটী রোগী রাখা হইলে, সে দুদিন থাকিয়াই চলিয়া গেল। ক্রমে তিন চারিটী রোগী দিলাম, কিন্তু সকলেই নানাপ্রকার প্রয়োজনের ভানে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহার হেতু কি জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—"ঐ বিছানায় যে থাকে রাত্রে একটা প্রেত আসিয়া তারই উপর উপদ্রব করে। প্রেত বলে—'তু হামারা বিস্তারা পর্ কাঁহে লেটা, তোহারা জান্ লেএঙ্গে।' এই বলিয়া প্রেত তার বুকে চাপিয়া বসে এবং গলা টিপিয়া ধরে। জাগিয়া থাকিলে কিছুই করে না—কিন্তু নিদ্রিত হইলেই এই প্রকার উপদ্রব।" আমি সকলকে বলিয়া দিলাম—"আচ্ছা আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। নূতন রোগী দিলে তাকে এসব কথা কেহ বিন্দুবিসর্গ বলিও না।" পরে একটি জোয়ান্ মর্দ্দ রোগীকে ঐ খাটিয়ায় থাকিতে দিলাম, এবং রোগমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে যাইতে পারিবে না, এই ব্যবস্থায় তাহাকে রাজী করাইয়া নিলাম। পরদিন হাঁসপাতালে যাইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন ছিলে?" রোগী বলিল—"বাবু সাহেব! এখানে বড় মাথা গরম হয়—রাত্রে ঘুম হয় না।" আমি বলিলাম—আচ্ছা আজ ঘুমের ঔষধ দিব। দ্বিতীয় দিনে সকালে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ক্যায়সা রহা রাত্‌মে?" রোগী বলিল—'বাবু সাব্! আপ কৃপা কর্‌কে হাম্‌কো ছোড়্ দিজিয়ে, হাম্ ইহাঁ নেহি রহেঙ্গে।' আমি উহার কথার কোন উত্তর না দিয়া, যাহারা রোগীদের খাবার দেয়, এবং সেবা-শুশ্রূষা করে, তাহাদের খুব ধমক্ দিয়া বলিতে লাগিলাম—"তোমরা আমার রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ, ভাল খাবার দেও না, সেবা-শুশ্রূষা কর না, তাই যাইতে চায়। এই রোগী আবার এইরূপ বলিলে তোমাদের তাড়ায়ে দিব।" এই বলিয়া রোগীর খাবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। রোগী চুপ্ করিয়া রহিল। তৃতীয় দিনে দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, রোগী খাটিয়া হইতে নামিয়া বসিয়া আছে। এক হাতে তার মোটা লাঠি—লাঠির মাথায় ঘটি বাঁধা; আর এক হাত হাঁটুর উপরে, বস্তা ধরিয়া আছে—ঠিক্ যেন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি উহার নিকট পঁহুছিতেই—'বাবু সাব্! সেলাম! আব্ তো হাম্ চল্‌তি।' বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। আমি অমনি ধমক্ দিয়া বলিলাম—"নেহি, তোমারা রয়্‌নে হোগা।" রোগী খুব উত্তেজিত হইয়া



অযোধ্যার গুপ্তার ঘাট

এই স্থানেই সরযূ গর্ভে লক্ষ্মণ গুপ্ত হন

আমাকে বলিল—'যাহান দেএঙ্গে ক্যা? নিত্ রাতমে শালা জিন আয়কে, হামারা ছাতিপর বৈঠ্তা, আউর মারপিঠ্ করতা। বোল্তা—'তোহার জান্ লেএঙ্গে। খাটিয়া ছোড়্দে।' হাম সারারাত্ ইহাঁ নিচু মে বৈঠ্ রয়তে। মই তো কভি নেহি রহেঙ্গে।'

ডাক্তার ওব্রায়েন (O' Brien তখন ছিলেন, তিনি খাটিয়াখানা সরযূতে ফেলিয়া দিতে বলিলেন।

একটী স্বপ্ন দেখার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে ফিরিয়া যাইতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু দাদাকে ইহা বলিতে সাহস পাইতেছি না। দাদা অবসর সময়ে এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চান না। আমি চলিয়া গেলে দাদা নিতান্তই সঙ্গহীন হইয়া পড়িবেন। দাদা নিজে আমাকে অন্যত্র যাইতে বলিবেন এরূপ মনে হয় না। এই সঙ্কটে ঠাকুর যদি কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন তবেই হইবে—না হইলে আর উপায় নাই।

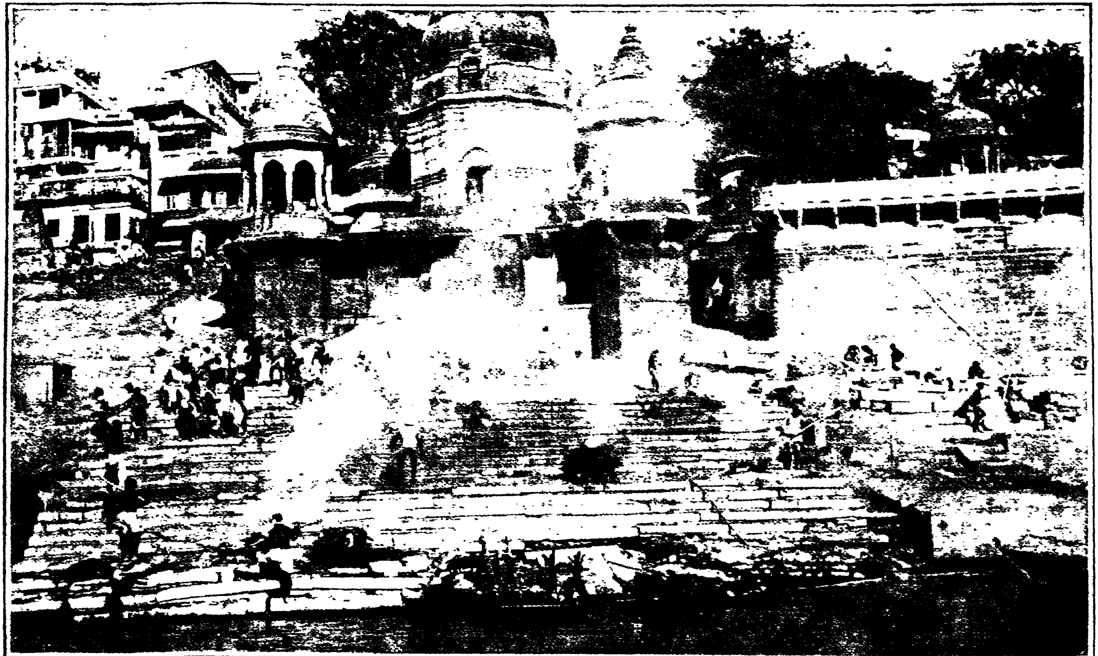
বস্তিত্যাগ, অযোধ্যায়—হা রাম! উদাস ভাব।

ভাগিনেয় শ্রীমান সুরেন্দ্রের পত্রে জানিলাম, ভাগলপুরে উহাদের বাড়ীতে আবার আভিচারিক ক্রিয়াজনিত নানা উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। আমাকে অবিলম্বে তথায় যাইতে আমার ভগিনীপতি মথুর বাবু দাদাকে তার করিয়াছেন। উহাদের বিশ্বাস আমি ভাগলপুরে থাকিলে যাদুকরেরা কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। দাদাও আমাকে ভাগলপুরে পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। আকস্মিক এই ব্যাপারে আমার বস্তি ত্যাগের সুবিধা হইল। আমিও যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

১লা কার্ত্তিক, রবিবার।

বস্তিতে আসিয়া দাদার সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। সাধনভজনে দীর্ঘকালব্যাপী এমন সুন্দর অবস্থা বড় শীঘ্র ভোগ করি নাই। ঠাকুর সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে—এই ভাবটি যেন একটানা লাগিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরকে স্মরণ করিলেই চক্ষে জল আসে, নামে ঠাকুরের স্মৃতি উজ্জ্বল করে। নিকটে থাকা অপেক্ষা দূরে থাকিয়া ঠাকুরের ধ্যানেই যে অধিক আনন্দ ইহা এবার পরিষ্কার উপলব্ধি করিলাম। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভুমি অযোধ্যা দর্শন করিয়া ভাগলপুরে যাইব, স্থির করিলাম। দাদাকে একাকী রাখিয়া যাইব ভাবিয়া প্রাণ অস্থির হইল। এই সময়ে ৺মাধুদাস বাবার শিষ্য সাধু কানাইয়ালালজী ফয়জাবাদ হইতে দাদাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দাদা খুব আনন্দে থাকিবেন। আমিও সুযোগ বুঝিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভাগলপুর যাত্রা করিলাম। সাড়ে নয়টায় বস্তিতে ট্রেনে চাপিয়া অপরাহ্নে সরযূতীরে 'লকরমণ্ডি' ঘাটে

নামিলাম। রাস্তায় ক্ষুধা ও পিপাসায় বড়ই অবসন্ন হইয়াছিলাম। একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আমাকে আসিয়া বলিলেন—"বাবাজী! কিছু খাবেন? পুরী, কচুরী, লাড্ডু কিছু আনিয়া দেই।" আমি বলিলাম—না, বাজারের ওসব আমি খাই না—অযোধ্যা গিয়া হনুমান্‌জীর প্রসাদ পাইব। ভদ্রলোকটি একটী মাটির হাঁড়ি হইতে উৎকৃষ্ট বর্‌ফি তুলিয়া আমার সম্মুখে রাখিতে লাগিলেন, বলিলেন—"এই প্রসাদ হনুমান্‌জী আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন। হনুমান্‌জীকেই ভোগ চড়াইয়া এই প্রসাদ লইয়া আমি বাড়ী যাইতেছি—স্বচ্ছন্দে আপনি সেবা করুন। হনুমান্‌জীকে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বরফি ও সরযূর ঠাণ্ডা জল প্রাণ ভরিয়া খাইলাম। ভক্তরাজ মহাবীরের এত দয়া! স্মরণ করিয়া চক্ষে জল আসিল। পুণ্যসলিলা সরযূর বিশালবক্ষে চড়া পড়িয়াছে দেখিয়া প্রাণে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সরযূকে প্রণাম করিয়া চড়ার উপর দিয়া চলিলাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা এখন সরযূর গর্ভে। চলিতে চলিতে মনে হইল—এই স্থানেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অপ্রাকৃত অযোধ্যা ধাম। রাম আজ কোথায়! রামের কথা মনে হওয়ায় প্রাণ উদাস হইয়া পড়িল। একটা শোকাবেগ উপস্থিত হইল; এবং ভিতর হইতে আপনা আপনি 'হা রাম! হা রাম!' শব্দ বারংবার উঠিতে লাগিল। আমি কান্দিতে কান্দিতে চলিলাম। সরযূর বালি গায়ে মাখিয়া পুনঃ পুনঃ রামকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। তখন সেই পরিষ্কার অভ্রকণার মত সরযূর শ্বেতবর্ণ বালিতে নবদূর্ব্বাদল শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ্যুতি প্রকাশিত হইল। চড়ার সর্ব্বত্রই সেই স্নিগ্ধ সবুজ জ্যোতিঃ খণ্ডাকারে ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। এরূপ জ্যোতিঃ আর কখনও আমি দেখি নাই। দেখিয়া ভিতরের অবস্থা যে কিরূপ হইল, ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ তোমরা কোথায়?'—এইরূপ ভাব মনে হওয়ায় প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে একটী হিন্দুস্থানী অকস্মাৎ এই মর্ম্মে গাহিতে লাগিলেন—শ্রীরাম এখনও অযোধ্যার বনে বনে সরযূর পাড়ে পাড়ে হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। গানটি শুনিয়াই প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল। চড়া হইতে নৌকায় চড়িয়া সরযূ পার হইয়া অযোধ্যায় আসিলাম। দেখিলাম অযোধ্যা নীরব নিস্তব্ধ, এত বড় সহরে একটু টুঁ শব্দ নাই। সকলেই যেন রামশোকে ম্রিয়মাণ, অবসন্ন!



কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাট

কাশীতে পাণ্ডার উপদ্রব। ঠাকুরের শাসনবাক্য স্মরণ। তারাকান্ত দাদার বাসা।

অযোধ্যার পথে পথে কিছুক্ষণ বেড়াইলাম, প্রাণ উদাস উদাস করিতে লাগিল। তখন কাশী যাইব স্থির করিয়া রাণুপালী ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসন মাষ্টার দাদার একটী বন্ধু। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া নিজ বাসায় লইয়া গেলেন, এবং নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীদ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। পরে যথাসময়ে কাশীর গাড়ীতে চাপাইয়া দিলেন। আমার গাড়ীতে অন্য লোক না উঠায় বড়ই আরামে রাত্রি যাপন করিলাম। শেষ রাত্রে রাজঘাট ষ্টেসনে নামিলাম। গঙ্গায় স্নান-তর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে মণিকর্ণিকায় পঁহুছিলাম। স্নান-তর্পণ শেষ হইলে পাণ্ডা ও গঙ্গাপুত্রেরা আমাকে শ্রাদ্ধ করিতে জেদ্ করিতে লাগিল। আমি করিব না বুঝিয়া তাহারা আমার ঝোলাকম্বলাদি টানাটানি করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের অত্যাচার ও গালাগালিতে আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, ঠাকুর যদি আমাকে কোন শক্তি দিতেন, তাহা হইলে এই অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতাম। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—**এখন যদি তোমার যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়, সংসার তুমি ছারখার করবে।** ঠাকুরের কথায় তখন আমার বিশ্বাস হয় নাই; বরং আমার মনে হইতেছিল—ঠাকুর কি আমাকে এতই হীন নীচাশয় মনে করেন? আজ দয়াল ঠাকুর আমার সেই সংশয় দূর করিলেন—অভিমান চূর্ণ হইল। আমি বিষম ক্রোধভরে পাণ্ডাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। একজন পাণ্ডা তখন সহসা ভীত হইয়া আমাকে বলিল—"বাবাজী ক্রোধ করিবেন না। তীর্থের কার্য্য আপনারাই তো রক্ষা করিবেন। আপনারা এসব করিয়া আমাদের মর্য্যাদা না করিলে সাধারণে করিবে কেন?" আমি শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। পাণ্ডাকে নমস্কার করিয়া পদধূলি লইলাম। পরে মুটিয়ার অভাবে হাতে ঝোলা, কাঁধে বস্তা লইয়া কেদার ঘাটে চলিলাম। রাস্তায় মুটে জুটিল। তারাকান্ত দাদার বাসা বহুক্ষণ তালাস্ করিয়াও পাইলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া ক্লান্ত শরীরে একটী বাড়ীর দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। ঝোলা বস্তা রাখিয়া, মুটেকে বিদায় করিলাম। আশ্চর্য্য গুরুদেবের দয়া! ঐ বাড়ীরই একটী মেয়ে আমাকে দেখিয়া ভিতরে গিয়া খবর দিল। এই বাড়ীই তারাকান্ত দাদার, তাঁর স্ত্রী আসিয়া যত্ন করিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহ নাই। তারাকান্ত দাদা কয়দিন হইল গয়া গিয়াছেন। আমি তেতলায়

নির্জ্জন ঘরে আসন করিয়া বসিলাম। নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন কি করি? এই লোকশূন্য বাড়ীতে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে, একাকী আমি এখানে কি প্রকারে থাকিব? যদি তারাকান্ত দাদা ৪।৫টার মধ্যে না আসেন, আজই আমি ভাগলপুর যাত্রা করিব। ঠাকুরের ব্যবস্থা চমৎকার! ঠিক্ বেলা ১১টার সময়ে তারাকান্ত দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর আদরযত্ন ও ভালবাসায় কাশীতে কয়দিন বড়ই আনন্দে কাটাইলাম।

পূর্ণানন্দ স্বামী। কেদারেশ্বর দর্শন। সাধুর আদেশ—চলা যাইয়ে ভাগলপুর।

শুনিলাম, ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, এখন তান্ত্রিক সাধন অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার নাম এখন ব্রহ্মানন্দ স্বামী। কাকিনিয়ার ছত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাকে নিয়া নিজ আসনে বসাইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আছে দেখিয়া, আমি ঐ আসন নমস্কার করিয়া পৃথক্ আসনে বসিলাম। স্বামিজী যথারীতি নিঃশব্দ প্রাণায়াম করিতেছেন দেখিলাম। মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীকেও দেখিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহার বাড়ীর দ্বারে পঁহুছিয়া দেখি, তিনি তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, একটী লোককে খুব গালাগালি করিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দর্শনান্তে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। মহাত্মাদের কার্য্যকলাপের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝি না। নিজ সংস্কার মত তাঁহাদের বিচার করিয়া অপরাধী হইতে হয় মাত্র। স্থির করিলাম, কাশীতে আর সাধু দর্শন করিব না। ঠাকুরের নির্ব্বিকার বিগ্রহ-মূর্ত্তিই প্রাণ ভরিয়া দেখিব। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া কেদারের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে প্রবেশমাত্র সমস্ত শরীর অবশ হইয়া পড়িল। কেদারকে স্পর্শ করিয়া যেন ঠাকুরকেই স্পর্শ করিতেছি মনে হইল। তখন প্রাণের অবস্থা যে কি প্রকার হইল বলিতে পারি না। পরম দয়াল ঠাকুর আমার চিরকাল আদরের ধন। ভক্তেরা তাঁর যথার্থ আদর এসব স্থানেই করিতেছেন। পতিত দুরাচারীদেরও সামান্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া, দুর্ল্লভ মুক্তি প্রদান করিতেছেন। জয়-শিব-কেদার! জয় ঠাকুর! ভক্তজনের আদর যত্নে, সেবা পূজায় তুমি চিরকাল সুখে থাক; দূর হইতে দুর্জ্জন আমি, তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

আজ একটী ভাল উদাসীন সাধু আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"আপ্ কাঁহে আব্‌তক্ রহা হ্যায় কাশী? তুরন্ত্ চলা যাইয়ে ভাগলপুর।" শ্বেত সরিষা ও শ্বেত মরিচ ইনিই এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিতে বলিলেন। আমি উহা লইয়া ভাগলপুর যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

দানাপুরে আমাকে গ্রেপ্তারের আয়োজন।

অপরাহ্নে রাজঘাট ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেনে চাপিলাম। মোগলসরাই ষ্টেসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। লোকের অতিশয় ভীড়, অতি কষ্টে একখানা গাড়ীতে একটু স্থান পাইলাম। রেলের বড় সাহেব আমাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আমাকে আসিয়া বলিলেন—"তুমি সাধু, এখানে তোমার ক্লেশ হচ্ছে। আমার সঙ্গে এস, ভাল স্থান দিয়া দিচ্ছি।" আমি সাহেবের সঙ্গে চলিলাম। সাহেব আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা নির্জ্জন গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। সাহেব অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। আমি কতকাল যাবৎ সাধু হইয়াছি, এখন কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, সমস্ত খবর নিলেন। দু'তিন ষ্টেসন অন্তর অন্তর সাহেব আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দানাপুর পঁহুছিবার কয়েক ষ্টেসন পূর্ব্বে সাহেবকে আর দেখিতে পাইলাম না, আমার কামরাও চাবিবন্ধ। মনে একটু সন্দেহ জন্মিল। দানাপুর ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে দেখি, প্ল্যাটফর্ম্মে কতকগুলি সঙ্গীনধারী গোরা পল্টন দাঁড়াইয়া আছে। একটু পরে গোরা সৈন্যগণ আমারই গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইল। একটী 'মিলিটারি' সাহেব আমার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, একখানা পুস্তকে লিখিতে লাগিলেন। লোকের ভীড় হইয়া পড়িল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে। আমি কাতর প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একটী চাপরাশী একখানা তার লইয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই 'মিলিটারি' সাহেবের হাতে দিল। সাহেব উহা পড়িয়া আমাকে সেলাম দিয়া দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন। কি জন্য এ সব কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ইহার পর দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি চলিয়া গেলে পর একদিন রাত্রি ৮ টার সময়ে হঠাৎ সিভিলসার্জ্জন আসিয়া রোগীর কথা বলিতে বলিতে আমাদের পরিবারের কথা তুলিলেন। আমরা ক ভাই কে কোথায় থাকি—তুমি কি কর, সাধু হইয়াছ কেন, কবে আমার এখান হইতে গিয়াছ, সব খবর নিয়া গেলেন। বোধ হয়

তোমার সম্বন্ধে খবর জানিতেই রেলের সাহেব সিভিল সার্জ্জনকে তার করিয়াছিলেন। পরে সিভিল সার্জ্জনের তার পাইয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। 'রুশিয়ানরা ভারত আক্রমণ করিবে' গুজব। তোমাকে হয়ত 'রুশিয়ান স্পাই' অনুমান করিয়াছিলেন।"

আবার সেই প্রেতের দারুণ আর্ত্তনাদ।
প্রত্যক্ষেও বিশ্বাস জন্মে না।

৫ই কার্ত্তিক, অমাবস্যা।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভাগলপুর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। গতবারে যে মুটেকে লইয়া বাসায় গিয়াছিলাম, অদৃষ্টক্রমে এবারেও তাহাকেই পাইলাম। খঞ্জরপুর যাইতে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সাথী হইলেন। সেই বারে যে স্থানে প্রেতের চীৎকার শুনিয়াছিলাম, ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। মুটিয়া বলিল—"বাবা, গতবারের কথা মনে আছে ত?" আমি বলিলাম—"হাঁ, আছে—ভয় নাই, চল।" এই বলিয়া ঐ গাছের নীচে যেমন আসিলাম, প্রেতের হৃদয়-বিদারক কান্না আরম্ভ হইল। ভয়ানক ক্লেশসূচক সেই বিকট চীৎকার শুনিয়া মুটে ও ব্রাহ্মণটি দৌড় দিল এবং সেই অন্ধকারে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই মধ্যে মধ্যে দ্রুম্ দ্রুম্ করিয়া আছাড় খাইতে লাগিল। "কে গো, কে গো? কেন এমন চীৎকার করছ?" বলিয়া উপরদিকে ও আশে পাশে তাকাইতে লাগিলাম। ভয়ঙ্কর অন্ধকার—কিছুই দৃষ্টিতে পড়িল না। ঠিক যেন বার চৌদ্দ হাত তফাতে থাকিয়া কোনও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত রোগী অসহ্য যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর পর্য্যন্ত এই শব্দ চলিল। কিন্তু একটু পরে অকস্মাৎ নীরব হইল। ব্রাহ্মণটি বলিলেন—"মহাশয়! আমি রাজা সূর্য্যনারায়ণ সিংহের গোমস্তা। গভীর রাত্রে এই পথে চলিতে আরও কয়েকবার এইরূপ শুনিয়াছি। এই প্রেতে কারও উপরই কোনও উৎপাত করেনা; কিন্তু অনেকেই এই স্থানে এই প্রকার চীৎকার শুনিতে পায়।" এ সব শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম—উঃ! প্রেতের যন্ত্রণা কি ভয়ানক! ইহ পরকালের মধ্যবর্ত্তী আবরণ ভেদ করিয়া ইহার আর্ত্তনাদ আসিয়া আমাদের শ্রবণ গোচর হইতেছে। ঠাকুরের নিকট ইহার শান্তির জন্য প্রার্থনা আসিয়া পড়িল। এই ক্ষেত্রে আমার ভিতরের সংস্কার দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইলাম। প্রেতের চীৎকার শব্দ কানে শুনিয়াও পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান জন্মিতেছে না। দেখিতেছি, প্রত্যক্ষের মূল্য কিছুই নাই। সত্য বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অন্তরের ভ্রান্ত সংস্কার দূর হয়

না। ঠিক্ যেন দিগ্‌ভ্রমের মত। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় হইতেছে দেখিয়াও তাহা পশ্চিম দিক বলিয়া মনে হয়। ইহার আর উপায় কি? রাত্রি প্রায় একটার সময়ে পুলিনপুরী উপস্থিত হইলাম।

যথার্থ দরদের সেবা। পাঠ বন্ধ ক'রে ঠাকুরের পাখা করা।

বাসায় মহাবিষ্ণুবাবু, অশ্বিনীবাবু ও ছোড়দাদাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঘোর অন্ধকারে দীর্ঘ পথ চলিয়া আসিতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম। হাত মুখ ধুইতে যেমন বারান্দায় গেলাম, ছোড়দাদা আমার কল্কীটি নিয়া এক কল্কী তামাক সাজিয়া আমার আসনের ধারে রাখিয়া গেলেন। আসক্তির বস্তু প্রয়োজন মত প্রস্তুত পাইয়া বড়ই আরাম হইল। ছোড়দাদার এই কার্য্যটি দেখিয়া আমি একেবারে অবাক্, মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। আমি ছোট ভাই, কখনও তাঁহার নিকটে এপর্য্যন্ত তামাক খাই নাই। আমার আরাম হইবে বুঝিয়া, অনায়াসে নিঃসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে আমাকে তামাক সাজিয়া দিলেন। সামান্য সামান্য কার্য্যেও মানুষের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। আহা! কবে ঠাকুর আমাকে ছোড়দাদার মত অসাধারণ দয়া ও সহানুভূতি দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

সেদিন গুরুভ্রাতা মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিলেন—"একবার গরমের সময়ে গোঁসাইয়ের সঙ্গে শান্তিপুরে ছিলাম। মধ্যাহ্নে আহারান্তে তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, আমি নিকটে বসিয়া শুনিতাম। একদিন অতিরিক্ত গরম পড়ায় ভাগবত শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত শরীর ঘামিয়াছিল। গোঁসাই ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া একখানা পাখা লইয়া আমাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আমি হঠাৎ জাগিয়া দেখি, গোঁসাই বাতাস করিতেছেন। কোন কথা না বলিয়া ঘুমের ভান করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। ভাবিলাম, ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া গোঁসাই আমাকে হাওয়া করিতেছেন—করুন, যতক্ষণ অদৃষ্টে আছে ভোগ করি! এ ভাগ্য কাহার হয়? ঘাম শুকাইয়া গেলে শরীর ঠাণ্ডা হইল। তখন গোঁসাই ধীরে ধীরে পাখাখানা রাখিয়া আবার ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। আমিও উঠিয়া বসিলাম। গোঁসাইয়ের আমাদের প্রতি কত মমতা—এই একটী সাধারণ কার্য্যেই বোঝ!" এখন মনে হইতেছে, নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ঠাকুরের যে সেবা, তাহা অনেক সময়েই প্রাণশূন্য, অভ্যস্ত ক্রিয়া মাত্র। দয়া ও সহানুভূতি হইতে যে সেবা তাহাই যথার্থ সেবা, দরদের সেবা। ঠাকুর দয়া কর! প্রাণে দরদ ভালবাসা দিয়া যথার্থ সেবক করিয়া লও।

নামের অর্থরূপ। নামে অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতিঃ।

ভাগলপুরে ঠাকুর আমাকে বড়ই আনন্দে রাখিয়াছেন। অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া আসনে বসি। এগারটা পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিয়া যায়। আবার বারোটা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আসনে থাকি। রাত্রে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত নাম, গান ও সৎপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা অতিশয় শক্ত বোধ হইতেছে। স্বাভাবিক শ্বাসে প্রশ্বাসে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেই শ্বাস রোধ হইয়া আসে। অনেক সময় আপনা আপনি কুম্ভক হয়। কুম্ভকে শ্বাস প্রশ্বাসের কোন প্রকার সংস্রব না থাকায় মনটিও নামেতে একাগ্র হয়। তখন নামটিকে একটী জীবন্ত শক্তি বলিয়া বোধ হয়। নাম করিতে করিতে আপনা আপনি ঠাকুরের রূপ প্রাণে উদিত হইতে থাকে। এখন দেখিতেছি, নামের সঙ্গে রূপ জড়ানো রহিয়াছে—নামে শুধু রূপকেই প্রকাশিত করে। 'ঘটি' বলিতে যেমন 'ঘ' এবং 'টি' মনে করি না, 'ঘটি' এই শব্দটিতেও মনোযোগ হয় না— ঐ শব্দটি বলা মাত্র যেমন 'ঘটি' বস্তুটিই অন্তরে আসিয়া পড়ে—নাম স্মরণমাত্র সেই প্রকার ঠাকুরকেই দেখাইয়া দেয়। রূপ ছাড়া নাম এখন আর হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া নাম আর চলে না। শ্বাস প্রশ্বাসই নামের শক্তির অনুসরণ করে। নামে যেমন রূপের প্রকাশ হয়, নামেই সেই প্রকার রূপের সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। নাম স্মরণে অন্তরে নিয়ত ঠাকুরের সঙ্গলাভ হওয়ায় ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দৈহিক সংস্কার বশতঃ এই ভালবাসা ক্রমে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে পরিণত হইল। দয়াময় ঠাকুর তাঁর অসাধারণ কৃপাগুণে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সকল একে একে এ অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া তাহার মাধুর্য্য সম্ভোগ করাইলেন। এখন আর সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা ঠাকুরের অশেষ গুণরাশির বিন্দুমাত্রও একটী বারের জন্য মনে আসে না। এখন কেবল মনে হয়—তিনি আমাকে ভালবাসেন; আমি তাঁর—তিনি আমার। কিছুদিন যাবৎ অত্যুজ্জ্বল নিবিড় কৃষ্ণ জ্যোতিঃ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হওয়ায় মন প্রাণ যেন আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া আছে। সকল জ্যোতিঃ অপেক্ষা এই জ্যোতির মোহিনী শক্তিই অধিক। অবিলম্বে ঠাকুরের নিকটে যাইতে প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

জহ্নুমুনির আশ্রম। ফকির দর্শন।

মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন—এখান হইতে কয়েক ষ্টেসন পশ্চিমে গেলে সুলতানগঞ্জ। এই সুলতানগঞ্জেই জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। এই স্থানেই জাহ্নবীর উৎপত্তি। মহাবিষ্ণুবাবুর

কথা শুনিয়া স্থলতানগঞ্জ যাইতে বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বাসার সকলেই স্থলতানগঞ্জ যাত্রা করিলাম। স্কুল বিভাগের একটী সব-ইন্‌স্পেক্টরের বাড়ী স্থলতানগঞ্জে। তিনি খুব যত্ন করিয়া আমাদিগকে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ীতে উঠিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। স্রোতস্বতী গঙ্গার বিশাল বক্ষস্থলে মন্দিরাকৃতি স্থগোল একটী পাহাড় দেখিলাম। খেয়া নৌকায় পার হইয়া পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম। আশেপাশে চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের নীচ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রত্যেকখানা প্রস্তরেই দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে! সমস্ত পাহাড়টিই দেবদেবীর মূর্ত্তিদ্বারা শৃঙ্খলা মত প্রস্তুত। মূর্ত্তিগুলি যুগ যুগান্তের হইলেও উহা এত পরিষ্কার ও স্থন্দর যে একটীর দিকে দৃষ্টি করিলে অপরটি দেখিতে অবসর হয় না। স্বাভাবিক ধারায় গঙ্গা আসিয়া এইস্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছেন। পরে আবার স্বাভাবিক ধারায়ই প্রবাহিত হইয়াছেন। শুনিলাম পুরাণে আছে, ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া গঙ্গা যখন সগরকুল উদ্ধারের জন্য সাগর-সঙ্গমে চলিলেন, এইস্থানে উপস্থিত হইতে না হইতে জহ্নুমুনি বলিলেন—"মা! তুমি দয়া করিয়া এই আশ্রমের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাও,—আমার আশ্রমটি নষ্ট করিও না।" কিন্তু মুনির কথা কর্ণপাত না করিয়া গঙ্গা সগর্ব্বে সোজা পথে আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন। তখন মহাযোগী জহ্নুমুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষে তুলিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গার শক্তি অপহৃত হইলে ধারাও তৎক্ষণাৎ স্থগিত হইল। ভগীরথ এই বিষম বিপদ দেখিয়া মুনির চরণে শরণাগত হইলেন; এবং পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিতে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যোগীবর ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ জানু ছেদন পূর্ব্বক গঙ্গার নিষ্ক্রমণের পথ করিয়া দিলেন। এইরূপে গঙ্গা জহ্নুমুনির জানু হইতে বাহির হইয়া জহ্নুস্থতা জাহ্নবী নামে বিখ্যাতা হইলেন, এবং শ্রদ্ধাসহকারে ঋষির আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণ করিলেন। স্থানটি এতই ভজনানুকুল ও এমন মনোরম যে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। অবশিষ্ট জীবন এখানেই আসিয়া অতি বাহিত করিব—মনে মনে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে লাগিল। গঙ্গা-স্নান করিয়া জহ্নুমুনির চরণোদ্দেশে সেই পুণ্যক্ষেত্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। পাহাড়ের উপরে ছোট ছোট গোফার মত ভজন কুটীর আছে, তাহারই একটীর সম্মুখে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। বড়ই আনন্দ হইল। অপরাহ্ন প্রায় ৪ টার সময়ে আবার গঙ্গা পার হইয়া তীরে আসিলাম। বাসায় আসিতে গঙ্গার ধারে, জঙ্গলের ভিতরে বহুকালের একটী পুরাণো ভাঙ্গা মস্‌জিদ দেখিতে

পাইলাম। মস্‌জিদটিতে একসময়ে কতই ভগবানের নাম হইয়াছিল মনে হওয়ায় উহা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দ্বারে যাইয়া দেখি, দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় দীনহীন কাঙ্গালের মত লেংটী মাত্র পরিধানে একটী ফকির চুপ্ করিয়া ঘরের এককোণে বসিয়া আছেন। আমরা দলে বলে এইস্থানে উপস্থিত হওয়ায় ফকির সাহেবের ভজনের ব্যাঘাত হইবে শঙ্কা হইতে লাগিল। ফকির সাহেব নিজ ভজনে মগ্ন, এদিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। বৃদ্ধ ফকির সাহেব কি বস্তু লইয়া এই জনহীন নিবিড় অরণ্যের আবর্জ্জনা পূর্ণ ভাঙ্গা মস্‌জিদের কোণে এভাবে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া আছেন—ভাবিয়া প্রাণ কেমন হইয়া গেল। ঠাকুর! কবে আমিও একান্তে এইরূপ তোমাকে লইয়া অহর্নিশ আনন্দে কাটাইব। সব-ইন্‌সেক্টর বাবুর আদর আতিথ্যে পরিতোষলাভ করিয়া রাত্রে ভাগলপুর পঁহুছিলাম।

মনোরমার অদ্ভুত গুরুনিষ্ঠা।

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা কয়েকদিন হয় ভাগলপুরে আসিয়াছেন। মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভগবান গুরুদেব মনোরমার ভিতর দিয়া গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, বর্ত্তমানে তেমনটি আর কোথায়ও শুনি নাই। মনোরঞ্জন বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ উদ্যমশীল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে তাঁর সেই উৎসাহ যেন দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে। এখন নীরবে ও একান্তমনে ভজন সাধনে কালাতিপাত করিতেছেন। পরিবারে ৬।৭ টী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, স্ত্রী ও নিজে; ইহা ছাড়া ২।৪ টী উপরি লোকও প্রায়ই আছে। কি ভাবে যে ইহাদের খরচ পত্র চলে, কিছুই বুঝা যায় না। মনোরঞ্জন বাবুর মুখে শুনিলাম যে ঠাকুরের আদেশ হইল—**ভাগলপুরে চলিয়া যাও, সেখানে গিয়া কিছুকাল থাক।** শ্রীমতী মনোরমা অমনি ভাগলপুরে আসিতে প্রস্তুত হইলেন। হাতে টাকা পয়সা কিছুই নাই, রেলভাড়া কোথায় পাইবেন ভাবিয়া মনোরঞ্জন বাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনোরমা বলিলেন—"ঠাকুর আমাকে ভাগলপুরে যাইতে বলিয়াছেন—আমি যাইব। হাওড়া ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ী ছাড়ার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব; ঠাকুর যদি রেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন রেলে যাইব; না হইলে রেলের লাইন ধরিয়া চলিতে থাকিব। ছেলে পিলে নিয়া তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পার, যাইবে—না হয় থাকিবে।"

সতী মনোরমা, দাতা কালীকুমারের কন্যা কখনও নাকি মিথ্যা কথা বলেন নাই; মিথ্যা সঙ্কল্পও তাঁর মনে উদয় হয় নাই। তিনি নিশ্চয়ই পদ ব্রজে যাত্রা করিবেন বুঝিয়া মনোরঞ্জন বাবু অগত্যা কন্যার বালা বন্ধক দিয়া কয়েকটী টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং কলিকাতার পাট তুলিয়া দিয়া হাওড়া ষ্টেসনে সকলকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। যে টাকা আছে তাহা দ্বারা জিনিষ পত্র ও ছেলেপিলে লইয়া ভাগলপুর পর্য্যন্ত যাওয়া চলেনা। মনোরঞ্জন বাবু অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ট্রেন ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, এই সময়ে একটী ভদ্রলোক আসিয়া, কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া মনোরঞ্জন বাবুকে বলিলেন, যে তিনি তাঁহাদের বস্ত্রক্রয়ের জন্য এই টাকা পাঠাইয়াছেন। মনোরঞ্জন বাবু ঐ টাকার সাহায্যে ভাগলপুর আসিয়াছেন। ভাগলপুরে পঁহুছিয়া পূর্ব্ব পরিচিত ব্রাহ্ম বামনদাস বাবুর বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন—এখন নূতন বাসা ভাড়া করিয়া আছেন। হাতে টাকা পয়সা নাই, খাবারও কোন সংস্থান নাই। এইরূপ অপরিচিত স্থানে এতগুলি ‘কাচ্চা বাচ্চা’ লইয়া কি ভাবে আছেন—কল্পনাও করিতে পারি না। কখনও অর্দ্ধাশনে কখনও বা অনশনে দিন পাত করিতেছেন। শুনিলাম, ইতিমধ্যে একদিন ঘরে কিছুই নাই, ছেলেপিলেগুলি ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাকে গিয়া বলিল—“মা! বড় ক্ষুধা পেয়েছে।” মা অমনি ঠাকুরের ফটো দেখাইয়া বলিলেন—“বাবা! গোঁসাই তোমাদের বড় ভালবাসেন। তাঁর নিকটে খাবার চাও।” ছেলেপিলে গুলিও অদ্ভুত—পিতা মাতারই প্রকৃতির প্রতিরূপ। একে অন্যকে বলিতে লাগিল—“বেশ ত চল, আমরা গোঁসাইকে গান শুনাই, তিনি সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ভাল বাসেন।” এই বলিয়া করতালি দিয়া গান আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ঘা পড়িল। বাহির হইতে কে যেন চীৎকার করিতে লাগিল—“বাবুজি! দরজা খুলিয়ে!” দরজা খোলা হইল; দেখা গেল, দুটী মুটিয়া দুটী বড় বড় ‘খাঁচি’ ভরিয়া প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, আটা ঘি, তরিতরকারি ও মসলা প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছে। তাহারা ঐ সব জিনিষ রাখিয়াই চলিয়া গেল। কে পাঠাইয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল—“বাবু আওতা হ্যায়।” কিন্তু কে যে বাবু এইসব পাঠাইলেন, তাহার আর কোনই খোঁজ খবর পাওয়া গেলনা। এই প্রকার ঘটনা মনোরঞ্জন বাবুর ঘরে নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শীঘ্রই আমি ঢাকা যাইব শুনিয়া, মনোরমা আমাকে বলিলেন—“গোঁসাইকে বলিবেন, তিনি যে ভাবে রাখেন সন্তুষ্ট মনে যেন তাঁর দিকেই তাকাইয়া থাকিতে পারি, তাঁকে যেন ভুলিনা, এই শুধু আশীর্ব্বাদ করেন।” ইঁহাদের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। গুরুর প্রতি কিরূপ

বিশ্বাস ও নির্ভর দাঁড়াইলে মানুষ কচি কচি ছেলেপিলে লইয়া এই অবস্থায় এমনভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না। এঁদের সঙ্গলাভে ধন্য হইলাম।

আভিচারিক ক্রিয়ার আপদ্‌উদ্ধারার্থে শান্তি হোমের সঙ্কল্প।

ভগ্নীপতি মথুর বাবু মফস্বল হইতে আসিলেন। আমাকে বাসায় দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট
৪ঠা-৫ই অগ্রহায়ণ, হইলেন। তাঁহার মুখে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া বড়ই
শুক্রবার-শনিবার। মর্ম্মাহত হইলাম। মথুর বাবু স্কুল বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী, সরল বিশ্বাসী, এবং অকপট লোক। বৃহৎ পরিবারের তত্ত্বাবধান ও ছেলে পিলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একটী ঘনিষ্ঠা আত্মীয়াকে বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি প্রথম প্রথম আমার ভগিনীর খুব অনুগতা ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে তার আর সে ভাব রহিল না। সে ব্যতীত সংসার চলিবে না মনে করিয়া, ভগ্নীর সহিত সমান হইয়া চলিতে লাগিল; এবং প্রতিপদে ভগ্নীর সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল। অবিলম্বে ভগ্নী উহাকে সরাইয়া দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। স্ত্রীলোকটির ধারণা ছিল, ভগ্নীর অভাব হইলে সেই সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে। সুতরাং গোপনে ওস্তাদ যাদুকর দ্বারা আভিচারিক কার্য্য করাইয়া ভগ্নীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিল। এই কার্য্যের এক সপ্তাহের মধ্যেই অকারণ রক্তস্রাবে ভগ্নীর মৃত্যু হইল। কিছুদিন হয়, আমার ভাগিনেয় আসিয়া সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির আর এখন কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। ইহাতে সে ভাগিনেয়কেও নষ্ট করিতে আবার সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছে। কয়দিন হইল একদিন অতি প্রত্যুষে মথুর বাবু ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে দরজার সম্মুখেই দেখিলেন—আম্রপল্লব সংযুক্ত নারিকেল একটী পূর্ণ কুম্ভের উপরে রহিয়াছে। কুম্ভের গায়ে সিন্দূরে অঙ্কিত যন্ত্র ও দেবী মূর্ত্তি। কলসীর সম্মুখে মৃণ্ময়ভাণ্ডে কতকগুলি ছাই ও একখানা পোড়া ঝাঁটা; এবং আশে পাশে পান ও সুপারি ছড়ান রহিয়াছে। মথুর বাবু এই প্রকার দৃশ্য আমার ভগিনীর দেহত্যাগের ৫।৭ দিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলেন। সুতরাং এ সমস্ত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং অবিলম্বে আমাকে আসিতে দাদার নিকট তার করিলেন। এ সকল শুনিয়া কি করা কর্ত্তব্য, ভাবিতে লাগিলাম।

বস্তিতে ভাগিনেয় সুরেন্দ্রও পত্র দ্বারা দাদাকে এই বিষয়ের পরিচয় দিয়াছিল। দাদার মুখে শুনিয়া তখনই আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, ভাগলপুরে আসিয়া হোম চণ্ডীপাঠ দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া আপদের শান্তি করিব। মথুর বাবুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলাম।

আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে হোম করিব, স্থির করিলাম। গোময় দ্বারা একখানা ঘর সুসংস্কৃত করিয়া তাহাতে যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। বট অশ্বত্থ ও বিল্বকাষ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইল। শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আগ্রহের সহিত দিন কাটাইতে লাগিলাম।

কিন্তু মথুর বাবুর বিপদ্ শান্তির জন্য সঙ্কল্প পূর্ব্বক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা আমার উচিত কিনা, এ বিষয়ে বিচার আসিয়া পড়িল। নিজের জন্য কার্য্য কর্ম্ম করিতে ঠাকুর আমাকে নিষেধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আর্ত্ত ব্যক্তির আপদুদ্ধারের জন্য সৎসঙ্কল্পে যথাশাস্ত্র কার্য্য করিতে ঠাকুর নিষেধ করেন নাই—বরং উৎসাহই দিয়াছেন। সাংসারিক লোকে অনেকেই তো ভগবানকে একেবারে ভুলিয়া রহিয়াছে; ঠাকুরের শরণাগত না হইলে কি উপায়ে আর তাঁদের কল্যাণ হইবে? বোধ হয়, সেইজন্যই মঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগকে নানা প্রকার আপদ বিপদে ফেলিয়া তাঁকে ডাকিতে বাধ্য করেন। ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভের জন্য যদি ভগবানকে ডাকিতে হয়, তাহা হইলে অর্থ ও কামের জন্য তাঁকে ডাকিব না কেন? প্রার্থনাই যদি করিতে হইল, তাহা হইলে যে বস্তুর অভাবে আমার ক্লেশ, প্রতীকার কামনায় তাহা সমস্তই ঠাকুরকে নিবেদন করিব। মহাপুরুষদের মুখে শুনিয়াছি, যে কোন ভাবে ভগবানের নাম করিলেই কল্যাণ—"হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা।" শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে যে, শত্রুভাবেও ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া জীব উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে। তারপর দেখিতেছি, সঙ্কল্পিত কার্য্যে সুফল লাভ করিলে, বিপন্ন ব্যক্তির অন্তরে স্বতঃই সহজ শ্রদ্ধার উদয় হয়। স্বার্থ হেতু আশ্রয় লইয়াও জীব তাঁর কৃপায় পরমার্থ লাভ করে। সুতরাং আমার কোন কার্য্যে আমার ঠাকুরের প্রতি কেহ শ্রদ্ধাবান বা আকৃষ্ট হইলে, তাহাতে আমিও কৃতার্থ হইলাম মনে করি। এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম।

সর্ব্ব-আপদ-শান্তি—হোম। অপরাধীর হৃৎকম্প।

আজ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া পূর্ব্বের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর সকলেই হোম দেখিতে হল ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। আমিও নিজ আসনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে ন্যাস সমাপন করিলাম। ইতিমধ্যে ফুল-চন্দন, দূর্ব্বা তুলসী ও নৈবেদ্যাদি পূজার আয়োজন সমস্ত আসিয়া পড়িল। এক সহস্র ত্রিদল বিল্বপত্র, শ্বেত করবী, শ্বেত সর্ষপাদি আহুতির সামগ্রী সকল হোম কুণ্ডের সম্মুখে রাখিলাম। চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে মথুর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি সঙ্কল্পে পূজা হোম চণ্ডীপাঠ করিব?" তিনি কহিলেন—"আমি তো কারো কোন

অনিষ্ট করি নাই ; বিনা দোষে যে আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তারই সর্ব্বনাশ হউক।"

আমি বলিলাম—"ওরূপ সঙ্কল্প আমি করিতে পারিব না। শুধু আত্মরক্ষার জন্য 'সর্ব্ব আপদশান্তি' সঙ্কল্পে এই কার্য্য করিতে পারি।" মথুর বাবু তাহাতেই সম্মতি দিলেন। আমি 'অর্গলা স্তব' হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত চণ্ডীখানা আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। পরে, প্রকাণ্ড হোমকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহাতে ঠাকুরকে কাতর প্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলাম। তৎপরে যথাবিধি মন্ত্রপূত করিয়া সেই অগ্নিতে বিশুদ্ধ গব্যঘৃতে সহস্র বিল্বপত্র আহুতি দিলাম। শেষে আভিচারিক উপদ্রব শান্তির জন্য শ্বেত করবী প্রভৃতির দ্বারা ১০৮ বার আহুতি প্রদান করিলাম; এবং পূর্ণাহুতি দিয়া অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা এই উভয় তিথিতেই এই প্রকার হোম, চণ্ডীপাঠ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিলাম। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই দুই দিনই কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই অনিষ্টকারী স্ত্রীলোকটি বাড়ীতে থাকিতে পারিল না; পার্শ্ববর্ত্তী হরদাসবাবুর বাড়ীতে গিয়া উদয়াস্ত রহিল। কেহ কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল—"ব্রহ্মচারী কি যে কর্‌ছে বুঝিনা। কেন যে কর্‌ছে তাও জানিনা। ঐ কাজের সময়ে বাড়ীতে থাকিতে আমার কেমন যেন ভয় হয়। হোমের ধোঁয়ার গন্ধ আমি সইতে পারিনা।" এইসব শুনিয়া আমার মনে হইল, বিপদ্ উহার খুব নিকট ; সুতরাং অচিরেই ভাগলপুর ত্যাগ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। মঙ্গলময় ঠাকুর ! তোমারই ইচ্ছার জয় হউক।

হোমের ফল অব্যর্থ—অপরাধীর অদ্ভুত মৃত্যু।

শান্তি স্বস্ত্যয়নের পর আমার আর ভাগলপুরে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কলিকাতা পঁহুছিয়া কয়েকদিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাইলাম। এই সময়ে ভাগলপুর হইতে একখানা পত্র আসিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা, মথুরবাবুর বাড়ীর একটী স্ত্রীলোক অকস্মাৎ দুইদিনের কলেরায় মারা গিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে পায়খানায় যাইয়া বিকটাকৃতি অতি দীর্ঘাকার, এক ভীষণ কালপুরুষ দেখিতে পান। সে দুই হাত সাম্‌নের দিকে বাড়াইয়া "আমি তোকে নিতে এসেছি" বলিতে বলিতে উহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি 'মলাম গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া কয়েক পা ছুটিয়া আসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তৎপরেই তাঁর ভয়ানক জ্বর ও দাস্ত হইতে থাকে। দুই দিন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগের পর তৃতীয়

৭ই অগ্রহায়ণ, সোমবার।

দিনে মারা গিয়াছেন। খবরটি পাইয়া আমার বুক 'দুর্ দুর্' করিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, তবে আমিই কি উহার এই অকাল মৃত্যুর কারণ হইলাম? কিছুই ভাল লাগিল না; অস্থির হইয়া পড়িলাম।

ঠাকুরের নিকট উপস্থিতি।

বেলা অবসানে গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আমতলায় ঠাকুরকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। ঠাকুর আমাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। একটু বিশ্রামান্তর ভাণ্ডার হইতে জিনিষ লইয়া রান্না করিতে বলিলেন। আমি দক্ষিণের ঘরে যে স্থানে ছিলাম, সেই খানে আসন করিয়া লইলাম। শ্রীধর, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, যোগজীবন, জগদ্বন্ধু, বিধু ঘোষ ও অশ্বিনী প্রভৃতিকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সন্ধ্যার সময়ে ভাতে সিদ্ধভাত রান্না করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। শ্রীমন্দিরে শঙ্খধ্বনি করিয়া কুতুবুড়ী আরতি করিলেন। আরতি দর্শনের পর ঠাকুর পূবের ঘরে আসিলেন। গুরুভ্রাতারা সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমার শরীর অবসন্ন বলিয়া অধিকক্ষণ তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। নিজ আসনে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

আত্মরক্ষার চেষ্টা—ঐ মৃত্যুতে তোমার অপরাধ কি? ইঙ্গিতে কথা সুস্পষ্ট বুঝা।

প্রত্যূষে বুড়ী গঙ্গায় স্নান-তর্পণাদি সারিয়া আসনে আসিলাম। ন্যাস, প্রাণায়াম, হোম ও চণ্ডীপাঠ সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। গত ২০শে কার্ত্তিক রাস পূর্ণিমায় (চন্দ্রগ্রহণের রাত্রি হইতে) ঠাকুর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ঠাকুর মৌনী হইলেন কেন, জানিতে ইচ্ছা হইল। ঠাকুর জানাইলেন—পরমহংসজীর আদেশে মৌনী হইয়াছেন। পরমহংসজী এখন ঠাকুরকে ৬মাস মৌনী থাকিতে বলিয়াছেন শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এই ছয়মাস ঠাকুরের কথা না শুনিয়া কি প্রকারে থাকিব, ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর ১১টা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া শৌচে গেলেন। আমিও নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম। ঠাকুরের আহারান্তে বেলা প্রায় ১২॥০ টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন। প্রায়

১১ই-১৫ই অগ্রহায়ণ।

দুইঘণ্টা সময় ভাগবত পাঠ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। এই কয়মাস ভাগলপুর ও বস্তিতে কিরূপ ছিলাম ঠাকুর জানিতে চাহিলেন। আমি ভাগলপুরের দুর্ঘটনার বিবরণ বিস্তারিত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম - স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর কারণ তবে কি আমিই হইলাম? ইহাতে কি আমারই অপরাধ হইয়াছে? ঠাকুর অস্ফুটস্বরে বলিলেন—তোমার আর অপরাধ কি? তুমি ত কারো কিছু অনিষ্ট কর্‌বার জন্য কোন মন্দ উদ্দেশ্যে ওসব করনি? আত্মরক্ষার জন্য 'সর্ব্ব আপদ শান্তির' সঙ্কল্পে শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুরূপই কার্য্য করেছ। তোমার ক্রিয়ার শক্তি অমোঘ, আভিচারিক শক্তির সাধ্য কি তা পণ্ড করে? তাই ঐ শক্তি পাল্‌টে গিয়ে প্রয়োগকারীর উপরেই পড়েছে। তুমি আর তার কি কর্‌বে?

ঠাকুর আমাকে উভয় হস্তের অনামিকায় সর্ব্বদা কুশাঙ্গুরী ধারণ করিতে বলিলেন এবং উপবীত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের উপরে বামহস্ত স্থাপন পূর্ব্বক হোম করিতে বলিলেন।

এটী বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, ঠাকুর অপূর্ব্ব উপায়ে আকারে, ইঙ্গিতে ও কণ্ঠতালুর সাহায্যে একপ্রকার অতি অস্ফুটস্বরে মনের যে সকল ভাব ব্যক্ত করেন, সুস্পষ্টরূপেই আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এটী তাঁরই বিশেষ কৃপা মনে করি। কখনও কখনও ঠাকুর হাতের তালুতে, মাটীতে ও শ্লেটে লিখিয়াও যাহা প্রয়োজন জানাইয়া থাকেন। প্রশ্নের উত্তরও এই ভাবেই দিয়া থাকেন।

এবার আসিয়া ঠাকুরমাকে বড়ই কাতর দেখিতেছি। অতিশয় পীড়িতা। প্রত্যহই জ্বর হইতেছে—কাশিতেও খুব কষ্ট পাইতেছেন। ঠাকুরমা রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরেই অবস্থান করেন। একটু রাত্রি হইলেই কাশি আরম্ভ হয়। প্রায় সারারাত্রি খণ্ড খণ্ড হলুদ রংয়ের কফ্ উঠিতে থাকে। মাথা বিষম বিকৃত—অধিকাংশ সময় ক্ষিপ্তাবস্থাতেই কাটান। সমস্ত রাত্রি কখনও চীৎকার, কখনও গালাগালি কখনও বা গান করেন। নিজমনে এলোমেলো কত কি যে বকেন, কিছুই বুঝিনা। এই অবস্থায় রাত্রি যাপন করেন বটে, কিন্তু সারাদিন কোথায় যে কি অবস্থায় থাকেন, কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায়না। গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে মুসলমানদের ঘরে, কখনও বা ডোবা পুকুরের পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, দেখা যায়। কোন কোন দিন সমস্ত দিনে রাত্রেও খোঁজ পাওয়া যায় না। ঠাকুরের ঘরে রাত্রে যোগজীবন মাত্র থাকেন; ইচ্ছা হইলে শ্রীধরও মধ্যে মধ্যে ধূনি তাপিতে গিয়া বসেন। ঠাকুর এই অবস্থায় ঠাকুরমাকে লইয়া কি ভাবে রাত্রি কাটান

বুঝিতেছি না। খবর নেওয়ারও কেহ নাই। ঠাকুর আমাকে রাত্রে তাঁহার নিকটে থাকিতে বলিলেন। আমি আহারান্তে রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরের ঘরে যাই; এবং ভোর বেলা পর্য্যন্ত পাগ্‌লী ঠাকুরমার খামখেয়ালী হুকুম মত চলিয়া থাকি। সমস্ত রাত্রি ধুনি জ্বালিয়া রাখিতে হয়, রাত্রি বারোটায় ও সাড়ে তিনটায় ঠাকুর হাত মুখ ধুইতে বাহিরে গিয়া থাকেন। তখন একটী লোকের থাকা প্রয়োজন হয়।

ঠাকুরের মাথায় সর্পফণা। বিষধরের অমৃতদান। সর্পকে ঠাকুরমার শাসন।

ঠাকুরমা রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরেই থাকেন। কিন্তু আজ দুইদিন যাবৎ তিনি ঠাকুরের আসন কুটীরে রাত্রি কাটাইতেছেন। ঠাকুরমার অসুখ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাকুরমা কুটীরে প্রবেশ করিলে বাহিরে শিকল দিয়া রাখিতে হয়। দিদিমা আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত তাঁহার বিষম ঝগড়া চলিয়াছে। রাত্রি সাড়ে নয়টা হইল, ঝগড়া থামিতেছে না। কুঞ্জঘোষ মহাশয় তাঁহার বাড়ী হইতে ঠাকুরের খাবার আনিলেন, ঠাকুর হাত নাড়িয়া জানাইলেন—খাইবেন না। আমরা অনুমান করিলাম, আশ্রমে বিরোধ অশান্তির জন্যই ঠাকুর হয়ত আহার করিলেন না। আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতারা সকলেই আহারান্তে নিজ নিজ স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমাকে বিছানা করিতে বলিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং আসন কম্বল বগলে লইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমাকে আমতলায় ধুনি জ্বালিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি ঘরের ধুনি আমতলায় লইয়া গেলাম। এই দারুণ শীতে আমতলায় ঠাকুর আসন করিলেন শুনিয়া গুরুভ্রাতারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আশ্রমে ঝগড়া বিবাদই ইহার কারণ সকলে স্থির করিলেন। ঠাকুর একটু পরে সকলকে জানাইলেন—আজ ঠাকুরমার বিষম ফাঁড়া। শ্যামসুন্দর আসিয়া বলিয়া গেলেন, আজ রাত্রি টিকিলে আরও কিছুদিন থাকিবেন। ঠাকুরকে, শ্যামসুন্দর ঠাকুরমার নিকটে গাছতলায় থাকিতে বলিয়াছেন, তাই ঠাকুর আমতলায় আসিয়াছেন। শ্রীধর যোগজীবন, বিধুবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সকলকে নিষেধ করিয়া বলিলেন না, ব্রহ্মচারী এখানে থাকিবে। আমি নিজ আসন লইয়া ঠাকুরের পাশে ধুনির ধারে বসিলাম এবং পরমানন্দে নাম করিয়া কাটাইতে

১০ই অগ্রহায়ণ, শুক্লা দশমী।

লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১২ টার সময়ে ঠাকুর খাবার চাহিলেন। ঘরে যাহা রক্ষিত ছিল, আনিয়া দিলাম। রাত্রি দুইটার পরে ঠাকুরমা কি অবস্থায় আছেন, একবার খবর নিতে বলিলেন। আমি আসন কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—ঠাকুরমা সংজ্ঞাশূন্য পড়িয়া আছেন। কিছুক্ষণ ঠাকুরমার হাত পা টিপিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম, রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে একটী ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, একটী কৃষ্ণবর্ণ সর্প ঠাকুরের বাম অঙ্গ বাহিয়া মস্তকে উঠিয়া একটুক্ষণ ফণা বিস্তার করিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঙ্গ বাহিয়া আবার নামিয়া গেল। ঠাকুর আমাকে বলিলেন —*ইনি আসনের জাতসাপ। সুবিধাপেলেই আসেন। জটাবেয়ে মাথায় উঠে কপালের উপরে কিছুক্ষণ ফণাধরে থেকে চলে যান।* এই বলিয়া ঠাকুর কমণ্ডলু হাতে লইয়া জল খাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—আহা! ঐ জল খাচ্ছেন, ওতে যে এখনই সাপে মুখ দিয়া গেল।

ঠাকুর—সর্পরাজ কমণ্ডলুর জলে অমৃত দিয়া গেলেন। তুমি একটু খাবে? এই বলিয়া ঠাকুর আমার হাতে কমণ্ডলু হইতে এক গণ্ডূষ জল ঢালিয়া দিলেন। আমি পান করিয়া দেখিলাম, উহা ডাবের জলের মত মিষ্টি ও সদ্‌গন্ধযুক্ত। জলটুকু পান করিয়া চিত্তটি এতই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ভিতরে সরসভাবে আপনা আপনি নাম চলিতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন—সাপটি মার কাছেও গিয়েছিলেন। মা এবার বেঁচে গেলেন, ফাঁড়াটি কেটে গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—সাপটি জটার উপরে ফণা ধ'রে কয়বার ত ছোঁ মার্‌লে। সাপ এসে অমনভাবে আপনার গায়ে মাথায় উঠে কেন?

ঠাকুর—সরুনালে এই প্রাণায়াম স্বাভাবিক ভাবে চল্‌তে থাক্‌লে তাতে বড় সুন্দর একটী শব্দ হয়। সাপ সেই সুর শুন্‌তে বড় ভালবাসে। বাড়ীর যেখানেই সাপ থাক্ না কেন, দূর হ'তেও উহা শুন্‌তে পায়। আর তাতে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাপ এসে ঐ সুর ধর্‌তে গিয়ে, গায়ে, ঘাড়ে, মাথায় উঠে পড়ে। নাকের পাশে, কপালের উপরে ফণা বিস্তার ক'রে স্থির হ'য়ে ঐ সুর শুন্‌তে থাকে। সময়ে সময়ে নিজের শিস্‌ও ওতে মিলায়ে দিয়ে বড়ই আনন্দ পায়। মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে, তা কিছুই অস্বাভাবিক নয়! ওভাবে সাধন চল্‌লে তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠ্‌তে পারে। এই সাপে কখনও

অনিষ্ট করে না, বরং এদের দ্বারা বিস্তর সাহায্যই পাওয়া যায়। এরা ছোঁ মারে না, শিস্ ফেলে। প্রাণায়াম বন্ধ হ'লেই আবার চ'লে যায়।

আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা প্রত্যক্ষ করিলাম; মৌন ও মগ্নাবস্থায় থাকিলেও আজ তাঁর শ্রীমুখের দু'চারটী কথা শুনিলাম। সর্প বিষধর—তার মুখেও অমৃত! ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে কখনও বিশ্বাস করিতাম না। যাহা স্বাভাবিক, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অভাবে তাহাও অদ্ভুত, আশ্চর্য্য বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

ভোর বেলা ঠাকুরমা ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন—তোর আসনের সাপ রাত্রে ভারী *বিরক্ত করেছে। কাছে এসে ফণা ধ'রে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল। যেতে বলি যায় না। তখন এক চড় বসিয়ে দিলাম;* অমনি চলিয়া গেল। ঠাকুরমার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম।

কেহ গুরুনিষ্ঠা নষ্ট করিলে প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী এবার কাশীতে মাণিকতলার মাতাজীর সঙ্গে খুব ঝগড়া ক'রে এসেছে।" কিরূপ ঝগড়া, কেন ঝগড়া, ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলিলাম—মাতাজীর অসাধারণ অবস্থা—দিনরাত সমাধিস্থ থাকেন। অনেক নূতন নূতন তত্ত্বের কথা বলেন শুনিয়া, তাঁকে দেখিতে কৌতূহল জন্মিল। আমি আমার দুটী বন্ধুকে লইয়া মাতাজীর দর্শনে গেলাম। গিয়া শুনিলাম মাতাজী সমাধিস্থ। প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসিয়া রহিলাম। পরে একপ্রকার ক্লেশসূচক শব্দ করিতে করিতে মাতাজী চৈতন্য লাভ করিলেন। খবর বা পরিচয় কেহ না দিতেই মাতাজী আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম। পরে তিনি আমাদের সংসারের কথা তুলিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরে আলাপে আমার বিরক্তি ধরিল। আমি মাতাজীকে বলিলাম—এসব কথা বলিতে বা শুনিতে তো আমি আপনার নিকটে আসি নাই। তিনি তখন ধর্ম্মের উপদেশ আরম্ভ করিলেন। প্রথম উপদেশই—"ধর্ম্মের বেশভূষা ত্যাগ কর।" নীলকণ্ঠবেশ, মালাতিলকাদি আমার গুরুদেবের আদেশ মতই আমি ধারণ করিয়াছি—তাঁকে বলা সত্বেও তিনি আমাকে উহা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। এসব ধর্ম্মের বেশ কিছু না, এতে কোন উপকারই হয় না, বরং অভিমান হয়—অনিষ্ট হয়; এইরূপ বারংবারই বলিতে লাগিলেন। আমার

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর ১৮৯২।

গুরুদত্ত বস্তুর উপরে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন দেখিয়া, আমি তখন আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। যাহা মুখে আসিল বলিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি বলিলেন—"আমি যে তোর মা, ছেলে হয়ে মাকে এরূপ বল্‌তে হয়?" আমি বলিলাম—আমার মা'র মত হতে আপনার বহু বিলম্ব। মুখে ছেলে বল্‌লেই মা হওয়া যায় না। তিনি কহিলেন—"তোর গুরু 'বিজলি' যে আমাকে মা বলে।"

আমি—তিনি শিয়াল, কুকুর, বিড়ালকেও মা ব'লে স্তব স্তুতি করেন; কিন্তু আমরা তাদের শিয়াল কুকুরই বলি। মাতাজীকে আমি এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া খুবই কড়া কড়া অনেক কথা বলিয়াছিলাম। কি করিব? শেষ কালে তিনি বলিলেন—"ওরে! আমি তোকে পরীক্ষা করিতে এসব কথা বলিয়াছি।" আমি কহিলাম—আপনার স্পর্দ্ধা ও সাহস তো কম নয়? সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্রকে আপনি পরীক্ষা করিতে আসেন? আপনার ওজন কতটুকু, আপনি তা ভাবেন না?

ঠাকুর বলিলেন—সকলের নিকটেই বিনয়ী হবে। সকলকেই খুব শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌বে। তবে তুমি যা ব'লেছ; মাতাজীর সে সব শুনা প্রয়োজন ছিল। ভগবানই তোমার ভিতর দিয়ে ওসব বলেছেন। গুরুদত্ত বস্তুর উপরে, সাধন ভজনের উপরে কেহ অবজ্ঞা কর্‌লে, মালা তিলক নিয়ে কেহ টানাটানি কর্‌লে, গুরুনিষ্ঠা কেহ নষ্ট কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, সে স্থলে বজ্রের ন্যায় কঠোর হতে হয়, তার প্রতিবিধান কর্‌তে হয়। আর তা' নৈলে ব্যবহারে সর্ব্বদাই পুষ্পের মত কোমল হ'বে—এই ঋষি-বাক্য।

শ্রীধরের গুরুনিষ্ঠা। তাহার অমানুষিক কাণ্ড—ব্রহ্মচারীকে শাসন। কুকুরের বমি ভক্ষণ।

ঠাকুরের নিকটে কিছুক্ষণ থাকিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম। শ্রীধর আমাকে বলিলেন—ভাই ব্রহ্মচারী! তুমি ত মাতাজীর সঙ্গে ভদ্রভাবে ঝগড়া করেছ! আমি ভাই, চাষা-ভুষা মানুষ; রাগ হ'লে অত সভ্য ভদ্র ভাষা মুখে আসে না। এবার বারদির ব্রহ্মচারীকে চাঁছা-ছোলা যা-তা ব'লে গালাগালি ক'রে এসেছি।

আমি—কেন, কি জন্য? কি হ'য়েছিল?

শ্রীধর বলিলেন—আরে ভাই! এবার কি কুক্ষণেই তাঁর নিকটে গিয়াছিলাম।



শ্রীশ্রীবারদির ব্রহ্মচারী

(গোস্বামী প্রভুর খুল্ল পিতামহ)

সেখানে সারাদিন আমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। বিকালে ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়া বস্‌তাম। তিনি আমাকে খুব আদর কর্‌তেন। একদিন বাড়ীভরা লোক, তিনি আমাকে বল্‌লেন—"আরে তুই এতকাল গোঁসাইএর কাছে থেকে কি লাভ ক'রেছিস্? যে নিজে অন্ধ, সে কি করে অন্যকে পথ দেখাবে? অন্ধ গুরুর সঙ্গ ছেড়ে দে। ছ'মাস তুই আমার নিকটে থাক্। তোকে আমি ব্রহ্মজ্ঞান দিব, আর উর্দ্ধরেতা ক'রে দিব।" আগেই আমার মাথাটা সেদিন একটু কেমন কেমন ছিল। তার উপরে ব্রহ্মচারীর কথা শুনে গায়ে যেন আগুন লেগে গেল, আমি সপ্তমে চড়ে গেলাম। আর ঠিক্ থাকৃতে পার্‌লাম না। চীৎকার ক'রে এক লাফে তাঁর দরজার সাম্‌নে গিয়া পড়্‌লাম। চীৎকারের উপরে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলাম—"ওরে শালা ব্রহ্মচারী! শালার ব্যাটা শালা ব্রহ্মচারী! তুমি না মহাপুরুষ? আমার গুরুকে ব'ল্‌ছ অন্ধ? তিনি কিছু পারেন না? তুমি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবে? উর্দ্ধরেতা করে দিবে? আরে শালা! এই ত্যাখ্ তোর মত কত ব্রহ্মচারী আমার এক এক গাছা চুলে ঝুল্‌ছে।" এইরূপ যা তা বল্‌তে বল্‌তে বহির্ব্বাস লেংটী সব খুলে ব্রহ্মচারীর গায়ে ছুঁড়ে মার্‌লাম। ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ আসনথেকে উঠে দুহাতে আমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন; আর বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ঠিক্ বলেছিস্, ঠিক্ বলেছিস্। তোর অবস্থা দেখে আজ আমি বড় আনন্দ পেলাম। ঠাণ্ডা হ।" এই সময়ে একটা কুকুর ব্রহ্মচারীর দরজার কাছে বমি কর্‌ছিল। ব্রহ্মচারী আমাকে বল্‌লেন—"আচ্ছা, তোর না ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে? ঐগুলি খা দেখি?" আমি অমনি বমিগুলি খেতে লাগলাম। তখন ব্রহ্মচারী আমাকে আদর ক'রে আসনের নিকটে বসিয়ে, ভজ্‌লেরামকে খাবার দিতে বল্‌লেন। ভজ্‌লেরাম একথালা উৎকৃষ্ট খাবার নিয়া এলো। ব্রহ্মচারী বল্‌লেন—"আয়! তুইও খা, আমিও খাই। আজ আমি তোর সঙ্গে খাব। তোরই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। গুরুনিষ্ঠা জন্মালে কি আর কিছু বাকী থাকে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাই, তোমার কুকুরের বমি খাওয়ার কথা তো এখন সকলের কাছেই শুন্‌তে পাই। আচ্ছা, বমি গুলো তুমি কি ক'রে খেলে? শ্রীধর বলিলেন—"আরে রাম! বমি কি কেউ খেতে পারে? আমি দেখ্‌লাম চমৎকার ক্ষীরমাখা চিঁড়ে, খাবার সময়েও ঠিক্ সেই রকমই স্বাদ পেলাম। এসব কি গোঁসাইর কৃপা ভিন্ন কখনও হয়?" শ্রীধরের মুখে এই সব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। ধন্য গুরুদেব! সর্ব্বত্র তোমার পদাশ্রিতগণের জয় জয়কার হউক্!

ব্রহ্মদৈত্যের মালাচুরি। উঠানে মালা প্রাপ্তি—বড়ই আশ্চর্য্য

২০শে—২৫শে অগ্রহায়ণ। এবার গেণ্ডারিয়া আসিয়া অবধি মধ্যাহ্নে ঠাকুরের পায়খানা ও স্নানের জল আমিই দিয়া আসিতেছি। আজও পায়খানার জল দিয়া স্নানের জল তুলিতে লাগিলাম। ঠাকুর পায়খানায় গেলেন। দুই তিন মিনিট পরেই ঠাকুর পায়খানা হইতে হঠাৎ আসিয়া আমার হাতে প্রবালের মালা ছড়া দিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন—*মালাছড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। কতকগুলি নিয়েও গিয়েছে।*

আমি—আপনার মালা আবার কে ছিঁড়ে নিল?

ঠাকুর উপরদিকে হাত তুলিয়া কি দেখাইলেন—বুঝিলাম না। ইঙ্গিতে বলিলেন—**রুদ্রাক্ষের তাগাও একবার নিয়েছিল।** তখন বুঝিলাম—এবারও সেই ব্রহ্মদৈত্যেরই কাজ। ঠাকুর আবার পায়খানায় গেলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম—বোধ হয় জটায় লাগিয়া হঠাৎ সরুমালা গাছটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর অনুমানে ব্রহ্মদৈত্যের কথা বলিতেছেন। খোঁজ করিলে বাকিগুলি হয় ত পায়খানায়ই পাইব। ঠাকুর পায়খানা হইতে আসিলেন। পরে বলিলাম—অবশিষ্ট মালাগুলি বোধ হয় পায়খানায়ই আছে, একবার দেখব? ঠাকুর ইঙ্গিতে বলিলেন—**হাঁ, হাঁ, তা দেখ্‌তে পার। দু একটী পেতেও পার। আর সব নিয়ে গেছে।** আমি পায়খানায় অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটীমাত্র পাইলাম। ঠাকুরের কথামত মালাগুলি গণিয়া দিদিমার হাতে দিলাম। পাছে কেহ উহা ঠাকুরের নিকটে চাহিয়া নেয়, এই আশঙ্কায় দিদিমা তৎক্ষণাৎ উহা কোঠা ঘরে সিন্ধুকের ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

আজ ৪।৫ দিন হইল ঠাকুরের গলার মালা ব্রহ্মদৈত্য ছিঁড়িয়া নিয়া গিয়াছে। আজ মধ্যাহ্নে স্নানান্তে বেলা প্রায় ১২টার সময়ে ঠাকুর, ঘরে আসিবার সময়ে উঠানের ঠিক্ মধ্যস্থলে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন; এবং মাটির উপরে পায়ের খড়ম দিয়া পুনঃ পুনঃ ঠোকর দিতে দিতে ইঙ্গিতে বলিলেন—**এইখানে সেদিন ব্রহ্মদৈত্য মালাগুলি এনে রেখে গেছে। খুঁড়্‌লে পাবে।** আমি অমনি স্থানটি চিহ্নিত করিয়া কাটারি আনিতে গেলাম। ঠাকুর, ঘরে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের কথা শুনাতে সকলেরই উহা দেখিতে কৌতূহল জন্মিল। আমি মাটি খুঁড়িতে লাগিলাম। অত্যন্ত শক্ত মাটি, পাঁচ ছয় মিনিটে আট নয় ইঞ্চি খোঁড়ার পর দেখিলাম,

একটী স্থানে প্রবালের সমস্ত গুলি দানা জড় করা রহিয়াছে। যে মাটির মধ্যে মালাগুলি পাইলাম, তাহা আল্‌গা মাটি নয়, দস্তুর মত নীরেট্‌ শক্ত। তথাপি দিদিমার হাতে সেদিন যে মালাগুলি দিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দেখা গেল, দিদিমার সিন্দুকের ভিতরে দানাগুলি ঠিকই আছে। মিনিটে মিনিটে যে উঠানের উপর দিয়া লোকের নিয়ত গতায়াত, চারিখানা ঘরের মধ্যবর্ত্তী খোলামেলা সেই উঠানে কঠিন মাটির এত নীচে কি প্রকারে মালা আসিল, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। চার পাঁচ দিন মাত্র পূর্ব্বে ব্রহ্মদৈত্য মালা রাখিয়া গিয়াছে; অথচ এত শক্ত মাটির ভিতরে কি করিয়া মালা রহিয়াছে, ইহা আরও আশ্চর্য্য। অবিশ্বাসী মন! ঠাকুরকে আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস-ভক্তি এক বিন্দুও যে বেশী হইতেছে, এমন মনে হয় না। প্রত্যক্ষের উপরেও বিশ্বাস জিনিসটি নির্ভর করে না, ইহাই পরিষ্কার বুঝিতেছি। মাটিতে পোঁতা মালাগুলিও দিদিমার হাতে আনিয়া দিলাম; মাত্র পাঁচটী প্রবালের দানা, রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের সঙ্গে গাঁথিয়া ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের নিকটে রাখিলাম। ঠাকুর অতঃপর আর প্রবাল ধারণ করিবেন না জানাইলেন।

স্বপ্ন—ঠাকুরের ক্রোড়ে নীল কাক। শক্তি সঞ্চারে অবস্থা— পাদস্পর্শে দেহ অমৃতময়।

আজ শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠের পর, ঠাকুর আমাকে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি তো প্রায়ই সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখ। এখান থেকে গিয়ে কিছু দেখেছিলে?

আমি—কয়েকটী বড় সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। বস্তিতে একদিন দেখ্‌লাম—বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া গেণ্ডারিয়া গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটী সাধু আমাকে বলিলেন—

২৭শে অগ্রহায়ণ, রবিবার।

"ভাই এ বুদ্ধি কেন? অনর্থক কেন কাশীতে বৃন্দাবনে ঘুরিয়া মর? গেণ্ডারিয়াই থাক না কেন? যেখানে গুরু, সেখানেই ত সকল তীর্থ!" আমি বলিলাম—শুধু অনুমানে তো আর তৃপ্তি হয় না? প্রত্যক্ষরূপে জানা চাই। সমস্ত তীর্থেই একটা স্থান-মাহাত্ম্য আছে। গেণ্ডারিয়ায় সে প্রকার কিছু আছে কি? আর ঠাকুর যে আমার সর্ব্বশক্তিমান্‌ সদ্‌গুরু ভগবান্‌, তাহাও তো অনুমানেই বলি; প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো কিছু পাই নাই। সাধু বলিলেন—আচ্ছা, তুমি ভূমির দিকে

দৃষ্টি করে করে তোমার ঠাকুরের নিকটে যাও না ? আমি তাঁর কথা মত গেণ্ডারিয়ার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার নিকটে চলিলাম। চাহিয়া দেখি, অতি সুন্দর, পরিষ্কার নীল জ্যোতির বুদ্‌বুদ্ মাটির সর্ব্বত্র ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অসংখ্য তারার মত বিন্দু বিন্দু জ্যোতির্বিম্ব ভূমির উপরে ফাটিয়া নীল জ্যোতিঃ বিকিরণপূর্ব্বক মিলিয়া যাইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমকে সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হইল। আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, আপনি এই ঘরে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়া আছেন। আমি আপনার পাশে নিজ আসনে বসিলাম। আপনি মাথা তুলিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে এক একবার আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একটী কাক উড়িয়া আসিয়া আপনার নিকটে পড়িল। আপনি কাকটিকে তুলিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে কাকটি উজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া গেল। আপনি তখন উহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া, উহার পশ্চাৎভাগে ফুৎকার প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে আপনার ভিতরের যে সমস্ত ভাব ও অবস্থা, পাখীর ভিতরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, পাখী সুমধুর ধ্বনিতে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। একটু পরে আপনি পাখীটিকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—**এবার ঠিক হ'য়েছে। যথা ইচ্ছা চ'লে যাও।** পাখীটি তখন দুইতিন ফুট দূরে থাকিয়া আপনার পানেই চাহিয়া রহিল। আপনি আমাকে বলিলেন—**একখানা সংবাদপত্র সাম্‌নের বেড়ায় টাঙ্গাইয়া দেও তো।** আমি বড় একখানা খবরের কাগজ বেড়ার গায়ে লাগাইয়া ধরিয়া রহিলাম। আপনি ঐ কাগজের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেতপূর্ব্বক পাখীটিকে বলিতে লাগিলেন—**ঐ ত্যাখ্ ব্রহ্মা! ঐ ত্যাখ্ বিষ্ণু! ঐ ত্যাখ্ শিব! ঐ ত্যাখ্ কালী! ঐ ত্যাখ্ দুর্গা!** আপনি এইপ্রকার 'ঐ ত্যাখ্' 'ঐ ত্যাখ' বলিয়া অসংখ্য দেবদেবীর নাম করিতে লাগিলেন। পাখীও আপনার বলামাত্র ঐসকল দেবদেবী দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। পাখীর এই অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া উঠিয়াও নিজকে জাগ্রত কি নিদ্রিত, কিছুক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন স্বপ্নের দৃশ্যটি চক্ষে লাগিয়া রহিল। স্বপ্নটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া খুব আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—**বড়ই চমৎকার স্বপ্ন, লিখে রেখো!**

দ্বিতীয় স্বপ্ন। গুরুভ্রাতারা সকলে আপনাকে লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শত শত মৃদঙ্গ করতাল একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোকের উচ্চ সংকীর্ত্তন ও হুঙ্কার গর্জ্জনে চারিদিক যেন কাঁপিতে লাগিল। আপনি কীর্ত্তনের মধ্যে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আপনাকে দেখিয়া সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িল। প্রমত্ত অবস্থায় আপনাকে ধরিতে গিয়া, গুরুভ্রাতারা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠের মত নীরস প্রাণে সংকীর্ত্তনের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম; এবং নিজের দুরবস্থা ভাবিয়া, হা হুতাশ করিতে লাগিলাম। সকলকেই মহাভাবে বিহ্বল দেখিয়া, নিজের উপরে ধিক্কার আসিল। আমার মত ঘৃণিত জঘন্য আর কেহ নাই বুঝিয়া, কাঁদিতে লাগিলাম। নিরুপায় হইয়া তখন নিতাই! নিতাই! পতিতপাবন নিতাই! কোথা হে? বলিয়া কাতরভাবে ডাকিতে লাগিলাম। আমার কাতরধ্বনি আপনার কানে গেল। আপনি তখনই উন্মত্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিলেন, এবং দুহাতে আমাকে উর্দ্ধদিকে তুলিয়া, সজোরে মাটিতে আছাড় মারিলেন। আমার হাড়গোড় সব ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। আপনি তখন উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে আমার সেই চূর্ণ বিচূর্ণ শরীরের উপরে উঠিয়া পড়িলেন; এবং এক বার ডান পায়ে একবার বাম পায়ে ঘন ঘন ভর দিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গে বারংবার মাড়াইতে লাগিলেন। আমার শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে পিচ্ পিচ্ করিয়া সাবানের জলের মত সাদা সাদা ফেনা উঠিতে লাগিল। আপনি তখন উহা গণ্ডূষে গণ্ডূষে তুলিয়া লইয়া, অমৃত অমৃত বলিয়া চারিদিকে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দ ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। সেই ক্রন্দন রোল শুনিতে শুনিতে আমি জাগিয়া উঠিলাম। এই স্বপ্নটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অবনত মস্তকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সেই কান্নার স্মৃতি অন্তরে রাখিতে এই স্বপ্নটি লিখিয়া রাখিলাম।

৩য় স্বপ্ন। তিন চার দিন হয় দেখিলাম—গুরুভ্রাতারা অনেকে এই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আপনার সঙ্গে রাত্রি যাপন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ নিজ আসন পাতিয়া বসিলেন। স্থানাভাব, আমি কোথায় যাইব ভাবিয়া আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আপনি আমার আপাদ মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—**তোমার স্থান আমার পায়ের নীচে। কারো কথায় তুমি এস্থান ছেড়ে কখনও অন্যত্র যেও না।** এই সময় ঠাকুরমার প্রয়োজনে হাতে তালি দিয়া আপনি আমাকে জাগাইলেন। এসব স্বপ্ন কি সত্য? এসব স্বপ্নের

তাৎপর্য্য কি? ঠাকুর ইঙ্গিতে বলিলেন—তা বল্‌তে নেই। লিখে রাখ্‌তে হয়—পরে বুঝ্‌বে।

আরো কতকগুলি স্বপ্ন ঠাকুরকে শুনাইলাম, তাহা আর প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইল না।

ঠাকুরমার সেবা।

ঠাকুরমাকে লইয়া আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। দিন দিন তাঁর উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইতেছে। জ্বরও নিয়ত লাগিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে বিষম কাশি আরম্ভ হয়। সর্ব্বাঙ্গে গাঁঠে গাঁঠে অসহ্য বেদনা। সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। পরিবারস্থ বা পাড়ার কেহ ভয়ে ঠাকুরমার নিকট ঘেসেন না। যোগজীবন তো কোন কালেও সেবা করিতে পারেন না। রোগী দেখিলেই সেস্থান ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়েন। শ্রীধর বাতজ্বরে প্রায়ই শয্যাগত। ঠাকুর মৌন থাকিয়াও ঠাকুরমাকে নিজের ঘরে রাখিয়া এত উৎপাত অত্যাচার প্রতি রাত্রিতে কি প্রকারে যে সহ্য করেন, বুঝিতেছি না। কিছুকাল যাবৎ ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে ঠাকুরমার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে ঘণ্টা দুই কাল বিশ্রাম করিয়া, আসন লইয়া ঠাকুরের ঘরে যাই। ঠাকুরের অপরিসীম কৃপায় প্রফুল্ল চিত্তে ঠাকুরমার সেবায় সারারাত্রি কাটাই। রাত্রি নয়টার পর ঠাকুরমার জ্বর কাশি ও বেদনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় সমস্ত রাত্রি তৈল ও পুরাণো ঘৃত গায়ে পায়ে মাথায় মালিশ করিতে হয়। ঠাকুরমা কখন চীৎকার, কখন গালাগালি, কখন বা গান করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন। সমস্ত রাত্রি ধুনি জ্বলে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেক দিতে হয়। আদার রস ও মধু তিন চার বার খাইয়া থাকেন। বায়ু বৃদ্ধি হইলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা রকম খেয়ালের হুকুম হইয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন না করিলে রক্ষা নাই, চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন। ঐ সময়ে বেগতিক দেখিলে পলাইয়া যাই। বারান্দায় গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকি। হলুদের রংয়ের খণ্ড খণ্ড কফ্ তুলিয়া ঘরের সর্ব্বত্র ফেলিতে থাকেন। রাত্রে দুতিনবার উহা পরিষ্কার করিতে হয়। রাত্রি শেষ না হইতেই "রান্না কর্‌তে যা" বলিয়া, ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন। যোগাড় যন্ত্র করিয়া ডাল তরকারি ও গরম গরম ভাত, সূর্য্য উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। দু তিন জনার মত রান্না না হইলে নিস্তার নাই। পছন্দ মত রান্না না হইলে, "এ কি? তোর বাপের মাথা রেঁধেছিস্?"—

৩০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার।

বলিয়া গালাগালি করেন। ভোর হইলেই ঠাকুরমা আহার করিতে বসেন। পাড়ার মেয়েরা তখন আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুরমা আহার করিতে করিতে সকলকে প্রসাদ দিতে থাকেন। শীতের সময়ে গরম গরম প্রসাদ পাইয়া, তাঁহারা সকলেই খুব পরিতোষ লাভ করেন। ঠাকুরমার আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার অন্যত্র যাওয়ার উপায় থাকে না। ঠাকুরমার দেহে ঠাকুর স্বয়ং অবস্থান করিয়া আমার সেবা গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাবটি নিয়ত আমার ভিতরে জাগিতেছে বলিয়াই স্থির আছি। আমার এই ভাব যে সত্য, ঠাকুরও তাহা দয়া করিয়া আশ্চর্য্য প্রকারে আমাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দেন। ঠাকুরের কৃপা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া এই সেবাতে উৎসাহ আনন্দ ক্রমশঃ আমার বৃদ্ধিই পাইতেছে। সারাদিনান্তে একবার একপাক আহার করি বলিয়া ঠাকুরমা আমার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত। অনেক সময়ই আমাকে ধমক্ দিয়া বলেন—"যেমন পেট ভ'রে খাস্ না, ভাল জিনিস খাস্ না, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিস্, মৃত্যুকালে মহাপ্রাণী তোর মুখে লাথি মেরে চলে যাবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, সারাদিন উপস ক'রে থাকিস্? আমার ছেলের অকল্যাণ হ'বে। যাঃ! আশ্রম থেকে চলে যা!" এইরূপ বলিয়া প্রায়ই আমাকে তাড়া দিয়া থাকেন। ঠাকুরমার গালি সময় সময় কিন্তু বড় মিষ্টি লাগে। মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কখন কখন আশীর্ব্বাদও করিয়া থাকেন।

দিদিমার সহিত ঠাকুরমার অপূর্ব্ব ঝগড়া—তখনই আদর।

দিদিমার সঙ্গে ঠাকুরমার 'সাপ আর বেজী' সম্বন্ধ। দিদিমাকে দেখিলেই ঠাকুরমা যা তা একটা কথা তুলিয়া ঝগড়া জুড়িয়া দেন। "মেয়ে মরেছে, এখন আর এখানে আছ কেন? জামাইয়ের সঙ্গে এখন আর কি সম্পর্ক? এখন আর এখানে তোমার অত গিন্নিপনা খাট্‌বে না; আমার ছেলেকে আমি আবার বিয়ে করাব।" দিদিমা কাযকর্ম্মে এঘর সেঘর করিতে থাকেন, ঠাকুরমাও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ সব কথা বলিতে বলিতে ঘুরিতে থাকেন। পরে, যখন ঝগ্‌ড়া বেশ জমিয়া উঠে, দিদিমার সঙ্গে আর পারিয়া উঠেন না, তখন একটু সরিয়া গিয়া, কাণে আঙ্গুল দিয়া চোখ্ বুজিয়া বসিয়া থাকেন। দিদিমার বলা শেষ হইলে, অমনি গিয়া আবার দুচার কথা শুনাইয়া দিয়া আসেন। পুনঃ পুনঃ এরূপ করায় দিদিমা আরও রাগিয়া যান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিদিমার আহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুরমা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়েন। পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, দধি, ক্ষীর, মিষ্টি, কলা

সংগ্রহ করিয়া আনেন ; এবং দিদিমার আহারের সময়ে সে সকল দিয়া খুব আদর করিয়া বলেন—"বেয়ান্! ঝগ্‌ড়ার সময়ে ঝগ্‌ড়া, তা খাবার সঙ্গে কি? নাও, এই সব বেশ ক'রে খাও। আহা! তোমার দুঃখ ক্লেশ কে বুঝ্‌বে? থাক্‌তেও তোমার কেউ নাই। আমি পাগল মানুষ—আমার কথা তুমি গ্রাহ্য করো না।" ইত্যাদি—

নীলকণ্ঠ বেশের মর্য্যাদা।

আজ বেলা ১০টার সময়ে নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে ঘর হইতে বাহির হইলাম। ঠাকুরমা আমাকে দূর হইতে দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন ; এবং একগাছা ঝাটা হাতে লইয়া "ছেলে হয়ে বাপের রূপ! দুর্গা পিছু পিছু চলেন! বের হ, বের হ, আশ্রম থেকে বের হ, আজ তোকে ঝাটা মেরে তাড়াবো" বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিতে লাগিলেন। আমি বেগতিক দেখিয়া দৌড় মারিলাম। পরে এবাড়ী ওবাড়ী ছুটাছুটি করিয়া ঠাকুরমার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুরমা যে বলেন তা কি ঠিক্, না পাগলামী? "ছেলে হয়ে বাপের রূপ, দুর্গা পিছু পিছু চলেন, আশ্রম থেকে বের হ" ব'লে আজ আমাকে তাড়া করেছেন।

ঠাকুর—মা যথার্থ ই বলেছেন। ভগবতী তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেন।

আমি—কেন? কোন দোষ পেলে ঘাড় মট্‌কাতে?

ঠাকুর—না, নীলকণ্ঠ বেশের মর্য্যাদা দিতে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। মাকে স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম। আহা! ঋষি-মুনি বন্দিতা, সর্ব্বশক্তির নিয়ন্ত্রী ভগবতী যোগমায়া, দয়া করিয়া এই দুরাচারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরেন! ইহা মনে হওয়ায়, প্রাণের অবস্থা যে কি রূপ হইল বলিতে পারি না। মায়ের অপূর্ব্ব চরিত শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ব্যতীত উদয়াস্তে মাকে একবারও স্মরণ করি না, তবু মায়ের কত দয়া!

ঠাকুরমার অনাচার অত্যাচারের কথা লইয়া কোথাও আলোচনা হইলে, ঠাকুরমা তথায় গিয়া স্থির ভাবে তাহা শুনেন ; এবং তাহাদের নিকটে নিজেরই দোষের কথা বলিয়া নিজকে গালাগালি করিতে থাকেন। সকলে শুনিয়া অবাক্! নিন্দা-প্রশংসা যে ঠাকুরমার ভিতরে কিছু স্পর্শ করে, এরূপ অনুমানও করা যায় না। পাগ্‌লামী বাদ দিলে, ঠাকুরমার মধুর প্রকৃতি লোকালয়ে যথার্থই দুর্লভ। মহা অপরাধীরও ক্লেশ দেখিলে অস্থির হন। অদ্ভুত সহানুভূতিই তাঁর জীবনের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব!

বিবিধ চক্রদর্শন, তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় ত্রিভঙ্গাকৃতি—শালগ্রাম পূজার আদেশ।

১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার।

কিছুদিন যাবৎ আহারান্তে ঠাকুর আমতলাতেই বসিতেছেন। আসনের সম্মুখে ধুনি জ্বালিয়া দেই। প্রায় সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত আমতলা নির্জ্জন থাকে। এই সময়ে আমি একঘণ্টা কাল ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া থাকি। পরে স্বাভাবিক প্রাণায়ামের সহিত নাম করি, ইহাতে বড়ই আরাম পাই। কিছুকাল যাবৎ নাম করার সময়ে বিবিধ প্রকার চক্র দর্শন হইতেছে। এই সকল চক্র বা যন্ত্র, শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোক রেখা দ্বারা চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ কখন বা দ্বাদশ কোণাঙ্কিতও দেখিতে পাই। এই সকলের মধ্যস্থল কালো, তাহাতে সময়ে সময়ে এক প্রকার অদ্ভুত জ্যোতি পলকের জন্য বিকাশ পাইয়া, তন্মুহূর্ত্তেই আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়। বোধ হয়, এসব চক্র বা যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে দৃষ্টি স্থির হইলে, এই অস্পষ্ট চঞ্চল জ্যোতিটিও স্বরূপ আয়তনে নিশ্চঞ্চল দৃষ্ট হইবে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**প্রত্যেক চক্রেরই মধ্যে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী অবস্থান করেন।** এই জ্যোতির অভ্যন্তরেই দেবদেবী প্রকাশিত হইবেন মনে হইতেছে। এই সব কল্পনাতীত চির-অজ্ঞাত অশ্রুতপূর্ব্ব বস্তু যখন এভাবে আপনা আপনিই অকস্মাৎ প্রকাশিত হইতেছে, তখন আর চেষ্টা দ্বারা মূল অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? যাহা হইবার, ঠাকুরের কৃপায়ই হইবে।

নাম করিতে করিতে চক্ষে পড়িল—ঠাকুরের মস্তকোপরি কিঞ্চিদূর্দ্ধে শূন্যমার্গে নীলাভ কাল-চক্র বেষ্টিত অনুপম ওঁকার মূর্ত্তি। তাহার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুত্রয় হইতে উজ্জ্বল শুভ্র-চ্ছটা তির্য্যগ্‌ভাবে সংযুক্ত হইয়া, একটী মনোহর ত্রিভঙ্গাকৃতি গঠিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে উহা আকাশে মিলাইয়া গেল। পুনরায় উহা দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করা মাত্র ঐ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—একি দর্শন করিলাম? এরূপ দর্শন করিলাম কেন?

ঠাকুর ইঙ্গিতে অস্ফুট স্বরে কহিলেন—**তুমি শালগ্রাম পূজা করো, বিশেষ উপকার পাবে।** আমি শুনিয়াই অবাক্! ভাবিলাম—একি হ'ল? এ নূতন কর্ম্মভোগ আবার কেন?

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—শালগ্রাম পূজা করিতে বলিলেন, উহা কি প্রকারে করিব ?

ঠাকুর বলিলেন—**শাস্ত্রব্যবস্থানুরূপ শালগ্রাম পূজা কর্‌বে।**

আমি কহিলাম—ভগবানের দ্বিভুজ, মুরলীধর, চতুর্ভুজ অথবা অষ্টভুজরূপ আমি ভাবিতে পারিব না। ওসকলে আমার কোন আকর্ষণ নাই, আমি ভগবানের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, শালগ্রামে বা যে কোন স্থানে তাহারই ধ্যান করিতে পারি।

ঠাকুর—**তুমি তাহাই ক'রো** বলিয়া, শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে কয়েকটী শ্লোক আমাকে পড়িতে বলিলেন এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের ন্যাস সমাপনান্তে শালগ্রামের পূজা যে ভাবে করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। শ্লোক কয়টির অনুবাদ যথা :—

(৪৭) যে ব্যক্তি সহসা আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি বেদ বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধির সমন্বয় করিয়া তদনুসারে কেশবের পরিচর্য্যা করিবেন।

(৪৮) আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহা হইতে আগমার্থ অবগত হইয়া স্বীয় অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষের অর্চ্চনা করিবে।

(৪৯) শুদ্ধচিত্ত হইয়া মূর্ত্তিবিশেষের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি দ্বারা স্বীয় দেহ সংশোধন করত ন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবে।

(৫০) অর্চ্চনার পূর্ব্বে যথালব্ধ উপচার সহকারে যন্ত্রাদি শোধন দ্বারা পুষ্পাদি দ্রব্য, সম্মার্জ্জনাদি দ্বারা ভূমি, অব্যগ্রতা দ্বারা আত্মা, অনুলেপনাদি দ্বারা স্বীয় শরীরকে অর্চ্চনা কার্য্যের যোগ্য করিয়া, আসনে জল প্রোক্ষণ করিবে।

(৫১) পাদ্যাদি কল্পনা পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করত সমাহিত চিত্তে অঙ্গন্যাস করন্যাস সহকারে মূল মন্ত্রযোগে অর্চ্চনা করিবে।

(৫২) সাঙ্গোপাঙ্গ ও পার্ষদ সহিত অভিমত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় মন্ত্রদ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্রভূষণ,—

(৫৩) গন্ধ, মাল্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নানা উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করত বিধিবৎ স্তব করিয়া হরিকে নমস্কার করিবে।

(৫৪) আপনাকে তন্ময়রূপে ধ্যান করত হরির মূর্ত্তি পূজা করিবে। পরে মস্তকে নির্ম্মাল্য সৎকার পূর্ব্বক দেবতার মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করত পূজা সমাপন করিবে।

(৫৫) যে ব্যক্তি এইরূপ তান্ত্রিক কর্ম্মযোগানুসারে অগ্নি, সূর্য্য, জল, অতিথি অথবা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তিনি অচিরাৎ মুক্তিলাভ করেন।

তাপিবার জন্য ধুনি নয়। ধুনি নির্ব্বাণ।

৩রা—৪ঠা পৌষ পর্য্যন্ত।

ঠাকুর রাত্রি ৩টার সময় একবার বাহিরে যান। ধুনির ধারে কলসী ভরিয়া জল রাখিয়া দেই। ঐ জল গরম হইয়া থাকে, ঠাকুরকে হাত মুখ ধুইতে দেওয়া হয়। আজ ঠাকুরমার অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায়, রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত তাঁকে লইয়া ব্যস্ত রহিলাম! বুক বেদনা ও অবসন্নতা বেশী বোধ হইতে লাগিল। ধুনির পাশে আমি শয়ন করিলাম। শ্রীধরও আসিয়া ধুনির পাশে বসিলেন। রাত্রি ৩টার সময়ে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। শোওয়া অবস্থায়ই ঠাকুরের খড়মজোড়া ঠাকুরের আসনের ধারে রাখিয়া দিলাম। শ্রীধরকে এক ঘটি জল কলসী হইতে ভরিয়া দিতে বলিলাম। শ্রীধর আমার কথা গ্রাহ্যই করিল না। ঠাকুরও শ্রীধরের নিকটে ইঙ্গিতে জল চাহিলেন। শ্রীধর একবার কলসীর মুখে ঘটিটি ঠেকাইয়াই সামান্য জল ঢালিয়া দিয়া আবার ধুনি তাপিতে লাগিলেন। ঠাকুর হাতে ঘটি না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীধরের মাথা গরম হইলেও ঠাকুরের কার্য্যে এরূপ অগ্রাহ্যভাব আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি খুব বিরক্তির সহিত শ্রীধরকে বলিলাম—স'রে বসে ধুনি তাপ, ভজন কর। এসব বাজে কাজ তোমার নয়। তারপর নিজেই অগত্যা ঘটিতে জল ভরিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর জল ঘটি হাতে লইয়া অমনি জলসুদ্ধ ধুনিতে ঢালিয়া দিলেন, ধুনি নির্ব্বাপিত হইল। আর এক ঘটি জল দিলাম, ঠাকুর তাহা লইয়া বাহিরে গেলেন। আমার মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম, বুঝি শ্রীধরের উপরে বিরক্ত হইয়া অথবা আমারই ব্যবহারে কষ্ট পাইয়া ঠাকুর ধুনিতে জল ঢালিলেন। ঠাকুর ঘরে আসিয়া বলিলেন—**সে সময়ে একটী মহাত্মা আমার নিকটে দাঁড়ায়ে বল্‌লেন—'তাপ্‌বার জন্য এখানে ধুনি রাখা ঠিক নয়। ধুনি নির্ব্বাণ কর।' ঐ কথা শুনেই আমি ধুনিতে জল ঢেলে দিলাম। পূর্ব্বেও একবার আমাকে ওরূপ বলেছিলেন—কিন্তু খেয়াল ছিল না। এখন ধুনির কুণ্ডটি ভেঙ্গে ফেল।** ঠাকুরের কথামত তৎক্ষণাৎ কুণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।

ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃষ্ট—চিম্‌টা, কমণ্ডলু, ত্রিশূল ধারণের অধিকার।

মধ্যাহ্নে আর আর দিনের মত ঠাকুরের আসনের সম্মুখে আমতলায় ধুনি জ্বালিয়া দিলাম। ভাগবত পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধু সন্ন্যাসীরা আসনের সাম্‌নে ধুনি রাখেন কেন? গাঁজা, চরস ও তামাক খাওয়ার সুবিধার জন্য এবং শীতে ঠাণ্ডা না লাগে এই উদ্দেশ্যেই সাধুরা আগুন রাখেন মনে করিয়াছিলাম। গতরাত্রে যাহা বলিলেন, তাহাতে তো বুঝিলাম, ধুনি রাখার অন্য তাৎপর্য্য আছে। কি জন্য সাধুরা ধুনি রাখেন?

ঠাকুর অস্পষ্টস্বরে কখনও বা লিখিয়া বলিলেন—ধূনির সাধন আছে। অগ্নিই ইষ্টনাম, এইরূপ ধ্যান রেখে, কাম-ক্রোধাদি ইন্ধন তাহাতে আহুতি দেন। ধূনির অগ্নির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্‌তে কর্‌তে, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অগ্নির তেজ বৃদ্ধি কর্‌তে থাকেন; আর কুন্দী সকল কখনও কাম কখনও ক্রোধ ইত্যাদি কল্পনা করে নাম অগ্নি দ্বারা তা দগ্ধ করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওরকম এক একটী কুন্দী ভস্ম না হয়, আসন ছাড়েন না—অবিশ্রান্ত নাম করেন। এক একটী কুন্দী এই ভাবে দগ্ধ কর্ত্তে পার্‌লে, তাঁদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। স্পর্দ্ধা ক'রে একে অন্যকে বলেন 'হাম দুমণ কুন্দী ফুক্ দিয়া,' কেহ বলেন—'হাম তিন মন ভসম্ কিয়া।' শুধু অগ্নিতাপার উদ্দেশ্যে সাধুদের ধুনি নয়। ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃষ্ট।

আমি—সাধুরা যে চিম্‌টা, কমণ্ডলু, ত্রিশূল ধারণ করেন, তাহারও কি সাধন আছে? ধুনি খুচিবার জন্য চিমটা, জল খাওয়ার জন্য কমণ্ডলু এবং হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ত্রিশূল—এইই ত মনে করি।

ঠাকুর—সাধুদের এ সমস্তই এক একটা পরীক্ষা পাশ করে গ্রহণ কর্ত্তে হয়। জিহ্বা সংযত হলে চিমটা ধারণের অধিকার হয়। চিমটা ধারণ করে প্রথমেই বাক্‌সংযত করতে হয়। কমণ্ডলু ধারণেরও অধিকার আছে। কমণ্ডলু ভ'রে নির্ম্মল ঠাণ্ডা জল সম্মুখে রেখে সাধক তার শীতলতা, স্থিরতা ও সাম্যভাবের সহিত মনের যোগ রেখে ভগবানের নাম কর্‌বেন। তাঁর অন্তর সর্ব্বদাই শীতল জলের মত ঠাণ্ডা থাক্‌বে, কিছুতেই উত্তপ্ত হবে না। আর চিত্ত সর্ব্বদা

অবিকৃত ও সাম্যভাবে পূর্ণ থাকবে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ যাঁর করায়ত্ত—তিনিই মাত্র ত্রিশূলধারণের যথার্থ অধিকারী।

স্বপ্ন—ঠাকুরের ছিন্ন জটা লইয়া ক্রন্দন।

অধিক রাত্রে ঠাকুরমার অসুখ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দুবার তাঁকে পায়খানায় নিতে হইল। পুরাণো ঘৃত মালিশ করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। শরীর আমার বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। ঠাকুরমাকে সেক দিবার জন্য ঘরে যে অগ্নিরাখা হইত, উহা সম্মুখে রাখিয়া ঠাকুরের চরণতলে শয়ন করিলাম। ঠাকুর যেন আমাকে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছেন, এইভাবে অভিভূত থাকিয়া নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি প্রায় তিনটার সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া পড়িলাম। কি দেখিলাম, ঠাকুর জানিতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম—সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। আপনি মাথার তিনটী মাত্র জটা রাখিয়া অবশিষ্ট ছাঁটিয়া ফেলিলেন। আমি উহা নিত্য পূজা করিব মনে করিয়া তুলিয়া লইলাম। এই সময়ে কুঞ্জ ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার নিকটে ঐ জটা চাহিলেন। আমি তাঁকে একটী দিলাম। জটা স্পর্শ করিয়া আমাদের যে কি হইল বলিতে পারি না। জটার দিকে তাকাইয়া আমাদের হু হু শব্দে কান্না আসিয়া পড়িল। একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে একবার ভিতরে যাইতে লাগিলাম, আবার বাহিরে আসিতে লাগিলাম, আর উচ্চৈঃস্বরে আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে লাগিলাম—"আমার জানি কি হ'ল গো! গৌরাঙ্গ বলিতে নয়ন ঝরে।" এই সময়ে হাতে তালি দিয়া আপনি আমাকে জাগাইলেন। ঠাকুর স্বপ্ন শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, কিছুই বলিলেন না।

গোয়ালিনীর ঘোলদান। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলেই তো সর্ব্বনাশ।

ন্যাস করার পর ঠাকুরের আদেশমত আমি হোমাগ্নিতেই পূজা করিয়া থাকি। পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে ও বিধিমত পূজা করিতে বড়ই আরাম পাই। আজ একটী ভাল বেল পাইলাম। পানা করিয়া উহা পূজার সময়ে ভোগে লাগাইতে ইচ্ছা হইল। ঘোল দিয়া বেলের পানা ঠাকুর ভালবাসেন। কিন্তু ঘোল কোথায় পাইব, ভাবিতে লাগিলাম। একটু পরেই একটী গোয়ালিনী "দধি নেবে গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি অমনি ছুটিয়া গোয়ালিনীকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোল আছে?" গোয়ালিনী বলিল

"কতটা চাই ?" আমি বলিলাম—"আধসের"। আমার নিকটে গোয়ালিনী পাত্র চাহিল। পাত্র নিতে আসিয়া আমার মনে হইল, পয়সা নাই। তখন গোয়ালিনীকে বলিলাম "না গো, ঘোল নিবনা। আমার পয়সা নাই।" গোয়ালিনী চলিয়া গেল। ২।৩ মিনিট ঘুরিয়া গোয়ালিনী আবার কি ভাবিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—"গোঁসাই পাত্র দিন, আপনার নিকট হইতে আমি পয়সা নিবনা, যত ঘোল ইচ্ছা আপনি নিন্।" আমি একটু দ্বিধা করিতেই গোয়ালিনী বলিল—"আপনি এ ঘোল না নিলে সমস্ত ঘোল আমি এখনই ফেলিয়া দিব।" আমি অগত্যা পাত্র দিলাম। প্রায় দেড়সের ঘোল গোয়ালিনী সন্তুষ্ট মনে দিল। আমি ভাবিলাম, মনে যাহা ইচ্ছা হইয়াছিল, ঠিক ঠাকুর তাহাই জুটাইয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের এই কৃপার দান আমি আগ্রহের সহিত গ্রহণ না করিয়া অগ্রাহ্য করিলে গুরুতর অপরাধী হইব। আমি প্রচুর পরিমাণে বেলের পানা প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলাম। প্রসাদ পাইয়া সকলেই খুব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

ঠাকুর আমাকে অনুশাসন করিয়া বলিয়াছিলেন—**ব্রহ্মচারী! প্রার্থনা কর্‌লেই কিন্তু তাহা মঞ্জুর হবে! সাবধান!** সেই হইতে ভাল-মন্দ কোন প্রার্থনাই আমি করি না। কিন্তু, এখন দেখিতেছি প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা হইলেই ঠাকুর তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। প্রার্থনা করি আর নাই করি তাহার অপেক্ষাও রাখেন না। ইহাতে একদিকে আমার যেমন আনন্দ হইতেছে, অপর দিকে তেমনই উদ্বেগও আসিতেছে। মনটি ত সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ। নিত্য নূতন বিষয় লাভেই মনের আনন্দ। ঠাকুর যদি আমাকে এই আনন্দ দিতে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় মাত্রই জুটাইয়া দেন, তাহা হইলে আর সর্ব্বনাশের বাকি কি থাকিবে ? দিন দিন পরমার্থ ভুলিয়া বিষয়েই ত জড়াইয়া পড়িব। মঙ্গলময় ঠাকুর! তুমি কিসে কি কর, তোমার অভিপ্রায় কি—কিছুই বুঝিনা। এখন মনে হইতেছে তোমারই ইচ্ছা, তোমারই হাত সর্ব্বত্র—এটী পরিষ্কার দেখিলেই নিশ্চিন্ত। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনা কামনার নিবৃত্তি নাই, পরম শান্তি লাভেরও আর অন্য উপায় নাই।

মানসপূজা—ঠাকুরের সহানুভূতি। ঠাকুরের খেলা। উপদেশ—অর্থে অনর্থ। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এক।

পূজাতে আজ বেশ আনন্দ লাভ করিলাম। ঠাকুরের নিকট ভাগবত পাঠের সময়ে কান্না সম্বরণ করিতে পারিলাম না। থামিয়া থামিয়া পাঠ সমাপন করিলাম। নামে বড়ই

সুন্দর ভাব আসিল। নাম ফাঁকা অক্ষর নয়। নাম সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বীজ। শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এই নামের উপাসনা করিলে, ইচ্ছানুরূপ নামকে যে কোন রূপে, গুণে, আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। আমি নামকে তুলসী চন্দন পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া, ঠাকুরের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ অর্পণ করিতে লাগিলাম। খুব তেজের সহিত নাম করিতে করিতে ঠাকুরকে ঐরূপে সচন্দন তুলসী দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ, এক একবার চম্‌কিয়া উঠিয়া আমার দিকে আড়ে আড়ে মধুর দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন; এবং ঈষৎ হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া, আমার আনন্দ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে আমার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। আহারান্তে সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে নিজ আসনে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুরকে আজ বড়ই প্রফুল্ল দেখিলাম। আসন ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি নানা প্রকার অভিনয় করিতে লাগিলেন। লাঠি ভর দিয়া খোঁড়া বুড়ার মত চলিতে আরম্ভ করিলেন! একটু পরে লাঠি রাখিয়া আসনে বসিলেন; পরে কচি খোকার মত সমস্ত ঘরে হামা দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন; এক একবার হাত পাতিয়া খাবার চাহিলেন। নানা প্রকার ইঙ্গিত করিয়া শিশুটির মত কত আবদারই জানাইতে লাগিলেন! ঠাকুরের এই সব শিশুর মত নৃত্য করা ও খেলা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর আসনে বসিলেন। পরে কথায় কথায় গোয়ালিনীর ঘোল দেওয়ার কথা তাঁহাকে জানাইলাম। শুনিয়া ঠাকুর অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—অর্থ সঞ্চয় না কর্‌লে **অভাব কখনও হবে না। ভগবান্‌ই সমস্ত চালিয়ে নেবেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থ সঞ্চয় তো দূরের কথা—স্পর্শও কর্‌তে নাই। যদি এ রকম কর্‌তে পার, তা হলে অভাব কখনও ভোগ কর্‌বে না। যখন যা আবশ্যক, অনায়াসে আপনা আপনি জুটে যাবে। অর্থসঞ্চয় থাক্‌লে, ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না। অর্থে একেবারে বেঁধে ফেলে, ধ্যান ধারণার সময়েও অর্থ চিন্তা হয়। ইহাতে একেবারে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। হাতে যা আস্‌বে তৎক্ষণাৎ তা ব্যয় ক'রে ফেল্‌বে। তা হলেই উপর হতে আবার পাবে। যা পাবে তা এম্‌নি দুহাতে বিলায়ে দেবে, তা হলেই অজস্র আস্‌ছে দেখ্‌তে পাবে। অর্থ হাতে থাক্‌তে ভগবানে নির্ভর হয় না। পঞ্চাশটী টাকায় তোমাকে বেঁধে রেখেছে। প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও গরীব দুঃখীকে দিয়ে উহা ব্যয় ক'রে ফেল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থ সঞ্চয় নিষেধ।** ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—**খৃষ্ট ও কৃষ্ণ এক।**

একটুকুও ভিন্ন নন। যাঁদের নিকটে এই তত্ত্ব প্রকাশ হয় নাই, তাঁরাই ভেদ বুদ্ধিতে দেখেন। বস্তুতঃ একই বস্তু, দুই নয়। খ্রীষ্টের ক্রশ, কৃষ্ণের চূড়া ও মহাদেবের ত্রিশূল এই তিনে ওঁকার হয়েছে।

সেবাভিমানে নরক ভোগ।

ঠাকুরমার সেবায় আনন্দ-উৎসাহে কিছুকাল কাটাইলাম। কিন্তু এখন ভয় হয়, পাছে সেবাপরাধে পড়িয়া যাই। গতরাত্রে দশটার সময়ে ঠাকুরমা একবার পায়খানায় গেলেন। রাত্রি ৩টার সময়ে দারুণ শীতে তাঁহাকে আবার পায়খানায় নিতে হইল। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, চলিতে পারেন না। বাতের বিষম বেদনা, সমস্ত রাত্রি ঘৃত মালিশ করিয়া কখন বা সেক দিয়া কাটাইতে হইল। সেক দেওয়ার জন্য অগ্নি জ্বালিতে অকস্মাৎ একটী স্ফুলিঙ্গ গিয়া ঠাকুরমার পায়ে পড়িল। ঠাকুরমা অম্‌নি "পুড়িয়ে মার্‌ল, পুড়িয়ে মার্‌ল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে উঃ উঃ করিয়া ক্লেশসূচক শব্দ প্রকাশ করিলেন। আমার প্রাণটি কাঁপিয়া উঠিল। অগ্নিকণা কিন্তু গায়ে লাগা মাত্রই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তথাপি ঠাকুরমার অস্বাভাবিক চীৎকার! মনে বড়ই দুঃখ হইল। আমি আর সেক দিব না স্থির করিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মহেন্দ্র বাবু আবার সেক দেওয়ার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—দরকার নেই। আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, ঠাকুর আমার ভিতরের ভাব বুঝিয়াই বুঝি নিবৃত্ত করিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত অনুগত হইয়া সেবা করিলে তাহাতে জীবনের যে মহৎ কল্যাণ অতি সহজে সাধিত হয়, সাধন ভজন তপস্যাতে বহুকালেও তাহা হওয়া দুষ্কর। অভিমান নষ্ট করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাব প্রাণে আনাই সেবার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি তো দেখিতেছি, সেবায় দিন দিন আমার অভিমান বৃদ্ধিই হইতেছে। আশঙ্কা হয়, রন্তিদেবের মত আমার সেবার পরিণাম অধোগতি না হয়। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন যে, রন্তিদেব যৌবনে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া, বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রতিদিন বিবিধ উপচারে রাজভোগে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। এক দিবস দুর্ব্বাসা ঋষি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ভোজন করিতে চাহিলেন। রাজা তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া, ভোজন করাইতে বসাইলেন। ঋষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনান্তে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন একগাছা চুল অন্নের ভিতরে দেখিয়া ঋষি পাত্রত্যাগ করিলেন, এবং

৬ই পৌষ, মঙ্গলবার।

ক্রুদ্ধ হইয়া রন্তিদেবকে বলিলেন—"প্রত্যহ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া অভিমান হইয়াছে! ব্রাহ্মণ, কি ভোজন করেন একবার দেখ না—এতই অশ্রদ্ধা ও অমনোযোগিতা! নরকস্থ হও!" যে সেবাতে জীবের অভিমান নাশহেতু পরম পদ লাভ হয়, সেই সেবাতেই রন্তিদেবের অভিমান বৃদ্ধি হেতু নরক ভোগ করিতে হইল। ঠাকুর পরম দয়াল, সেবাপরাধ কখনও গ্রহণ করেন না, তাই রক্ষা। না হলে কি দুর্গতিই না হইত!

ভোরবেলা আহারান্তে ঠাকুরমা খুব আদর করিয়া আমাকে বলিলেন—"তোমাকে অনেক সময় কত কি বলি। তাতে তুমি কিছু মনে ক'রো না। জানইতো, রোগে রোগে আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে!" ঠাকুরমার স্নেহপূর্ণ বাক্যে আমার প্রাণ আবার সরস হইয়া উঠিল।

ঠাকুর সদাশিব—সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখা।
ধুনির বিভূতির অদ্ভুত গুণ—সূক্ষ্মরূপ দর্শনের উপায়।

ঠাকুরমার আহারান্তে বেলা ৮টার সময়ে স্নান করিলাম। পরে দূর্ব্বা, চন্দন, তুলসী ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া আসনে বসিলাম। ন্যাস হোম, পূজা ও পাঠ সমাপন করিতে বেলা প্রায় ২টা বাজিল। তৎপরে ভাগবত লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর আজ সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া আমতলায় বসিয়া আছেন—সম্মুখে ধুনি জ্বলিতেছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুরকে ভস্মমাখা দেখিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সে কথা দিদিমাকে বলিয়াছিলাম। ভাগবত শেষ করিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আমার সাক্ষাৎ সদাশিব, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কোটি কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল ঐশ্বর্য্য-রাশি, বিভূতিরূপে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে লোমকূপ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, মনে হইতে লাগিল। আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, উহা গঙ্গাজল বিল্বপত্র ধ্যানে ঠাকুরের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতে লাগিলাম। আনন্দে এতই অশ্রুপাত হইতে লাগিল যে, ঠাকুরের দিকে বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না। একান্ত মনে দেহাভ্যন্তরে, মণিপুরে ঠাকুরকে বসাইয়া, প্রাণের সাধে পূজা করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে আড় নয়নে ক্ষণে ক্ষণে আমার পানে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কি আনন্দে যে এই কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তাহা আর প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

৭ই পৌষ, বুধবার।

রান্না করিতে যাওয়ার সময়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধুরা গায়ে ভস্ম মাখেন কেন ?

ঠাকুর—ধুনিতে সাধুরা হোম করেন। প্রসাদ জ্ঞানে বিভূতি নিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখেন, ঐ ভাবেই অভিভূত থাকেন। গায়ে ভাল করিয়া ভস্ম মাখিলে লোমকূপ সমস্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদলে শরীরের উত্তাপ সমান থাকে, তাতে কোন অসুখ হয় না। পাহাড় পর্ব্বতে এমন গাছ আছে, যার ভস্ম গায়ে মাখ্‌লে সাধুদের চোখে দেখা যায় না। সচ্ছন্দে হিংস্র জন্তুর মধ্যেও চলা ফেরা করেন।

আমি—মানুষ কাছে থাক্‌লে চোখে দেখা যাবে না, একি কখনও হয় ?

ঠাকুর—হবে না কেন ? খুব হয়। বস্তুর প্রতিবিম্ব চক্ষে পড়্‌লেই তো তা দেখ্‌তে পাবে। ঐ ভস্ম গায়ে মাখ্‌লে চক্ষু তার প্রতিবিম্ব গ্রহণ কর্‌তে পারে না। সকল বস্তুরই কি প্রতিবিম্ব মানুষের চক্ষে পড়ে ? প্রেতের রূপ কি দেখিতে পাও ? অথচ কুকুর তা দেখে। অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুকুর সময়ে সময়ে লাফিয়ে উঠে, জন প্রাণী শূন্য স্থানেও দৌড়িয়ে গিয়ে কুকুর চীৎকার কর্‌তে থাকে। এ সব লক্ষ্য করে দেখেছ ?

আমি—আমাদের চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কি ঐরূপ হ'তে পারে না ?

ঠাকুর—হাঁ, খুব পারে। ছ'টি মাস অবাধে সন্ধ্যা থেকে ভোর বেলা পর্য্যন্ত আলো না দেখে' যদি জেগে থাক্‌তে পার, তা হ'লে চোখ ক্রমে এমন হ'বে যে সূক্ষ্ম শরীর অনায়াসে দেখ্‌তে পাবে। প্রণালী মত দৃষ্টি সাধনেও হয়।

ঠাকুরের কথা বুঝিলাম। কিন্তু স্থূলবস্তু চক্ষের সাম্‌নে থাকিলে তাহা দেখা যাবে না, ইহা যে বড়ই বিস্ময়কর! ধারণায় আসিল না। ঠাকুরের কথায় একটু দ্বিধা জন্মিল। মনে মনে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে লাগিলাম। অবশ্য বায়ু, বস্তু হইলেও, তাহার রূপ আমরা দেখিতে পাই না; এবং নিরাধারে অতি স্বচ্ছ জলেরও রূপ পরিষ্কাররূপে চক্ষে পড়ে না; কিন্তু স্থূলবস্তু চক্ষের সম্মুখে, অথচ দেখিতে পাই না, এই প্রকার দৃষ্টান্ত তো অনুসন্ধানে পাইতেছি না। ঠাকুরের দয়ায় এই সময়ে চণ্ডীর একটী শ্লোক মনে আসিল—দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥ কোন

প্রাণী দিনে দেখিতে পায় না—রাত্রে দেখে; কেহ দিনে দেখে, রাত্রিতে দেখিতে পায় না। আবার কোন কোন প্রাণী, দিনে ও রাত্রে একই প্রকার দেখে। মনে হইল, যদিও সমস্ত জীবের দর্শন ক্রিয়া একমাত্র চক্ষুদ্বারাই নিষ্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবান এমনই উপাদানে ও অদ্ভুত কৌশলে এই চক্ষু গঠিত করিয়াছেন যে, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকেও কারো কারো দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অবরোধ করে, দিবালোকের রূপও তাহাদের চক্ষে পড়ে না। আবার কোন কোন প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি আলো বা অন্ধকারের কোন অপেক্ষাই রাখে না, দিনে রাত্রে একই প্রকার দেখে। আলো বা অন্ধকারের রূপ আমাদের মত তাহাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে না। এই সকল দৃষ্টান্ত যখন রহিয়াছে তখন বস্তু বিশেষের প্রতিবিম্ব আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এই প্রকার যুক্তিতে মনটিকে প্রবোধ দিয়া ঠাকুরের কথায় দ্বিধাশূন্য হইলাম।

ঠাকুরকে বলিলাম—কাঠের এমন গুণ যে তার ভস্ম ক'রে গায়ে মাখ্‌লে দেখা যাবে না, এ কখনও শুনি নাই।

ঠাকুর—শুন্‌বে কি? দর্শন-বিজ্ঞানে কতটুকু পেয়েছে—কতটুকু জানে? এই দেখ, এই কাঠ বহু পুরাণো হ'য়ে যখন ঘুন্ ঘুনে হয়, এর মধ্যে এক প্রকার কীট জন্মে। কাঠ খানা ফুট ফুট বিন্দু বিন্দু ছিদ্রযুক্ত ঝাঁঝ্‌রির মত হ'য়ে যায়। ঐ কাঠ আগুনে দিলে যেমন দপ্ দপ্ জ্বল্‌তে থাকে, কাঠের ভিতর থেকে ঐ কীটগুলি বে'র হ'য়ে অগ্নি খেতে আরম্ভ করে। সে রকম কাঠ পেলে দেখাবো। নিজেও পেলে, পরখ্ ক'রে দেখো। অগ্নিভুক্ জীবও আছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে কি তা স্বীকার করে?

ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে করিলাম—এ কাঠও তেমন দুর্ল্লভ নয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

গুরুসেবার অন্তরায়। গুরুভ্রাতাদের সহিত ঝগড়া।

১১ই পৌষ, ২৫ ডিসম্বর, ১৮৯২।

দেখিতেছি, গুরুর সেবায় যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের দুর্ভোগের সীমা নাই। গুরু শিষ্যদের সাধারণ সম্পত্তি, গুরুর নিকটে শিষ্যেরা সকলেই সমান, এই ভাব সকলেরই অন্তরে বদ্ধমূল। কিন্তু কেহ গুরুর সেবায় থাকিলে, গুরুর একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হইলে, অবশিষ্ট গুরুভ্রাতারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ঈর্ষ্যাযুক্ত

হন। তাঁহারা ঐ সেবক গুরুভ্রাতার সামান্য একটু ক্রটী পাইলেই, তাহাতে নানারূপ রং চং দিয়া গুরুর নিকটে লাগান। গুরু উহার উপরে একটু বিরক্তিভাব দেখাইলেই যেন তাহারা কৃতার্থ হন। রাত্রি জাগরণ ও অপরিমিত পরিশ্রমাদিতে আমার শরীর দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতেছে। গতকল্য বেদনার জন্য সন্ধ্যার সময়েই শুইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠাকুরমার সেবা ঠিকমত করিতে পারি নাই। ঠাকুর আমাকে কয়েকদিন বাড়ীতে গিয়া মার নিকটে থাকিতে বলিয়াছেন। শীঘ্রই আমি বাড়ী যাইব স্থির করিয়াছি। আমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, বাড়ী যাইব, শুনিয়া কয়েকটী গুরুভ্রাতা ঠাকুরের কাছেই আমাকে বলিলেন—"মশাই! ব্রহ্মচর্য্য করেন, আপনার আবার অসুখ হয় কেন? ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌লে কখনও কি অসুখ হতে পারে? ঠিকভাবে চল্‌তে না পারেন ব্রহ্মচর্য্য ছেড়ে দিন্ না? আমাদেরই মত থাকুন। এতে যে ঠাকুরের কলঙ্ক হয়।" গুরুভ্রাতাদের অনর্থক গায়ে পড়িয়া এরূপ আক্রমণে বড়ই কষ্ট হইল। ভাবিলাম, একবারে আসল সারকথা খোলাখুলি শুনিয়ে দিয়ে, আজ এমনভাবে উহাদের মুখবন্ধ করিয়া দেই, যেন আমার বিরুদ্ধে ঠাকুরের নিকটে আর কখনও কেহ এভাবের কিছু না বলেন। এইরূপ ভাবিয়া আমি কহিলাম—ঠাকুর যদি আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়া তাহাতে অটল রাখিতে পারেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য দিন, ঠাকুরের সঙ্গে স্পষ্টতঃ এই সর্ত্তেই আমি এ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিয়াছি। ব্রতভঙ্গ যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রটী স্বয়ং ঠাকুরেরই হইয়াছে, অতএব এজন্য তাঁকেই শাসন করুন। আমার কথা শুনিয়া, এই সময়ে ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে আমার দিকে চাহিয়া, আমার কথায় সায় দিয়া, মাথা নাড়িতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা আমাকে আবার বলিলেন—সকালবেলা আপনি এমন সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি তু'লে গাছের শোভা নষ্ট করেন কেন? ওতে কি গাছের কষ্ট হয় না?

আমি বলিলাম—আমোদের জন্য তুল্‌লে গাছের যথার্থই কষ্ট হতো। কিন্তু ঠাকুরের চরণে দিবার জন্য তুলি—এতে গাছের আনন্দই হয়। ফুল তুল্‌তে গাছের নিকটে গিয়া দাঁড়ালেই মনে হয়, তাদের তুলে নিয়া ঠাকুরের চরণে দেই, এই আকাঙ্ক্ষায় আমার পানে তারা যেন আগ্রহের সহিত চেয়ে আছে! যে সব ফুল তুলি না, মনে হয়, সেগুলি নিরাশ হ'য়ে দুঃখ করে। একটী গুরুভ্রাতা বলিলেন—"মশায়! ও সব ভাবের কথা ছেড়ে দিন। হিংসাদ্বারা কি পূজা হয়?"

আমি—হিংসা কার্য্যে নয়, হিংসা ভাবে। ফুল তোলার কথা কি বলছেন? হিংসাশূন্য

হয়ে, অনায়াসে আনন্দের সহিত কাঁচা মাথা কেটে, ঠাকুরের চরণে দিতে পারি, যদি জানি তিনি ওতে আনন্দ পাবেন। ঠাকুর ফুল পেয়ে আনন্দলাভ করবেন, বৃক্ষও কৃতার্থ হবে, ফুল তুল্‌বার সময়ে আমার মনে এই ভাবই থাকে। ফুল, দূর্ব্বা তুলসীদ্বারা পূজা করা, এ ঋষিদেরই ব্যবস্থা, আমাদের সৃষ্টি নয়। গুরুভ্রাতাদের সহিত এই সব আলোচনার সময়ে ঠাকুর ধ্যানস্থ রহিলেন।

শালগ্রামের জন্য আক্ষেপ

ঠাকুর আমাকে 'লক্ষণযুক্ত' শালগ্রাম পূজা করিতে বলিয়াছেন। এই শালগ্রাম কোথা হইতে কি প্রকারে সংগ্রহ করিব, বুঝিতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছেন, অযোধ্যাতে এক একটী মন্দিরে সহস্র সহস্র শালগ্রাম আছেন। চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে। দাদাকে আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র এ পর্য্যন্ত পান নাই। ঠাকুরের আদেশের পর হইতে, দিন দিন আমার শালগ্রাম পূজার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফুল-চন্দনাদি দ্বারা অগ্নিতে পূজা করিয়া এখন আর তৃপ্তি হয় না। ফুল, চন্দন, তুলসী বিল্বপত্র দিয়া সাক্ষাৎ ভাবে যে ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করিব—সে সৌভাগ্য বোধ হয় কখনও আমার হইবে না। ঠাকুর স্বয়ংই তাহাতে বাধা দিবেন। অথচ তাঁহার আদেশমত তাঁহার অভিন্ন-স্বরূপ সুলক্ষণযুক্ত সুশ্রী শালগ্রাম শিলা, নিজ মনে স্বাধীনভাবে পূজা করিয়া কবে কৃতার্থ হইতে পারিব, জানি না! কবে ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে সুন্দর শিলা জুটাইয়া দিবেন?

ঠাকুরের পূজা। পাইতে চাও—না দিতে চাও?

আজ বেলা প্রায় দশটার সময়ে একটী শ্রদ্ধাবান্ গুরুভ্রাতা পূবের ঘরে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া পূজা করিতে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন; হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া তাঁহার পানে চাহিলেন। ভাগ্যবান্ গুরুভ্রাতাটি তখন পুষ্প, চন্দন, তুলসী লইয়া সাগ্রহে ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আমি ভাবিলাম—এ সুযোগ আর ছাড়ি কেন? আমি অবিলম্বে তুলসী, দূর্ব্বা, পুষ্পাদি লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং ঠাকুরের বামপার্শ্বে কাতরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার কান্না পাইল; ভাবিলাম, এমন কি পুণ্য করিয়াছি, যে আজ ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করিব! ঠাকুর এই সময়ে সস্নেহে আমার দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—

কি? পূজা কর্‌বে? বেশ, কর। যদি কিছু পেতে চাও, চরণে দেও; আর, আমাকে যদি কিছু দিতে চাও, আমার মাথায় দেও। এই বলিয়া মাথাটি একটু বাড়াইয়া দিলেন। মনে হইল–ঠাকুরের নিকটে আর কি চাহিব? যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ভগবানের ভাণ্ডারে আর নাই, যাহা অতুলনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মনোরম, দয়াময় ঠাকুর তাহা তো নিজেই আমাকে দিয়াছেন। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি প্রভু আমার, আজ আমা হইতে কিছু পাইতে মাথা বাড়াইয়াছেন—হায়! হায়! দীনহীন অধম আমি, আমার এমন কি আছে, যে তাঁহাকে দিব? মনে মনে প্রার্থনা আসিল—"ঠাকুর! জন্মজন্মান্তরে যদি আমার কখন কিছু সুকৃতি থাকে, তাহা এবং তোমার সঙ্গলাভে ও সাধন ভজন বা সেবা পূজায় যা কিছু ফল দিয়াছ ও দিবে, তাহা সমস্তই আমি তোমাকে এই প্রদান করিলাম; দয়া করিয়া গ্রহণ কর।" এই বলিয়া হস্তস্থিত পুষ্পাঞ্জলি বক্ষে ধরিয়া ঠাকুরের মস্তকে অর্পণ করিলাম। পরে ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর স্নেহ-স্নিগ্ধ, সুমধুর স্নেহদৃষ্টিতে দুএকবার আমার দিকে চাহিয়া চোখ্ বুজিলেন। জয় গুরুদেব!

ভোগের পূর্ব্বে প্রসাদ। মেজদাদার সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

১৪ই পৌষ হইতে ১৭ই পৌষ।

মেজদাদা ঢাকা আসিয়াছেন, অন্য বাড়ী যাইবেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন। আমি ভোর বেলা ঠাকুরমার জন্য রান্না করিয়া প্রস্তুত রহিলাম। মেজদাদা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আশ্রমে আসিলেন। ঠাকুরকে পূবেরঘরে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিলেন। এই সময়ে ঠাকুরের চা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মেজদাদাকেও চা দিতে বলিলেন। মেজদাদা ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া চা পান করিবেন প্রত্যাশায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর নিজের চা নিবেদন করিয়া, পান করিতে ছোট বাটিতে লইয়া যেমন উহা মুখের সাম্‌নে তুলিলেন, মেজদাদা অমনি প্রসাদের জন্য নিজ বাটিটি ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন, ঠাকুর তন্মুহূর্ত্তেই উহা মুখে না দিয়া মেজদাদাকে ঢালিয়া দিলেন। মেজদাদা একটু অপ্রস্তুত হইয়া সলজ্জভাবে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর মেজদাদাকে চা পান করিতে বলিলেন, এবং কথায় কথায় কহিলেন—বোম্বাই ছাপা একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ আনিয়া পড়িবেন। মেজদাদা চলিয়া গেলেন, পরে ঠাকুর কহিলেন—

তোমার মেজদাদা বেশ চাপা, বুদ্ধিমান লোক। বৈরাগ্যপ্রধান প্রকৃতি, শুধু বিশ্বাসের অভাবে বাঁধা রয়েছেন। বিশ্বাসের ছিটা ফোঁটা পেলে কোথায় গিয়ে ছুটে পড়্‌বেন, খোঁজ খবর পাবে না। এখন বিশ্বাস জন্মালে কি চলে? কর্ম্ম যে কাটা চাই। তোমরা চারিটী ভাই পরস্পর পরামর্শ করে এবার এসেছ। প্রকৃতি এক এক জনার এক এক প্রকার; কিন্তু গড়ে সকলেই এক রকম।

অযাচিত দান—কচুরি, আদা, ছোলা।

ঠাকুরের অনুমতি লইয়া মেজদাদার সঙ্গে বাড়ী যাত্রা করিলাম। নদীর পাড়ে পহুঁছিয়া মেজদাদা নৌকা ভাড়া করিলেন, এবং আমাকে তথায় রাখিয়া কোন প্রয়োজনে সহরে গেলেন। আমার ভগ্নির কথা মনে হইল। তিনি আমার নিকটে খাস্তা কচুরী খাইতে চাহিয়াছিলেন। হাতে মাত্র দুইটী পয়সা আছে, তাহাই লইয়া বাঙ্গালা বাজারে খাবারের দোকানে উপস্থিত হইলাম। ময়রাকে দুটী পয়সা দিয়া বলিলাম—এতে যত খানা হয়, খাস্তা কচুরি আমাকে দেও। ময়রা কিছুক্ষণ আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"মিষ্টি কিছু নিবেন না?" আমি বলিলাম—না; পয়সা নাই। ময়রা আর কিছু না বলিয়া একটী চুব্‌ড়িতে অমৃতি, রসগোল্লা প্রভৃতি উপাদেয় কতকগুলি মিষ্টি তুলিয়া এবং তাহার উপরে দশখানা খাস্তা কচুরি দিয়া বলিল—"এই দয়া করিয়া নিয়া যান, আমি আপনার কাছে পয়সা নিব না।" অযাচিতরূপে যাহা পাইলাম, তাহা ঠাকুরেরই ইচ্ছায়, তাঁর প্রসাদ মনে করিয়া গ্রহণ করিলাম। নৌকায় আসিয়া স্নান-তর্পণ করিয়া বসিয়া আছি, বড়ই পিপাসা পাইল। আশ্রম হইতে কিছু আদা ছোলা খাইয়া আসিলে সুবিধা হইত, পুনঃপুন এই রূপ মনে হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা আমার এক বাল্যবন্ধু ললিত মোহন গাঙ্গুলি স্নান করিতে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। সে আমার নিকটে আসিয়া বলিল—"ভাই, বাড়ী যাচ্ছ? বেশ, আমার ভজন কুটিরটি তোমাকে একবার দেখে যেতে হবে।" এই বলিয়া নদীর পাড়ে তার বাসায় আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। আমি তার বাসায় গেলাম। তখন সে কতকগুলি আদা, ভিজা ছোলা ও গুড় আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"ভাই, শেষ বেলা বাড়ী গিয়া পঁহুছিবে। দয়া করিয়া সামান্য এই একটু জলযোগ করিয়া যাও।" খুব তৃপ্তির

সহিত তার শ্রদ্ধার দান ভোজন করিয়া নৌকায় আসিলাম। বারংবার মনে হইতে লাগিল—ভবিষ্যতে আমার যাহা প্রয়োজন আমি তাহা বুঝি না, ভবিষ্যতে আমার কখন কি আকাঙ্ক্ষা হইবে কিছুই জানি না; অথচ ঠাকুর তাহা বুঝিয়া আমার সমস্ত অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, একি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী পঁহুছিলাম। মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছায় তাঁহারই নির্দ্দেশমত রান্না করিয়া প্রসাদ পাইলাম। বহুদিন পরে আজ পাড়ার বৃদ্ধদের পদধূলি মস্তকে লইয়া বড়ই আনন্দ হইল। সকলেই আমাকে প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শুনিয়াছিলাম, চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে হইলে বৃদ্ধদের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতে হয়। একথা যে যথার্থ, পরিষ্কার তাহা অনুভব করিলাম।

স্বপ্নে শালগ্রাম ও গোপালপূজা।

বাড়ীতে আসিয়া দুইটী সুন্দর স্বপ্ন দেখিলাম। ১৫ই পৌষ রাত্রি আড়াইটার সময়ে দেখিলাম, একটী সুগোল সুশ্রী শালগ্রাম ঠাকুরকে ধ্যান পূর্ব্বক পরমানন্দে ফুল, তুলসী, দূর্ব্বা, চন্দনাদি দ্বারা উহা পরিপাটীরূপে সাজাইতেছি। পূজা সমাপন হইতেই জাগিয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গের পরও কিছুক্ষণ ঐভাবে অভিভূত রহিলাম। তৎপরদিন আবার দেখিলাম—বাড়ীর গোপাল ঠাকুরকে খুব ভক্তির সহিত পূজা করিতেছি, এমন সময় ঠাকুরের সিংহাসন কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সিংহাসনের একটী পায়া, দুইটী পায়া, ক্রমে তিনটী পায়া শূন্যে উঠিয়া পড়িল; কেবল একটী পায়া মাত্র ভূমি সংলগ্ন রহিল। ভাবিলাম—ঠাকুর বুঝি এইবার গোলোকে চলিলেন। ঐ সময়ে চাহিয়া দেখি—২।৩ মাসের শিশুর মত ঠাকুর আমার সিংহাসনে চিৎ হইয়া হাতপা নাড়িয়া খেলা করিতেছেন। আমি একটু দৃষ্টি করিতেই হঠাৎ গোপাল মাটিতে নামিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। আমিও তখন ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে জাগিয়া পড়িলাম। এই গোপালের আকৃতিটি অনেকটা যেন দাউজীর মত।

মনোমুখী হইয়া চলার ফল। গুরুসঙ্গের প্রভাব।

ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া বাড়ী আসিলে প্রতিবারেই দেখি সাধন ভজনের উৎসাহ আনন্দ ধীরে ধীরে নিবিয়া যায়, নিত্যকর্ম্মের নিয়ম-বন্ধনে আবদ্ধ থাকি বলিয়া

বাহিরে রক্ষা পাই বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্যপ্রকার হইয়া পড়ি। বাড়ীতে সৎসঙ্গের বড়ই অভাব। বিষয়ীলোক ও স্ত্রীলোকদের সঙ্গ ছাড়িবার উপায় নাই। নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা ও সম্ভোগ বাসনায় চিত্ত কলুষিত না করে, এজন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। যদিও নিজের ভাবেই নিজেকে রক্ষা করে, এবং নিজের ভাবেই নিজেকে বিনাশ করে সত্য, তথাপি দেখিতেছি, অনেক সময়ে অন্যের ভাবেও চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলে। নিয়ত সকল দিকে নজর রাখিয়া সতর্ক থাকাও সহজসাধ্য নয়। এতকাল সদ্‌গুরুর সঙ্গ এবং সাধন ভজন করিয়াও যদি এত ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়, তাহা হইলে আমার আর কি হইল? ছাগল ভেড়ার ভয়ে সর্ব্বদাই যদি হাতে লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, তবে আর ঠাকুর কি করিলেন? ঠাকুরের আদেশ পালনে লক্ষ্য না রাখিয়া, শুধু নিজ প্রকৃতি বশে চলিলে কতদূর কি হয়, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। আহারের নিয়ম তুলিয়া দিলাম; যে যাহা দিতে লাগিল, তাহাই খাইতে লাগিলাম। অতিরিক্ত লঙ্কা, মিষ্ট ও গব্যবস্তু কিছুই বাদ দিলাম না। স্ত্রীলোকের সঙ্গেও মিলিয়া মিশিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। এইভাবে চলার ফলে এই কয়দিনেই যে নিজের অধঃপতন কতদূর হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সাধনের প্রথমাবস্থায় সদ্‌গুরু বা সাধু সজ্জনের সঙ্গ ব্যতীত, চিত্ত কিছুতেই সুস্থির ও নির্ম্মল থাকে না, ইহা এক্ষণে অতি পরিষ্কার রূপেই বুঝিলাম। বাড়ীতে আর ৪।৫ দিন কোনও প্রকারে কাটাইয়া, অচিরে ঢাকা রওয়ানা হইলাম। উত্তপ্ত, রুক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রজড়িত অপবিত্র দেহ যেরূপ গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ, সুশীতল ও নির্ম্মল হয়, ঠাকুরের দর্শনমাত্র আমার তেমনই বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুর! দয়া করিয়া এইভাবে ফেলিয়া তুলিয়া তোমার অসীম মাহাত্ম্য তুমি না বুঝাইলে, কে তোমাকে বুঝিবে?

আশ্রমে আসিয়াই পুনরায় ঠাকুরমার সেবায় লাগিয়া গেলাম। বাড়ীতে ৪।৫ দিন থাকিয়া কতপ্রকার দুর্ভোগ ভুগিয়াছি, অবসর মত ঠাকুরকে জানাইতে ব্যস্ত হইলাম। বড়দিনের ছুটীতে এখন বহু গুরুভ্রাতারা নানা দিক হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ভক্ত গুরুভ্রাতাদের শুভ-সম্মিলনে আশ্রমে যেন নিয়ত উৎসব চলিয়াছে। সহর হইতেও শত শত ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। আশ্রমটি যেন সর্ব্বদাই গম্ গম্ করিতেছে।

বীর্য্য ধারণের উপায় ও উপকারিতা। ঊর্দ্ধরেতা হওয়ার উপায় ও ফলাফল। নাস্তি প্রাণায়ামাৎবলম্‌।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের নিকটে আমতলায় আসিয়া বসিলেন। বীর্য্যধারণ না করিলে এই সাধনের উপকারিতা সহজে উপলব্ধি হয় না, এই কথা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারা এই সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহীর পক্ষে বীর্য্যরক্ষার সহজ উপায় কি? এবং তাহার উপকারিতাই বা কি? আর ঊর্দ্ধরেতা না হইলে কি জীবের উদ্ধার হয় না? ঠাকুর লিখিয়া ও সময় সময় অস্ফুটস্বরে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন—

১৮ই পৌষ।
১লা জানুয়ারী ১৮৯৩।

বীর্য্যরক্ষার দিকে লক্ষ্যরেখে চল্‌তে হবে। এখন একেবারে বন্ধ রাখা উচিত হবে না। কারণ, গৃহীর ব্যবস্থা ভিন্ন। যাঁরা বিবাহিত, তাঁদের ২।৩টী সন্তান হ'লেই বীর্য্য রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল পুরুষের ইচ্ছা হ'লে হবে না। এ কার্য্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সাহায্য চাই। স্ত্রীর ইচ্ছা না হ'লে পুরুষ সক্ষম হবে না। বীর্য্যরক্ষা দ্বারা শরীর নীরোগ হয়, এবং মন সুস্থ হয়। যদি কোন কারণে বীর্য্যরক্ষা না হয়, তাতে মুক্তির ব্যাঘাত হয় না; তবে সাধন পথের বিঘ্ন হয়। এই জন্য বীর্য্যরক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাণায়ামে ও বীর্য্যরক্ষায় শরীর মন সবল ও সুস্থির হয়। বীর্য্যরক্ষার চেষ্টা কর্‌তে হবে। নিজের শক্তিতে না কুলালে কখনও কিন্তু কোনরূপ বাহিরের ঔষধাদি উপায়ের দ্বারা নিবারণ করা উচিত নয়। পৃথক শয়নের ব্যবস্থা আছে। বীর্য্যের গতি ঊর্দ্ধদিকে কর্‌বার জন্য এক প্রকার সাধন আছে। তাতে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে করাতের মত কেটে কেটে পথ করে। তাহা অতিশয় কষ্টকর। এজন্য সে প্রণালী ভাল নয়। অসহ্য বেদনা হয়, সহ্য করা যায় না। কিন্তু একবার সেই প্রণালী ধর্‌লে ছাড়া যায় না। এজন্য অধিকাংশ সাধক ঐ 'বজ্রলি' প্রণালীর পক্ষপাতী নয়। সহজ উপায়—প্রস্রাব একবারে কর্‌বে না। ধীরে ধীরে, রেখে রেখে কর্‌বে। একটু প্রস্রাব হ'লেই টেনে নিয়ে আবার প্রস্রাব কর্‌বে—আবার টেনে নেবে। স্ত্রী সহবাসের সময়েও বীর্য্যত্যাগ

না করে টেনে নিতে চেষ্টা কর্‌বে। গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রীসহবাসের যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে চলা উচিত। ঋতু স্নানের পর ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রশস্ত সময়। তাতেও অষ্টমী, নবমী, একাদশী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী ও পক্ষান্ত বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অবশিষ্ট যে কয়েক দিন থাক্‌বে, তা'তে কোন কারণে অপারগ হ'লে অন্য সময়েও তিন চারি দিন স্ত্রীসঙ্গ করা যায়। সঙ্গমের সময়ে ধৈর্য্যের সহিত বীর্য্যের গতিরোধ কর্‌তে হয়। উভয়ের সম্মতিতে উভয়েরই এক সময়ে রোধের চেষ্টায় কুম্ভক কর্‌তে হয়। তা হ'লে, একটী নাড়ী আছে—তার ভিতর দিয়া উভয়ের রেতঃ উর্দ্ধদিকে গমন করে। এটী বিশেষ সাবধানতার সহিত কর্‌তে হয়। এই 'সহজলি' মতে সাধন কর্‌লে, সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। গুরুর উপদেশ মত এই সব কর্‌তে হয়, নইলে বিপদ। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা সম্যক্‌ প্রকারে ছ'টী মাস কেহ কর্‌লে সে নিশ্চয় বাক্‌সিদ্ধ হ'তে পার্‌বে। প্রকৃতির মধ্যে যা আছে, তা বলপূর্ব্বক কেহই নিবারণ কর্‌তে পারে না। কত ইন্দ্র চন্দ্র এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পরাস্ত হয়েছেন। কেবল ভগবানের শরণাপন্ন হ'য়ে নাম কর্‌লেই সহজে প্রবৃত্তি দমন হয়। বাহ্যিক উপায় কিছু নয়, নাম কর্‌তে কর্‌তে আপনিই সমস্ত চ'লে যাবে। প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। তা অভ্যাস হ'লে, প্রাণায়ামও স্বাভাবিক হ'য়ে যায়, বীর্য্যও স্থির হয়। প্রাণায়ামের তিনটী অঙ্গ—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। কুম্ভক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কুম্ভক কর্‌লে দীর্ঘ-জীবন লাভ হয়, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যাধি নষ্ট হয়। প্রতিদিন কুম্ভক ও তার সঙ্গে যদি বীর্য্যধারণ হয়, তবে শরীরটি যথার্থ দেবমন্দির হয়, রোগ-শোক দূর হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সঙ্গে প্রাণায়ামাদিও সাধন কর্‌তে হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম সাধন কর্‌তে প্রথম প্রথম শ্বাসে শ্বাসে লক্ষ্য রেখেই নাম কর্‌তে হয়। ক্রমে মেরুদণ্ড দিয়ে যে শ্বাস বয়, তাহার সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন তার সঙ্গে নাম জপ কর্‌লে সহজেই সব আশা পূর্ণ হয়। প্রাণায়াম অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল কর্‌তে হয়। শুয়ে, দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে প্রাণায়াম কর্‌তে নেই। আসন ক'রে ব'সে ব'সে প্রাণায়াম কর্‌তে হয়।

প্রাণায়ামের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা ভাল। শেষরাত্রি প্রাণায়ামের প্রশস্ত সময়। প্রথম প্রথম আধ ঘণ্টার অধিক সময় করার প্রয়োজন নাই। ক্রমে সময় বৃদ্ধি কর্‌তে হয়। একবারে অর্দ্ধঘণ্টা অবিচ্ছেদে কর্‌তে না পার্‌লে থেমে থেমে কর্‌বে। কর্‌তে কর্‌তে বাধা পড়্‌লে অবসর মত আবার ক'রে, ঐ সময়টি পূরণ ক'রে নিতে হয়। মুখ খুলে বা বুজে প্রাণায়াম করা যায়। প্রাণায়ামের সময়, খুব নাম কর্‌বে, নাম কখনই বন্ধ রাখ্‌বে না। প্রাণায়ামের শব্দ, অল্প অল্প অন্যে শুন্‌লে ক্ষতি নাই। তবে, না শুন্‌লেই ভাল। উচ্চ শব্দ, অন্যে শুন্‌লে তার ক্ষতি হ'তে পারে। শিশুর নিকটে বালকের নিকটে কর্‌তে নাই। গুরুর উপদেশ ছাড়া, কেহ দেখে বা শুনে ওরূপ কর্‌তে গেলেই বিপদ। জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচে প্রাণায়াম কর্‌তে বাধা নাই। খালি পেটে, ক্ষুধা বোধ হ'লে, প্রাণায়াম করায় ক্ষতি হয়। পেট ফাঁপ্‌লে, মাথা ধর্‌লে বা কোন রোগের দরুণ প্রাণায়াম কর্‌তে ক্লেশ হলে প্রাণায়াম কর্‌তে নাই। কুম্ভক না হওয়া পর্য্যন্ত, যোনীমুদ্রা কর্‌লে ক্ষতি হয়। প্রাণায়ামে দেহ নীরোগ হয়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য নিবারিত হয়, মন সুস্থির হয়—অন্তরীক্ষে বিচরণের ক্ষমতা জন্মে, দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, পরমার্থ-শক্তি প্রবুদ্ধ হয়। ঋষিরা বলিয়াছেন—"নাস্তি প্রাণায়ামাৎ বলম্।" পাতঞ্জল দর্শনে ব্যাসভাষ্যেও লিখিত আছে—"তথাচোক্তং, তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ, ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।" তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্টতর তপস্যা আর নাই; তদ্দারা চিত্তের ময়লাসকল বিধৌত হয়, এবং জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষ হয়, শয়ন সময়ে ভগবানের মাতৃবাচক নাম বেল পাতায় বা তুলসীপাতায় লিখে বালিশের নীচে রেখে নিদ্রা যাবে। যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, নাম কর্‌বে। নিজের ইচ্ছায় কিছু না ক'রে, গুরু যাহা বলে দেন, তাহা যতটুকু পারা যায়, করা কর্ত্তব্য।

যোগের একটী অঙ্গ প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের অর্থ এই যে অন্য দিকে মন গেলে তাহাকে ফিরায়ে আনা। নাম কর্‌তে কর্‌তে যে অবস্থা হয়, বা যাহা

দর্শন হয়, তাহা ধ'রে রাখার নাম ধারণা। হঠাৎ অবস্থা খুলে যায় না। ক্রমে ক্রমে সব লাভ হয়। দৃষ্টি সাধন কর্‌লে মন স্থির হয়। বৃক্ষ, আকাশ, জল, অগ্নি যথাপ্রণালী এ সকলের দিকে চেয়ে দৃষ্টি-সাধন কর্‌তে হয়। আত্মা প্রস্তুত হ'লে পর, ভগবৎ দর্শন আরম্ভ হয়। তখন আর সংশয় থাকে না। কাম, ক্রোধ, বাসনা-কামনা, এ সকল কিছুই থাকে না। ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবদেবী দর্শন হয়; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কুলদেবতা অথবা যিনি যে দেবতাকে ভালবাসেন, তাহাই তাঁহার নিকটে প্রথম প্রথম প্রকাশ হয়। বেদ, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র কিভাবে হ'য়েছে, সৃষ্টি কিরূপে হ'য়েছে এই সকল প্রকাশিত হ'তে হ'তে মায়া চ'লে যায়। তখন সমস্ত ব্রহ্মময় হয়। ক্রমে ভগবল্লীলা দেখা যায়। ভগবানই চরম লক্ষ্য।

ঊর্দ্ধরেতা হ'লে লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী। ঊর্দ্ধরেতা হ'লে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ বড় সাধারণ নয়। স্ত্রীসঙ্গতে যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষাও ঐ আনন্দ সহস্রগুণে অধিক। কিন্তু উহা শারিরীক, উহা লাভ ক'রে লোকে লক্ষ্য ভুলে যায়। মনে করে, ইহাই ব্রহ্মানন্দ। এখানেই অনেকে বদ্ধ হয়। দুর্ব্বাসা ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। তাঁর অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য কর্‌তেন না। অবশেষে এতই বেশী অপরাধী হ'লেন যে, তাতে তাঁর সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেল। ঊর্দ্ধরেতা বরং না হওয়া ভাল। ঊর্দ্ধরেতা হ'লেই যে ভগবানকে লাভ করা যায়, তা নয়, একটী লোক দিনে দশবার স্ত্রীসঙ্গ কর্‌লেও যদি তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, ভগবানকে লাভ কর্‌তে পারে। উহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু একজন ঊর্দ্ধরেতা হ'য়েও যদি অহঙ্কারী হয়, তার কিছুই হবে না।

ধর্ম্মের আকারে মনোমুখী কুবুদ্ধি, তার পরিণাম।

২২শে পৌষ, বৃহস্পতিবার।

কিছুকাল যাবত আমি যন্ত্রনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছি। এখন ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া ভিতরে আগুন ধরিয়া গেল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম—হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! ভ্রান্ত বুদ্ধিতে

ঠাকুরের আদেশ ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারিয়া বিপথগামী হইয়াছি। এখন এই অভ্যস্ত দোষগুলির সংশোধন করা অতিশয় দুষ্কর দেখিতেছি। বিচার বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলাম—বিধিমত চলার চেষ্টাই "সাধন"। এই সাধনে আমাদের লাভ কি? লাভালাভ সমস্তই তো আমাদের গুরুর হাতে। চেষ্টা যত্ন করিয়া কিছুই যখন হয় না, শুধু এক গুরুর কৃপাতেই যখন সব হয়, তখন বৃথা এত সাধন-ভজনের কঠোরতা করিয়া কষ্ট পাই কেন? পক্ষান্তরে দেখিতেছি—তীব্র সাধনে বরং অনিষ্টই হয়। ঠাকুরের কৃপায় যদি কোন ভাল অবস্থা লাভ হয় নিষ্ঠাচারী কঠোর সাধক মনে করিবে, উহা তাহারই চেষ্টার ফলে হইয়াছে। ভগবানের কৃপার দান লাভ করিয়াও সে উহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিবে না। ফলে, তাহার গুরুস্থানে গুরুতর অপরাধীই হইতে হইবে। অতএব বিনা আয়াসে, বিনা সাধন ভজনে, যদি আমার কোন অবস্থা লাভ হয়, তাহাই ত আমি গুরুদেবের বলিয়া, সহজে গ্রহণ করিতে পারিব, এইভাবে ধর্ম্মের আকারে স্বেচ্ছাচারী ও মনোমুখী অসৎ বুদ্ধি উৎপত্তি হওয়াতে, চিত্তকে আমার তোলপাড় করিয়া তুলিল। আমি পুরুষকারমূলক ক্লেশ সাধ্য সংযমাভ্যাস ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এখন দেখিতেছি, হিতে বিপরীত করিয়া বসিয়াছি। আহারের নিয়ম তুলিয়া দিয়া বিষম লোভী ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির না রাখাতে স্ত্রীমূর্ত্তি সময় সময় দেখিতেছি, তাহাতে আমার নিস্তেজ কাম রিপুর পুনরুত্থান হইয়াছে। বাক্য সংযমের অভ্যাস ত্যাগ করায় এখন অতিরিক্ত বাচাল ও অভিমানী হইয়া উঠিয়াছি। সাধন ভজনে আগ্রহ না থাকায়, দমে দমে কুম্ভক ও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম লইবার চেষ্টা আর নাই। ইহাতে মনের স্থিরতা ও চিত্তের প্রফুল্লতা একেবারে হারাইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, বাক্‌সংযম ও বীর্য্য রক্ষা দ্বারা উর্দ্ধরেতা বা বাক্‌-সিদ্ধ হইলেই বা কি হইল? শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিয়াও যখন পূর্ণকাম হওয়া যায় না, উহা যখন শুধু গুরুরই কৃপাতে হয়, তখন অনর্থক উৎকট সাধনে, কেন আর বৃথা ক্লেশ ভোগ করিয়া মরি? ঠাকুরের প্রতি মমতা, তাঁহার উপরে একান্ত ভালবাসা, এবং অবিচ্ছেদে তাঁর সঙ্গলাভই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছি। কিন্তু, কুগ্রহের দুর্ব্বিপাকে আমার বুদ্ধির এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল কেন? যাঁহাকে ভালবাসিতে চাই, যাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে চাই, তাঁহার অবাধ্য হইলাম কেন? যাঁহাকে যথার্থ ভালবাসি, তাঁহার তৃপ্তির জন্য কি না করিতে পারি? আনন্দের সহিত ঠাকুরের আদেশ রক্ষার আগ্রহই তো তাঁহার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। ঠাকুরের আদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে কোন প্রকার

যত্ন না করিয়া, অবিচারিত চিত্তে তাহা প্রতিপালনের আনন্দ অনুভব করাই আমার কর্ত্তব্য। কুবুদ্ধি বশতঃ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, আমি এ কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! এখন কি উপায় করিব, ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি।

ধর্ম্মবুদ্ধিতে অধর্ম্মে পড়ি কেন? এখন উপায় কি?

আজ কোন কোন গুরুভ্রাতার সহিত আলাপে জানিলাম, তাহাদেরও আমারই মত অবস্থা। সকলে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভিতরের অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম্ম ছাড়া তো কিছু চাহি না, তবে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে কেন। ধর্ম্মবুদ্ধিতে অধর্ম্ম করিয়া যে জ্বালা ভুগিতেছি, তাহা এখন কিসে যায়?

ঠাকুর উত্তরে জানাইলেন—বাহিরে যেমন গ্রহাদির প্রভাব হয়, ভিতরেও সেইরূপ। যাঁহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে উহা অনুভব করেন। পূর্ব্বকালে সাধকগণ ইহাকে ইন্দ্রদেবের অত্যাচার বলেছেন। মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকগণও ইহাকে সয়তান ব'লে থাকেন। ইহার হাত হ'তে বড় কেহই নিস্তার পান নাই। কেবল মহাদেব, শুকদেব, বুদ্ধদেব ও হরিদাস ঠাকুরই রক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথমে কামক্রোধরূপে, পরে বাসনাকামনারূপে, তাতেও যদি না পারে, তা হ'লে ধর্ম্মরূপে এসে সাধকের সর্ব্বনাশ করে। ইহার একমাত্র ঔষধ, ধৈর্য্য ধ'রে পড়ে থাকা, আর শ্বাসে শ্বাসে নাম করা। রোগীর ঔষধ খেয়ে খেয়ে, ঔষধে আর রুচি থাকে না। যন্ত্রনায় অস্থির, তবু ঔষধ খেতে হয়। কারণ অন্য উপায় নাই। সাধনও সেই প্রকার করতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা হয়েছে, তাহার ফলভোগ ক'রে মুক্তি পেতে হ'লে, অনেক জন্ম ঘুরে ঘুরে তাহা শেষ করতে হয়। আর ভগবৎ নামের গুণে সহজে মুক্তি হয়। কিন্তু বিঘ্ন এই যে, নামে রুচি হয় না। দুঃখকষ্ট সমস্ত চারদিকে। অগ্নিকুণ্ডে পড়ে নাম করতে হবে। প্রহ্লাদচরিত্র ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আহারের বস্তুতে বিষ, অগ্নিকুণ্ডে বাস, হস্তীপদতলে, সমুদ্রজলে নিক্ষেপ; চারদিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত; সহায় কেবল হরিনাম! অবশেষে প্রহ্লাদেরই জয় হলো। ভগবান্ নরসিংহরূপে প্রকাশিত হ'য়ে

তাঁহাকে রক্ষা কর্‌লেন। এই সাধনপথও সেইরূপ, জ্বালা-যন্ত্রনার ভিতর দিয়া যেতে হবে। এসব অগ্নি পরীক্ষা, ইহাতে যত পোড়া যাবে, ততই বিশুদ্ধ হবে। ইহা নানারূপে সাধকের প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুসারে তাহাকে অধিকার করে। এই যন্ত্রনায় আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। পরমহংসজী রক্ষা করেন। জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপ দগ্ধ কর্‌তে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই যন্ত্রনাই মুক্তির হেতু। ইহা যাহার হয়, সে কৃত্রিম ধর্ম্মের ভাণ কর্‌তে পারে না। পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্ম্মের আনন্দ হয়, তাহা বিড়ম্বনা। যেমন রোগী কুপথ্য খেয়ে সুখী হয়। প্রথমে যন্ত্রনায় শুকায়ে শুকায়ে নীরস হবে। বিষয়রস এক বিন্দু থাকতেও ব্রহ্মানন্দ আসে না। এই যন্ত্রনার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাবে। তখন বুঝ্‌বে। এখন শ্বাসে শ্বাসে নাম কর, সমস্ত যন্ত্রনার অবসান তাতেই হবে।

প্রশ্ন—কতকাল আমাদের এ যন্ত্রনা ভুগ্‌তে হবে?

ঠাকুর—তা বলা যায় না। এখনও আমাকে পরীক্ষা করতে আসেন। সে দিন হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঘরের ভিতরে চারটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক। তাহারা নানাপ্রকারে আমাকে পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হলেন না, তখন দুই কলসী মোহর আমার সম্মুখে রেখে বল্‌লেন— 'তুমি এসব গ্রহণ কর।' আমি বল্‌লাম—উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তখন উহারা বল্‌লেন—'আমাদিগকে শিষ্য কর।' আমি বল্‌লাম—তোমরা কে? উহারা কহিলেন—'আমরা পতিতা নারী—আমাদিগকে উদ্ধার কর।' আমি বল্‌লাম—মাথার চুল মুড়াও, অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র ত্যাগ ক'রে, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ক'রে এসো। ইহা শুনে তাহারা হেসে বল্‌লেন—'আমাদের চিন না? আমরা যে মায়ার দাসী। কত কাল আমাদের চরণ সেবা করেছ। এখন দিন পেয়ে চিন্‌ছ না? ভাল, তোমার কল্যাণ হৌক্—আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।' ইহা বলে তাহারা চলে গেলেন।

নাবালক গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রের প্রশ্নে ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

বানরিপাড়া নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত নারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের নাবালক পুত্র অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের কতিপয় জটিল প্রশ্নে ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

প্রশ্ন—আমাদের কি ত্রাণ হইবে?

উত্তর—হাঁ, হাঁ হবে।

প্রঃ—আপনাকে যদি আমরা স্মরণ করি তাহা বুঝিতে পারেন?

উঃ—হাঁ, হাঁ।

প্রঃ—যতবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়াছিলাম শুনিয়াছিলেন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—গুরু কি সর্ব্বত্র?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তবে আপনি আমাদের নিকট সর্ব্বদা থাকেন?

উঃ—হাঁ, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—নাম করিতে থাক, চোখ খুলিয়া যাইবে—তখন সকল বুঝিবে।

প্রঃ—আপনার নিকট সাধন লইলে না কি রিপুর উত্তেজনা বাড়ে?

উঃ—হাঁ, সাধন লইলে রিপুর উত্তেজনা বাড়ে, যেমন নির্ব্বাণকালে আগুণ বাড়ে। বাড়িয়াই চিরকালের তরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়।

প্রঃ—রিপু উত্তেজিত হইলে উপায়?

উঃ—রিপুর উত্তেজনায় পড়িলে নামের উত্তেজনাও বাড়াইতে হয়।

প্রঃ—ভগবদ্ভক্ত ও যাঁহারা তাঁহাদের শরীরে লীন হইয়া যান উভয়ে প্রভেদ কি?

উঃ—ভক্ত লীন অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ। অতুল আনন্দের অধিকারী।

প্রঃ—মহাপ্রভুর ভক্তগণ কি সকলেই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তাঁহার কত সহস্র ভক্ত ছিলেন সকলেই সিদ্ধ ইহা কিরূপে?

উঃ—হাঁ, তাঁহারা ভগবানের প্রতি অবতার কালে সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন। এই ভাবে সমস্ত কাল চলিবে।

প্রঃ—(অভয়বাবু) নরোত্তম ঠাকুর তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়াছেন, তাহাই কি ?

উঃ—হাঁ, তাহা সুসত্য জানিবে।

প্রঃ—মহাপ্রভু কি স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি একমাত্র ঈশ্বর তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে নবদ্বীপে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

উঃ—হাঁ, যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হয় ত এক সময়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়া থাকেন, তাহা জীবে কি বুঝিবে ?

প্রঃ—নিত্যানন্দ কি ?

উঃ—অংশাবতার, বলরাম।

প্রঃ—অদ্বৈত ?

উঃ—অংশাবতার—মহাবিষ্ণু।

প্রঃ—বুদ্ধদেব কি স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—যীশুখৃষ্ট মাছমাংস খাইতেন কেন ?

উঃ-তৎকালীন লোকের মাছমাংস খাওয়া প্রকৃতিগত ছিল বলিয়া, তিনিও সে সম্বন্ধে অজ্ঞবৎ হইয়া খাইতেন।

প্রঃ—তিনি কি ?

উঃ—স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রঃ—সকলে ত ইহা বিশ্বাস করেনা ?

উঃ—বিশ্বাস করেনা বলিয়া কি যাহা প্রকৃত কথা তাহা বলিবে না ? (এই ভাব প্রকাশ করিলেন)

প্রঃ—আপনি সকলের নিকট বলিতে পারেন যে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

উঃ—স্বচ্ছন্দে।

প্রঃ—রাম কৃষ্ণ রূপাদি যেরূপ পুস্তকে ব্যক্ত আছে তাহা ঠিক্, না রূপক ?

উঃ—না, না সব ঠিক্ ঠিক্।

প্রঃ—ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে চৈতন্যলীলাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তখন দুই অংশ অবতার ও স্বয়ং অবতীর্ণ।

উঃ—হাঁ, এমন লীলা আর হয় নাই।

প্রঃ—বেশীই বা কি হইল, মাত্র এই ক্ষুদ্র ভারতের অল্পস্থানেই তাঁহার প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন ?

উঃ—না, সে লীলার তো শেষ হয় নাই। কেবল তাঁহারা কয়েকদিন থাকিয়া উঁকি মারিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। দেখনা এখন খৃষ্টানাদি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন মৃদঙ্গ বাজিতেছে। এমন দিন আসিবে, যখন সমস্তই মৃদঙ্গময় হইবে।

প্রঃ—কলিযুগে ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ হইলেন অন্যান্য যুগে ত এত নহে ?

উঃ—কলিযুগে অনেক অবতার। আরও অবতীর্ণ হইবেন।

প্রঃ—বর্ত্তমান সময় কি কলি যুগ ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—কলিযুগের অবতারের কি কোন বর্ণ নির্ণয় আছে ?

উঃ—না, তা কিছু নাই।

প্রঃ—কলিযুগ তো ধন্য হইল ?

উঃ—হাঁ, হাঁ।

প্রভু বলিলেন—অবতার তিন প্রকার—পূর্ণাবতার (অবতীর্ণ) অংশাবতার ও শক্ত্যাবতার।

প্রঃ—যাহাতে ঐশী শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই কি শক্ত্যাবতার ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি অনুভূত হইলে আমরাও কি শক্ত্যাবতার হইলাম ?

উঃ—হাঁ, (উপহাস করিয়া বলিলেন) এই তো অবতার আছ।

প্রঃ—সৌভাগ্যক্রমে কোন মহাজনের হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হইল, তখন তাঁহাকে অংশাবতার বলা যায় কি ?

উঃ—হাঁ, তাহা হইতে পারে।

প্রঃ—তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কি নিতাই অদ্বৈত শ্রেষ্ঠ?

উঃ—নিতাই অদ্বৈত ভগবানের অঙ্গ। ইঁহারা আদি হইতে তাঁহাতে আছেন।

প্রভু বলিলেন—নানক অংশ অবতার।

প্রঃ—মহম্মদ কি?

উঃ—তিনি একজন মহাপুরুষ।

প্রঃ—তিনি না কি খোদার দোস্ত ছিলেন?

উঃ—হাঁ, ছিলেন, তাতে কি?

প্রঃ—কালী দুর্গা কি রূপক, না ঐ প্রকার রূপাদি আছে?

উঃ—না, না। উহা ঠিক্ ঠিক্।

প্রঃ—উঁহারা কি?

উঃ—উঁহারা তিনিই।

প্রঃ—সে কি প্রকার?

উঃ—ঈশ্বরের অনন্ত ভাব।

প্রঃ—(অভয় বাবু) আপনি বলিয়াছিলেন যে সহস্র সহস্র কৃষ্ণ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি সত্য?

উঃ—হাঁ, হাঁ তাহা সত্য জানিবে।

প্রঃ—অনেকে বলেন যে, অন্য সাধু মহাত্মাদিগকে সেবা করিবার অথবা তাঁহাদের সঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? গুরুকে ভক্তি করিলেই সব হইল, ইহা কিরূপ?

উঃ—যাহারা অন্য সাধুভক্তদিগকে ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা গুরুকেও ভক্তি করিতে জানে না।

প্রঃ—আপনি নাকি যাহার যেমন বিশ্বাস তাহাকে তেমন বলিয়া থাকেন?

উঃ—না তাহা নহে; কিন্তু জ্বররোগে কুইনাইন্ সেবনীয়, আমাশয়ে উহা বিষবৎ।

প্রঃ—কথা যাহা প্রকৃত, তাহাই বলেন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—গোঁসাই ! প্রেমভক্তি লাভ হইবে কিসে ?

উঃ—প্রেমভক্তি সহজ নহে। উহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। কাহারও কাহারও সৌভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া থাকে। এখন পড়, বিবাহ কর, অর্থ কর, তারপর শুভাদৃষ্ট হইলে, তোমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে।

আমাকে আরও বলিলেন—তোমার পক্ষে পিতৃপূজা পিতৃআজ্ঞা পালনেই সব হইবে।

প্রঃ—প্রেমভক্তি কেহ কাহাকে দিতে পারে না ?

উঃ—না।

প্রঃ—নিত্যানন্দ প্রভু নাকি প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন ?

উঃ—হাঁ, তিনি পারেন।

প্রঃ—তিনি এখন কোথায় ?

উঃ—সর্ব্বত্র।

প্রঃ—অদ্বৈত প্রভু ?

উঃ—সর্ব্বত্র।

প্রঃ—মহাপ্রভু ?

উঃ— সর্ব্বময় ?

প্রঃ—শঙ্করাচার্য্য কি মুক্তপুরুষ ছিলেন ?

উঃ—হাঁ, অংশাবতার শিব।

প্রঃ—তিনি ভগবানে লীন হইয়াছেন ?

উঃ—না।

প্রঃ— ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন বোধহয় যেন কত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ও মানুষের মত ব্যবহার দেখা যায় ইহা কিরূপ ?

উঃ—মনুষ্য প্রকৃতি অনুসারে না চলিলে মানুষ ধরা যাবে কেন ?

প্রঃ—নিতাই অদ্বৈত উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

উঃ—কেহ ছোট বড় নহে, উভয়ে সমান।

প্রঃ—শঙ্করাচার্য্যকে তো আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে না ?

উঃ—তাহা কে জানে, ভগবানের আদেশ হইলে হইতে পারে।

প্রঃ—গোঁসাই! আমি একটী বর চাই।

উঃ—কি বর।

প্রঃ—আপনাতে যেন কদাচ আমার ভক্তি বিশ্বাস টলে না ও আপনি প্রকৃত যে জিনিষ, তাহা যেন বুঝিতে পারি।

উঃ—হাঁ; তথাস্তু।

প্রঃ—বিশ্বাসভক্তি তো টলিবে না?

উঃ—না।

প্রঃ—মাছ খাইব কি না?

উঃ—অপরাধ মনে হইলে খাইবে না।

প্রঃ—আমার পক্ষে মাছ খাওয়ার সম্বন্ধে কি করিব?

উঃ—তোমার যাহা ইচ্ছা।

প্রঃ—আমার তো না খাইতে ইচ্ছা, কিন্তু গুরুজন অসন্তুষ্ট হইবেন সেজন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

উঃ—তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিবে, পা ধরিয়া বলিবে যেন তাঁহারা মাছ ত্যাগের অনুমতি দেন।

প্রঃ—আপনি আমাদের দেশে যাইবেন না?

উঃ—ভগবান্ নিলে যাইব।

প্রভু বলিলেন—"গান কর"—গান হইতে লাগিল।

প্রভু বলিলেন—হরি বোল, হরি বোল। সবে হরি বলিতে লাগিল। প্রভু নাচিতে লাগিলেন। প্রভু তোমাতে আমার ভক্তি বিশ্বাস হৌক্। প্রভু! অধমকে কি তোমার চরণে স্থান দিবে? এ জঘন্যকে তোমার ভক্তবৃন্দের দাস করিয়া দেও ও তাহাদের প্রেমের পাত্র কর। জয় প্রভু! পরম কারুণিক অবতার।

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু,
অদ্ভুত যাঁর প্রয়াস।
হিয়া আগুয়ান্ তিমির জ্ঞান-সমুদ্র
সুচন্দ্র কিরণে কুরু নাশ।

প্রভু বলিলেন—নাম করিতে থাক, নাম করিতে করিতে কত কি দেখিবে, শুনিবে, তার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নাম করিতেই থাকিবে।

প্রঃ—গোঁসাই, আমার অহঙ্কার বিনাশ করিবার জন্যই কি প্রথম সাধন পাইবে না বলিয়াছিলেন?

উঃ—হাঁ।

প্রভু বলিলেন—"ওঁ হরি" ভাবাবেশে অচৈতন্য হইলে এই নাম শুনাইতে হয়।

উলঙ্গ মায়ের নৃত্য—গোঁসাইয়ের আনন্দ।

শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বাবু ছুটীর সময়ে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিলেন। কলিকাতায় তিনি অনেকের নিকটে ঠাকুরের অসাধারণ গুণ ও অলৌকিক অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। তাহাতে ঠাকুরকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল। তিনি আশ্রমে পঁহুছিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলেন। ক্রমশঃ সহরের গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ বহুলোকের সমাগমে আমতলা পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুর কখন অস্ফুটস্বরে কখন বা লিখিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। আমতলায় ঠাকুরের কাছে বহুলোকের সম্মিলন দেখিয়া, হঠাৎ আজ কি ভাবিয়া, পাগ্‌লী ঠাকুরমার বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি এক দৌড়ে ঠাকুরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং পরিহিত বস্ত্রখানা মস্তকে বাঁধিয়া, সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় গান করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর হর্ষোৎফুল্ল ছলছল চক্ষে ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া, পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে তাঁহার নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিয়া, আহা হা হা বলিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা যতক্ষণ নৃত্য করিলেন, ভক্তিগদগদ ভাবে ঠাকুর ততক্ষণই তাঁহার নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিয়া ঠাকুরমার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। ঠাকুরমা এইভাবে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া, আশ্রমের দক্ষিণ দিকে—পুকুরের অপরপারে চলিয়া গেলেন। সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্। হরিনারায়ণ বাবু পরে বলিলেন—"এই একটী ঘটনা দেখিয়াই আমি গোঁসাইকে চিনিয়া লইলাম। আর কোন সংশয় বা পরীক্ষা করার প্রবৃত্তিই রহিল না। মানুষ কখনও কি এরূপ করিতে পারে!"

শ্রদ্ধা ও গুরুকরণ বিষয়ে প্রশ্ন। ধর্ম্মের অন্তরায়।

গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে শ্রদ্ধা, গুরুকরণ ও ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর কি—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর কখনও লিখিয়া কখনও বা অস্ফুটস্বরে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর—মুক্ত পুরুষকে সহজে চিন্‌তে পারা যায় না। মুক্ত পুরুষের ভাব ও ভাষা অত্যন্ত গভীর। অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেন। ব্যবহারও অনেক সময় এমন করেন যে, সাধারণে তাতে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। সুতরাং শ্রদ্ধাও হয় না। শাস্ত্রে আছে—যাদের শ্রদ্ধা বিকাশ পায় নাই, ধর্ম্মের জন্য তাহারা নানা গুরুর আশ্রয় লইতে পারে; যেমন, মধুকর এক পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে যায়। কিন্তু তাতে যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয় না। সময় হইলে শ্রদ্ধা আপনা আপনি বিকাশ পেতে থাকে, তখন একটা স্থানেই মন স্থির হয়। ইহা তন্ত্রের মত। উপনিষদের মত এই যে, যতদিন শ্রদ্ধা না জন্মিবে গুরুকরণ কর্‌বে না।

শ্রদ্ধা হ'লে পৈত্রিক গুরুর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। কিন্তু পৈত্রিক গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হবে শাস্ত্রে এরূপ কিছু নাই। কুলগুরুর নিকটে দীক্ষা লবে এরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু 'কুলগুরু' শব্দের অর্থ পৈত্রিক গুরু নয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যাঁর জাগ্রত হয়েছে তিনিই কুলগুরু। শাস্ত্রে আছে, শিষ্য গুরুকে এবং গুরু শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বেন। যদি উভয়ে শাস্ত্রমত লক্ষণ যুক্ত হন তবে দীক্ষা হবে। অপাত্র হইতে দীক্ষা লইলে বা অপাত্রকে দীক্ষা দিলে কোন ফল লাভ হয় না। মনু মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয়ে কিছু বলেন নাই। যিনি বেদ পড়ান, সেই আচার্য্য গুরু সম্বন্ধেই বলেছেন। বেদ উপনিষদেও আচার্য্য গুরুর বিষয়ই আছে। বেদ উপনিষদে যাহা আছে তাহা শুধু ব্রাহ্মণের জন্য। মন্ত্র দাতা গুরুর বিষয় তন্ত্রে, সনৎকুমার সংহিতায়, গৌতম সংহিতায় ও নারদ পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে আছে।

যদি স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হয়, তবে সেই গুরুবংশের কাকেও উপগুরু ক'রে, তাঁর নিকট হ'তে সমস্ত পূজা পদ্ধতি শিক্ষা ক'রে পুরশ্চরণ কর্‌লে উপকার হয়। ইহা দেশাচার, শাস্ত্রশাসন নয়। আজকাল শাস্ত্রমত দীক্ষা হয় না। সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষা লইতে কোন বিচার নাই। দিন-ক্ষণ কিছুই দেখ্‌তে হয় না। কোন লক্ষণ দ্বারা সদ্‌গুরু চিন্‌তে পারা যায় না। অনেক জন্ম সাধন ভজন কর্‌লে, উপযুক্ত সময়ে ভগবৎকৃপায় সদ্‌গুরু চিন্‌তে পারা যায়। গুরুলাভ না হলেও ব্যবস্থা মত চল্‌তে হয়। শাস্ত্রমত চল্‌লে ঠক্‌তে হয় না।

গুরুতে বিশ্বাস হলেই ধর্ম্মলাভ হয়। কিন্তু তাতো আর সহজে হয় না। ধর্ম্ম সাধন কর্‌লে, অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন সেইরূপ কর্‌লে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মে। যতদিন অন্তরে সংশয় আছে ততদিন তার কার্য্য হবেই। যেমন কাম, ক্রোধ, লোভাদি ভিতরে থাক্‌লে, কিছুতেই তা অতিক্রম করা যায় না, সংশয়ও সেইরূপ। ইহা আত্মার একটী অবস্থা। একমাত্র নাম জপ দ্বারা আত্মার সমস্ত পাপ সংশয় নষ্ট হবে। তখন বিশ্বাস আপনা হতেই আস্‌বে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই উপায়।

যিনি যেভাবে ধর্ম্মাচরণ কর্‌ছেন—করুন। আমি কাকেও নিন্দা কর্‌ব না, বরং যদি কিছু প্রশংসার থাকে তাই বল্‌ব। ভগবান্‌ কর্ত্তা, তিনি কাকে কি ভাবে উদ্ধার কর্‌বেন, আমি তার কি জানি? ইহা মনে করে চুপ করে থাকাই ভাল। ধর্ম্মার্থীদের কখনও কারোকে কোনও বিষয় লইয়া পরিহাস করা ঠিক নয়। পরনিন্দা সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। প্রত্যেকেরই মধ্যে কিছু না কিছু গুণ আছে। দোষের অংশ ত্যাগ করে, গুণের অংশ গ্রহণ কর্‌বে। তাতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। দোষের আলোচনা কর্‌লে, আত্মা অত্যন্ত মলিন হয়। কারও দোষের আলোচনা কর্‌লে, ক্রমে সেই দোষ নিজের মধ্যে এসে পড়ে। বিদ্বেষ পূর্ব্বক এক জনকে অপরের নিকট হেয় কর্‌বার জন্য, যে কোন কথা বা ভাব প্রকাশ করা হয়, তাহাই পরনিন্দা। বিদ্বেষপূর্ব্বক সত্য কথা বল্‌লেও পর নিন্দা হয়। যাহা কারও উপকারার্থে

বলা যায়, তাহা পরনিন্দা নয়। যেমন, পিতা দোষের কথা বলেন। কারও দোষ বল্‌তে হলে, কেবল তার উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই বল্‌তে হবে; কারও প্রাণে আঘাত না লাগে, এমনভাবে বল্‌তে হবে। ধর্ম্ম জীবন লাভের পক্ষে পরনিন্দা যত অনিষ্ট করে, কাম ক্রোধাদি কিছুতেই তত করে না।

মাতালের আনন্দে ঠাকুরের আনন্দ।

ভাগবত পাঠের পর অপরাহ্ন প্রায় সাড়ে তিনটার সময়ে একটী মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোক মদ খাইয়া, নেশায় টলিতে টলিতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। জড়িতস্বরে —"সাধু দর্শন কর্‌তে এসেছি—সাধু কৈ?" পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। পাছে আমরা তাহাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেই, বোধ হয় এই জন্য, উহার কথা শুনিয়াই, ঠাকুর উহাকে ঘরে নিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা উহাকে পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুরকে দেখিয়া মাতালের মহাস্ফূর্ত্তি হইল। সে অনায়াসে ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া, হাত মুখ নাড়িয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। ঠাকুরের সহানুভূতিসূচক মৃদু মৃদু হাসি এবং ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দেওয়া দেখিয়া, মাতালের উৎসাহ আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে ক্রমে ঠাকুরের আসন ঘেঁসিয়া বসিয়া কত কি বলিতে লাগিল। এক একবার হাসিতে হাসিতে ঠাকুরের কোলের উপরে পড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর তাহার মাথায় গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এসব কাণ্ড দেখিয়া, আমরা অতিশয় বিরক্ত হইলাম। আমাদের ভিতরে বিরক্তি ও ক্রোধের জ্বালা উপস্থিত হইল। কিন্তু কি করিব? ঠাকুর উহাকে লইয়া আনন্দ করিতেছেন, আমাদের কিছু বলিবার যো নাই। অবশেষে মাতাল হাসিতে হাসিতে ঠাকুরের উরু ও আসনের উপরে বমি করিয়া ফেলিল। তখন আর ঠাকুরের অনুমতির কোন অপেক্ষা না করিয়া, উহাকে টানিয়া বাহিরে নিলাম; এবং একেবারে রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম।

ঠাকুরকে বলিলাম—মদখোর মাতালকে ত শাসনই কর্‌তে হয়। ওকে লইয়া আপনি এত আনন্দ কর্‌লেন কেন?

ঠাকুর আমার দিকে কিছুক্ষণ ছল ছল চোক্ষে চাহিয়া রহিলেন। পরে অস্ফুট স্বরে বলিলেন—সংসার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। সকলেরই মুখ বিমর্ষ। কারও মুখে

একটু হাসি নেই, প্রাণে আনন্দ নেই। মদখোর মাতালকেও যদি প্রাণ খুলে হাস্‌তে দেখি, একটু আনন্দ কর্‌তে দেখি, বড় আরাম পাই—আনন্দ হয়।

একটী গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—মাতালকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং কোন নেশাখোরকে দান করা কি উচিত?

ঠাকুর—যারা নেশাখোর, না খেয়ে থাক্‌তে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণা পায়, তাদের যদি কেহ কিছু না দেয়, চুরি কর্‌বে। ভগবান্ কি করেন? তিনি মাতালের মদ, এবং বেশ্যারও উপপতি জুটায়ে দেন।

ভক্তি কিসে হয়? জ্ঞানদ্বারা কি ভগবান্‌কে লাভ করা যায়?

কয়েকটী ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভক্তি কিসে হয়? আমাদের ভক্তি হয় না কেন?

ঠাকুর—নিজকে অভক্ত, দীন হীন, কাঙ্গাল মনে ক'রে যদি ভগবানের চরণে প'ড়ে থাকেন, তা হলে ভক্তি দেবী অবশ্যই কৃপা কর্‌বেন। কিন্তু, আমি ভক্ত, এই অভিমান যেখানে, ভক্তিদেবী সেখানে গমন করেন না। যাহা দ্বারা ভগবান্‌কে ভজনা করা যায়, তাহাই ভক্তি। সাধকগণ এই ভক্তিকে বৈধী ও অহৈতুকী, এই দুই ভাগ করেছেন। বৈধী ভক্তি চারি প্রকার—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। অভক্তি, শুষ্কতা, পাপ তাপ এ সকলে প্রাণটিকে যখন কাতর ক'রে ফেল্‌বে, ভগবানের নাম লইতেও অবিশ্বাস হবে, সেই সময়ে দীনহীন কাঙ্গালের মত করযোড়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা, তাঁর নাম করা—ইহাই প্রকৃত আর্ত্ত ভজন। শুষ্কতায় ও অবিশ্বাসে নাম লইলেও তাহা বৃথা হয় না। তিক্ত ঔষধ বিরক্তির সহিত সেবন কর্‌লেও রোগের শান্তি হয়। ভগবানের নামে পাতকী উদ্ধার হয়, ইহা বস্তুগুণ। বস্তুগুণ কিছুর অপেক্ষা করে না। অগ্নিতে হাত দিলে পুড়্‌বেই। অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রে ভগবান্ কি প্রকার সুশৃঙ্খলায় যথানিয়মে চালাচ্ছেন, ভাব্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। প্রত্যেকটী পদার্থে দৃষ্টি কর্‌লে সমস্তেরই তত্ত্ব অসীম ব'লে বোধ হয়। সমস্তেরই নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনও আছে। আমরা একটু

ঝড়-তুফান, গ্রীষ্ম-বর্ষার আধিক্য দেখ্‌লেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে অতিক্রম ক'রে বিচার করি। অসন্তোষ প্রকাশ করি। ইহার মূলে অবিশ্বাস, অবিশ্বাসের মূলে স্বার্থ, পরনিন্দা, হিংসাদ্বেষ; ইহা হতেই যত দুর্গতি উপস্থিত হয়। এ জন্য ধার্ম্মিকের একটী প্রধান লক্ষণ—তিনি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না। আত্ম প্রশংসা বিষতুল্য মনে করেন। হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না। ভগবানের কার্য্যে অবিশ্বাস হলেই অসন্তোষ। মনুষ্যের জ্ঞানে সৃষ্টবস্তুরই বিচার করা যায়, ভগবত্তত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানের অধীন নয়। ঋষিরা এজন্য পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা—এই দুইভাগে জ্ঞানকে বিভক্ত করিয়াছেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতো হন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

বাক্য, মন অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠ গুরু হতেই তাঁকে লাভ করা যায়; তদ্ভিন্ন অন্যত্র তাঁকে পাওয়া যায় না। মানুষ ক্ষুদ্র কীট, তার এত অভিমান যে, সে ভূমা ঈশ্বরকে জান্‌বে! কখনই নয়! মানুষের জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানা তো দূরের কথা, নিজের শরীর ছাড়া আত্মাকেও জান্‌তে পারে না।

মাতৃদেবীর পুঁথির শ্রোতা আমি।

মাতাঠাকুরাণী আমলকী দ্বাদশীর ব্রত করিবেন। তাঁহার আদেশ মত ঠাকুরের সম্মতিক্রমে

২৬শে—২৯শে পৌষ। ইং ১৮৯৩।

বাড়ী পৌছিলাম। মেজদাদা ছোটদাদাও শীঘ্রই বাড়ী আসিবেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠান সাধারণ নয়। সমারোহ খুবই চলিয়াছে। আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধব যেখানে যিনি আছেন, অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। পৌষ মকরসংক্রান্তির দিন হইতে পুঁথি পাঠ আরম্ভ হইবে। শ্রোতা কে হইবেন, তাহা এখনও ঠিক্ হয় নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধ, রামায়ণ অথবা মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ অপেক্ষা একখানা সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করাই ভাল; ইহা ভাবিয়া, আমি অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠের প্রস্তাব করিলাম। মা এবং আর আর সকলে তাহাই সঙ্গত মনে করিলেন। শ্রোতা কে হইবেন তাহা লইয়াও আলোচনা চলিতে লাগিল। জ্যেঠা মহাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি শ্রোতা

হউন্, মাতাঠাকুরাণীর এরূপই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। শ্রোতা যিনি হইবেন, তিনি ব্রতীর প্রতিনিধিরূপে সংযত হইয়া পুঁথি শুনিবেন। শ্রবণফল তাহার কিছুই হইবে না। ব্রতীরই হইবে। সুতরাং মা'র প্রতিনিধি করিয়া তাঁহাকে শ্রবণফলে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা হইল না। সকলের সম্মতিক্রমে আমিই শ্রোতা হইব, স্থির হইল।

ধর্ম্মের ভাণে বিপরীত বুদ্ধি। স্বপ্ন—দুর্দ্দশার একশেষ।

কিছুকাল যাবৎ ধর্ম্মের ভাণে বিপরীত বুদ্ধি হওয়ায় আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। মনে হইয়াছিল—ভগবান্ গুরুদেবের কৃপাতেই যাবতীয় অবস্থা লাভ হয়; সুতরাং সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া, একান্তপ্রাণে, কাতরভাবে, তাঁর কৃপাপ্রার্থী হইয়া পড়িয়া থাকাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বকার্য্যের যিনি নিয়ন্তা, তাঁহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করা এবং নিজেই চেষ্টার দ্বারা কোন অবস্থা লাভ করিব, এই প্রকার অভিমানে সাধন ভজন করা, গুরুদ্রোহিতা বৈ আর কিছুই নয়। কিছুদিন যাবৎ এই বুদ্ধিতে আমি ঠাকুরের প্রীতিকর আদেশ প্রতিপালনেও উদাসীন হইয়া রহিয়াছি; এবং সাধন ভজন, তপস্যা সংযমাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে এখন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুরের আদেশ মত চলিয়া, যে সকল অদ্ভুত অবস্থা লাভ করিয়াছিলাম, আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, এখন তাহা হারাইয়াছি। কিন্তু আমার অবস্থা যতই হীন হউক না কেন, ঠাকুরের কৃপা-লব্ধ একটী অবস্থার দিকে তাকাইয়া নিজেকে বড়ই অসাধারণ ভাগ্যবান ভাবিয়াছিলাম। ভজনশীল সাধননিষ্ঠ গুরুভ্রাতারা যে কামরিপুর উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া হাহাকার করিতেছেন, তাহার অণুমাত্র অস্তিত্বও আমার দেহে নাই, এমন কি, উহা যে আর কখনও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে তাহাও মনে হইত না। সুতরাং নানা দুরবস্থা স্বত্বেও সাধারণ গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুর আমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছেন, এই প্রকার ধারণা আমার অন্তরে নিয়ত বদ্ধমূল ছিল। ঠাকুর আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—**এসব অবস্থার কথা কোথায়ও প্রকাশ ক'রো না, প্রকাশ করলে থাকে না—নষ্ট হয়ে যায়।** কিন্তু গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথার স্রোতে পড়িয়া, ঠাকুরের আদেশ একবারও মনে আসে নাই। আবার কখনও কখনও মনে হইলেও ভাবিয়াছি, যাহা মূল সহিত একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কি প্রকারে? ফলে, কথায় বার্ত্তায় অনেকেরই নিকটে আত্মদম্ভের পরিচয়ও দিয়াছি। গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করা এবং অন্ধ অহঙ্কার বশে তাঁর কৃপার দানকে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বলিয়া মনে করা, এই দুইটী

গুরুতর অপরাধে ঠাকুর আমাকে প্রশ্রয় দিবেন কেন? তাই, দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া আশ্চর্য্য প্রকারে আমার যথার্থ দুরবস্থা এখন বুঝাইয়া দিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখিলাম—কতকগুলি পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া, আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং সম্মুখে আসিয়া পাশ কাটিয়া সহাস্যমুখে চলিয়া যাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ছবির ছায়ারও এতই অনিবার্য্য প্রভাব যে, তাহাতে আমার চিত্তটিকে একেবারে আবরণ করিয়া ফেলিল, মন হইতে উহা কোন প্রকারেই দূর করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় দিন আবার ইহা অপেক্ষাও মনোহর চিত্র দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। ক্রমশঃ ইহাই এখন আমার স্মরণ, মনন ও সম্ভোগের বিষয় হইয়া পড়িল। বাড়ীতে থাকিয়া এইরূপ দুঃসহ দুর্দ্দশার ফলে অহর্নিশি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া একান্তপ্রাণে ঠাকুরকে জানাইলাম—ঠাকুর! এখন আমি কি উপায়ে রক্ষা পাই? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

স্বপ্নে আদেশ।

২৮শে পৌষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম। আমার দীক্ষাকালে ঠাকুরকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ পবিত্রমূর্ত্তি, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, দীর্ঘাকৃতি, মুণ্ডিত মস্তক গুরুদেবই যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ঈষৎ হাস্যমুখে আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে নমস্কার করা মাত্রই জাগিয়া পড়িলাম। ইহার একটু পরেই পুনরায় নিদ্রাভিভূত হইলাম। তখন শুনিলাম, ঠাকুর আমাকে বলিতেছেন—বাক্যদ্বারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়, মৌনী হও। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম—তাইত! এ কি শুনিলাম? ও কথাইবা কেন বলিলেন? বাক্যদ্বারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়—কথাটি সুন্দর ও নূতনও বটে; কিন্তু ইহার অর্থ কি? বিষয়ালাপ, দোষালোচনা ও মিথ্যাবাক্যদ্বারা জিহ্বা দূষিত হইতে পারে; তা ছাড়া বাক্যের আর কি দোষ আছে? স্বপ্ন দর্শনের পর আর একটী বিশেষ আশ্চর্য্য ঘটনা এই দেখিতেছি যে, জটামণ্ডিত, স্নিগ্ধ প্রসন্নমূর্ত্তি, স্থূল কলেবর গুরুদেবের বর্ত্তমান যে বিরাট রূপ প্রতিনিয়ত আমার স্মৃতিপথে প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশমান ছিলেন, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এখন স্বপ্নদৃষ্ট সেই পূর্ব্ব রূপই সর্ব্বদা চক্ষের উপর ভাসিতেছে। ঠাকুরের বর্ত্তমান রূপ কিছুতেই আর মনে আনিতে পারিতেছি না। স্বপ্নশ্রুত ঠাকুরের বাক্যের ও এই রূপান্তরের তাৎপর্য্য কি, ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল—সদ্‌গুরু ও মহাপুরুষদের বাক্য-তাৎপর্য্য, আমাদের ব্যাকরণ,

অভিধান অথবা পার্থিব বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা বোধগম্য করা যায় না। মহাপুরুষেরা দয়া করিয়া যাঁহার প্রতি উহা প্রয়োগ করেন, তিনি যাহা বুঝেন, সাধারণতঃ তাহাই ঐ বাক্য ও কার্য্যের যথার্থ তাৎপর্য্য। কারণ, মহাপুরুষদের চেষ্টা বা কার্য্য কখনও ব্যর্থ বা অনর্থক হয় না। তাঁহারা যাঁহাকে যাহা বুঝাইতে ইচ্ছা করেন, মহাপুরুষদের কৃপাতে তিনি তাহাই বুঝেন। স্বপ্ন দর্শনে আমার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে যে ঠাকুরের ইচ্ছা, আমি মৌনী হই, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া, সংযতভাবে ঠাকুরের তীব্র তপস্যান্বিত সেই তমোনাশক উজ্জ্বল পাবন মূর্ত্তির ধ্যানে অনুক্ষণ তন্ময়ভাবে অবস্থান করি। ইহা স্থির করিয়া পরদিন প্রাতে মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক স্নানান্তে মৌন ব্রত অবলম্বন করিলাম। নির্জ্জন সাধন কুটীরে থাকিয়া বারংবার একান্ত প্রাণে ঠাকুরের বর্ত্তমান সস্নেহ স্নিগ্ধমূর্ত্তি স্মৃতিতে আনিতে বহু চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহা আর মনে আসিল না। ৫।৬ ঘণ্টা ক্রমাগত এই চেষ্টা করিয়া অবশেষে হয়রান হইয়া পড়িলাম। মাথা ধরিয়া গেল; প্রাণের অসহ্য জ্বালায় 'হা হুতাশ' করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের সেই মুণ্ডিত মস্তকরূপই চিত্তে উদিত হইতে লাগিল। অগত্যা তাহারই ধ্যানে মনোনিবেশ করিলাম।

আগন্তুক আত্মীয় স্বজনেরা আমার সহিত আলাপাদিতে কত আনন্দলাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। আমাকে মৌনী দেখিয়া, তাঁহারা কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। আমারও প্রাণে খুব কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিব? ঠাকুরের অভিপ্রায় মনে করিয়া, সঙ্কল্পমত মৌন ব্রতে স্থির হইয়া রহিলাম। মাতাঠাকুরাণী আমার কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দিলেন না।

ব্রতসাঙ্গ। মার প্রতি ঠাকুরের কৃপা।

২৯শে পৌষ মকর সংক্রান্তির দিন হইতে মাতাঠাকুরাণীর আমলকী দ্বাদশীর ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। এই ১৭।১৮ দিন কি ভাবে যে চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। বহুলোকের সমাবেশে বাড়ীতে এতদিন নিয়তই যেন একটা উৎসব-সমারোহ লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর শ্রীপঞ্চমী, মাঘীসপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য তিথিগুলির সংযোগে, সকলেরই অন্তরে অবিরাম আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছে। পাড়ার ও সমীপবর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ প্রত্যহই অপরাহ্নে পুঁথি শ্রবণ করিতে উপস্থিত হইতেন। গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক পুরুষই রামায়ণ শ্রবণে পরম

২৯শে পৌষ হইতে ১৭ই মাঘ।

তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শুদ্ধ, সদাচারী ব্রাহ্মণের মুখে ভক্তিভাবে রামায়ণের ব্যাখ্যা শুনিয়া কি যে আনন্দলাভ করিলাম বলিতে পারি না। ভগবৎ প্রসঙ্গের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে এতদিন যেন মুগ্ধ হইয়া কাটাইলাম। আজ মাতাঠাকুরাণীর ব্রত-সাঙ্গ হইবে। সকাল বেলা হইতেই সকলে উৎসাহের সহিত স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাহির বাটীর অঙ্গনে ব্রত-সম্ভার সমস্ত যথাসময়ে সুসজ্জিত হইল। পবিত্র বেদীতে শালগ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক বৃদ্ধ পুরোহিত পূজায় বসিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরাদি বিবিধ বাদ্য চারিদিকে বাজিয়া উঠিল। মহিলারা দলে দলে মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধূপ-ধূনা, গুগ্‌গুল্ চন্দনাদির সুগন্ধে বাড়ীটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দীনহীনা কাঙ্গালিনীর মত মাতাঠাকুরাণী শালগ্রামের পানে তাকাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দর্শক মণ্ডলী চতুর্দ্দিকে থাকিয়া ব্রত পূজা দেখিতে লাগিল। সাত্ত্বিক ভাবে সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময়ে মনে হইল, যেন ব্রতাধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রতস্থলে আবির্ভূতা হইয়া মাতাঠাকুরাণীকে প্রসন্নভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর দয়াময় শ্রীভগবান্ ভক্তের যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণে লালায়িত ও সমুৎসুক, ইহা স্মরণ হওয়া মাত্র আমার কান্না পাইল। আমি সাষ্টাঙ্গ হইয়া একান্তপ্রাণে প্রার্থনা করিলাম—"ঠাকুর! দয়া করিয়া আমার মাকে তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও।" ব্রত যথাসময়ে সাঙ্গ হইল। মাতাঠাকুরাণী ব্রতফল ভগবানের চিরশরণ অভয় শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

পাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী ৫।৬ টী গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সমাদরের সহিত ভোজন করান হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দলে দলে লোক আসিয়া, পরম আহ্লাদের সহিত ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অপরাহ্নে পুঁথিপাঠ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মাসিমাতাঠাকুরাণী আসিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন—"ওরে গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—তুই কথা বলেছিস্—তোর মৌন ভঙ্গ হইয়াছে।" সে কথায় কোন আস্থা না দেখাইয়া, পুঁথি পাঠ শুনিতে অবহিত হইলাম। অতঃপর পাঠক মহাশয় শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আনিয়া, সিংহাসনে বসাইয়াই পুঁথি শেষ করিতে উদ্যোগ করিলেন। আমি ভাবিলাম, এরূপ হইলে বড়ই অসঙ্গত হইবে। অগত্যা তখন বাধ্য হইয়াই আমি মৌন ভঙ্গ করিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলাম—"বৈকুণ্ঠেশ্বরকে মর্ত্ত্যভূমি অযোধ্যায় আনিয়া রাজা করিয়া রাখিলেও নির্ব্বাসন দণ্ড হয়।" পাঠক মহাশয় আমার কথা বুঝিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন, এবং তথায় সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক আনন্দসূচক জয়ধ্বনি করিয়া পুঁথি শেষ করিলেন।

আমিও শ্রুতিফল মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি মত ঠাকুরেরই শ্রীচরণে সমর্পণ পূর্ব্বক ধন্য হইলাম।

রামায়ণ শ্রবণে বিবিধ সঞ্চারী ভাব।

এই সতর আঠার দিন রামায়ণ শ্রবণ কালে, ঠাকুর আমাকে যে কি ভাবে কৃপা করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। পাঠারম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একান্ত প্রাণে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহারই এই অতীত লীলা শ্রবণ করিতে আহ্বান করিতাম। মনে হইত তিনি আসিয়া, শালগ্রামে অধিষ্টান পূর্ব্বক শ্রুতিসুখকর আপন নির্ম্মল অপূর্ব্ব চরিতাখ্যান শ্রবণ করিতেছেন। ঠাকুরের সুস্নিগ্ধ নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম অপরূপ রাম কলেবর ধ্যান করিয়া চিত্ত আমার তাঁহার চরণে একান্ত রূপে সংলগ্ন হইয়া পড়িত। এই সময়ে দয়াল ঠাকুর আমার ভিতরে নানা ভাবের সঞ্চার করিতেন। কখনও ঋষিগণের, কখনও ভক্তরাজ হনুমানের, কখন লক্ষ্মণের কখন কৌশল্যার এবং কোন সময়ে বা সীতার ভাব সঞ্চার করিয়া, আমাকে তাহাতে একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়া ফেলিতেন। বাহ্য স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া তৎকালে ঐ ভাবেই মগ্ন হইয়া থাকিতাম। পাঠ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তৈল ধারার মত অবিরল অশ্রু বর্ষণ হইত।

বউদের গেণ্ডারিয়া যাওয়া ও দীক্ষা। ঠাকুরের উপদেশ।

সকাল বেলা উঠিয়াই ঢাকা যাত্রা করিবার যোগাড় করিতে লাগিলাম। মেজ-বধূঠাকুরাণী আসন্নপ্রসবা। নয় মাস গর্ভ অতীত হইয়াছে। তিনি আমার সঙ্গে পিতা মাতার নিকটে ঢাকা যাইবেন। আমি ভাবিলাম, এই সঙ্গে ছোট দাদার ও রোহিণীর স্ত্রীকেও ঢাকা লইয়া যাইতে পারিলে বড় সুবিধা হয়। ঠাকুরের নিকটে ইহাদিগকে দীক্ষা দেওয়াতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। অভিভাবকেরা সকলেই ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লওয়ার বিরোধী। জানিতে পারিলে কখনই ঢাকা যাইতে অনুমতি দিবেন না। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে না বলিয়াও পারিব না। সুতরাং এ অবস্থায় উঁহাদিগকে লুকাইয়া বা জোর করিয়া না নিয়া গেলে উপায় নাই। এইরূপ ভাবিয়া আমি পাল্কীওয়ালাদের পাল্কী আনিতে খবর দিলাম। কাকারা জানিতে পারিয়া তাহাদের ধমকাইয়া তাড়াইলেন। ইহা লইয়া পাড়ার মুরুব্বি ও অভিভাবকদের সঙ্গে আমার বিষম ঝগড়াও হইল। অবশেষে আহারান্তে সকলে যখন বিশ্রাম করিতে

২১শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

গেলেন, পাল্কী ও বেহারা আনিয়া বউদের লইয়া আমি উর্দ্ধশ্বাসে সন্ধ্যার সময় গিয়া সেরাজদিঘা পঁহুছিলাম, এবং সেখান হইতে বড় একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া ছোটদাদার সঙ্গে বউদের লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলাম। সারারাত্রি বেশ সুনিদ্রায় আরামে কাটাইয়া, ভোর বেলা ঢাকা কলঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মেজবৌঠাকরুণের শরীর অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বেদনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভাবিলাম, এবার বিপদ ঘটিল! এখন এঅবস্থায় কোথায় যাই? তাঐ মহাশয়ের বাসায় গেলে আর গেণ্ডারিয়ায় আসা হইবেনা। অথচ এদিকে বৌঠাক্‌রুণের অবস্থা দেখিয়াও মনে হয়, প্রসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। কি করি? কোথায় যাই? বড়ই বিপন্ন হইয়া কাতর ভাবে ঠাকুরেকে স্মরণ করিতে লাগিলাম।

২২শে মাঘ, শুক্রবার।

মাতাঠাকুরাণীর ব্রতসাঙ্গের প্রণামী দশটী টাকা ও দধি ক্ষীরাদি ছোটদাদার দ্বারা ঠাকুরের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। দীক্ষা দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে এইভাবে বউদের আনিয়া নৌকায় রাখিয়াছি, ঠাকুরকে ইহাও জানাইতে বলিয়া দিলাম। ছোটদাদা গেণ্ডারিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বউদের লইয়া, নৌকায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। দীক্ষা প্রার্থীদের সচরাচর ঠাকুরের নিকটে প্রথমে দীক্ষা প্রার্থনা করিতে হয়, তারপর ঠাকুর দয়া করিয়া সম্মতি দিলে, কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহাদের উপস্থিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমি ঠাকুরকে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র না জানাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় বা আদেশের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া, ইহাদিগকে দীক্ষা দেওয়াইতে আনিয়াছি। ঠাকুর কি বলিবেন, জানিনা। বড়ই দুশ্চিন্তা ও ভয় হইল। একান্তপ্রাণে ঠাকুরকে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলাম। যাহা হউক, এদিকে ছোটদাদা ঠাকুরের নিকটে পঁহুছিয়া, আমার সমস্ত কথা জানাইলে, ঠাকুর যেন একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—যাও, **শীঘ্র তাঁদের আশ্রমে নিয়া এস বিলম্ব ক'রো না। এখনই দীক্ষা হবে।** ছোটদাদা ফিরিয়া আসিয়া আমাকে এই খবর দেওয়া মাত্রই আমি সকলকে লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর তখন চা সেবা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—**কি? তুমি আসন্নপ্রসবা বউকেও দীক্ষা দেওয়াতে নিয়ে এসেছ? এ অবস্থায় যে দীক্ষা হয় না, তুমি জান না?**

আমি বলিলাম—আমি জানি। আপনি দয়া ক'রে গর্ভস্থ সন্তানকেও শক্তিসঞ্চার করবেন, এই আকাঙ্ক্ষাতেই তাঁকে এ অবস্থায়ও এনেছি।

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—বউদের প্রস্তুত থাকতে বল, আমি চা খেয়ে নেই। এখনই দীক্ষা হবে।

বউরা প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর চা-সেবার পর আপন কুটীরে যাইয়া বসিলেন বউদিগকে লইয়া গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসাইলাম। স্থানাভাব বশতঃ কেহ ঐ ঘরে স্থান পাইলেন না। ঠাকুর আমাকে তাঁর বামপার্শে বসিতে বলিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ গুরু ওঁ গুরু ওঁ বলিয়া নীরব হইলেন। পরে উপদেশ দিতে লাগিলেন—(উপদেশের সংক্ষিপ্ত সারাংশ)

১। সত্য কথা বল্বে। মিথ্যা কথা বল্বে না।

২। সর্ব্বজীবে দয়া কর্বে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সকলেরই প্রতি দয়া কর্বে।

৩। পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। রামকৃষ্ণের মত তাঁদের সেবা পূজা কর্তে হয়। তা হ'লে সহজেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। তা না পার্লেও পিতামাতাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি কর্তে হয়, সর্ব্বদা তাঁদের বাধ্য হ'য়ে চল্‌তে হয়।

৪। অতিথি-সেবা কর্বে। উপযুক্ত আহারাদি দিয়া সেবা কর্তে না পার্লেও, অগত্যা একখানা আসনে বসিয়ে একগ্লাস জলও দিতে হয়, দুটী মিষ্টি কথা ব'লে বিদায় কর্তে হয়। অতিথি রুষ্ট হ'য়ে গৃহ থেকে না যান, এ বিষয়ে মনোযোগী হ'তে হয়।

৫। পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে পুরুষে নারায়ণ ও স্ত্রীতে লক্ষ্মীরূপে বিদ্যমান রয়েছেন। এটী ভাবের বা কল্পনার কথা নয়, সত্য কথা। পরস্পর পরস্পরকে ঐভাবে দেখে শ্রদ্ধাভক্তি কর্তে হয়। এই ভাবে চল্‌লে সে পরিবার ঋষি পরিবার হয়। অশান্তি কখনও সে পরিবারে প্রবেশ করে না।

৬। পরনিন্দা কর্বে না। বিদ্বেষপূর্ব্বক কারও মর্য্যাদা নষ্ট করার

উদ্দেশ্যে কোন প্রকার চেষ্টাই নিন্দা। বাক্যদ্বারা, কার্য্যদ্বারা, হাস্য পরিহাস দ্বারা, এমন কি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও নিন্দা হয়। এই নিন্দা নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ।

৭। মাংস আহার ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষেধ। মৎস্য আহারে নিষেধ নাই, কিন্তু মৎস্য আহারেও ক্ষতি করে। সাধনপথে উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য আহারও ত্যাগ কর্‌তে হয়। যতদিন মৎস্য আহারে প্রবৃত্তি আছে, জোর ক'রে ছাড়ার প্রয়োজন নেই। পিতামাতা, শ্বশুরশ্বাশুড়ী, স্বামী, জ্যেষ্ঠ ভাই— এঁদের ভুক্তাবশিষ্টকে উচ্ছিষ্ট বলে না; তা প্রসাদ। এভিন্ন সকলেরই উচ্ছিষ্ট বিষবৎ ত্যাগ কর্‌বে।

৮। গুরু যে মন্ত্র দেবেন তা কোথাও প্রকাশ কর্‌বে না। প্রকাশ কর্‌লেই তার শক্তি হ্রাস হ'য়ে যায়। মাটির নীচে যেমন বীজ থাকে, ইষ্টমন্ত্রও সেই প্রকার হৃদয়ে গোপনে রাখ্‌তে হয়।

৯। শরীর-মন-শুদ্ধির জন্য দুবেলা অন্ততঃ একবার প্রাণায়াম কর্‌বে। এটীও খুব গোপনে কর্‌বে। অন্যে না জানে।

বড়দাদা ছোটদাদা যে নাম পাইয়াছেন, বউরাও তাহাই পাইলেন। বেলা প্রায় ২ টার সময়ে দীক্ষা শেষ হইয়া গেল। মেজ বৌঠাকুরুণের প্রাণায়াম খুব ভাল হইল; দীক্ষার পরই তাঁর শরীর অতিশয় কাতর হইয়াছিল। তিনি পিত্রালয়ে যাইতে অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু দিদিমা আহার না করিয়া যাইতে দিলেন না। বেলা প্রায় ৩ টার সময়ে উঁহারা সকলে লক্ষ্মীবাজার তাঁএ মহাশয়ের বাসায় গেলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

শালগ্রাম ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি। মহাপুরুষদের বিচরণকাল। তাঁদের কৃপা উপলব্ধির উপায়।

২৩শে মাঘ, শনিবার।

ঠাকুর আমাকে শালগ্রাম পূজা করার আদেশ করার পর হইতে দিন দিনই আমার শালগ্রামের জন্য উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে কিন্তু কখনও শালগ্রামের কল্পনাও ত করি নাই। অযোধ্যা হইতে আমার জন্য শালগ্রামের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি আসিয়াছে। উহা দেখিয়াই আমার ব্রহ্মতালু

জ্বলিয়া গেল। আমি উহা ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম—দাদার একটী বন্ধু বুঝিতে না পারিয়া, শালগ্রাম না পাঠাইয়া, এই লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি পাঠাইয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন—তা তোমার যদি ইচ্ছা হয় উহাই পূজা করতে পার।

আমি সোজা বলিলাম—আমার মূর্ত্তিপূজা করতে একেবারেই ইচ্ছা নাই।

ঠাকুর—বেশ, পিতলের বা অন্য কোন ধাতুগঠিত মূর্ত্তি পূজা ক'রো না। লক্ষণযুক্ত স্বাভাবিক শালগ্রাম পূজা করো। এদিক্ ওদিক্ ঘুরে অনেক চেষ্টা অনুসন্ধান করতে হয়, তবে তো জোটে।

আমি—ঠাকুরের পূজা যে শিলাতে করব, তা সুশ্রী না হ'লে তৃপ্তি হবে না এজন্য লক্ষণযুক্ত হ'লেও বিশ্রী শিলা পূজা করতে পারব না।

ঠাকুর—না, না, তুমি লক্ষণযুক্ত খুব সুশ্রী শালগ্রামই পাবে; তাই পূজা করো।

একটী গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর রাখতে ইচ্ছা হয়—রাখতে পারি কি?

ঠাকুর—হাঁ, খুব পার। তবে ওসব পূজা না ক'রে রাখা ঠিক নয়। সেবা পূজা ভোগাদির সুব্যবস্থা ক'রে ওসব ঠাকুর রাখতে হয়। সেরূপ না করলে রাখতে নাই।

প্রশ্ন—কোন কোন সময়ে সাধন করলে মহাপুরুষদের কৃপা লাভ করা যায় ও বুঝা যায়?

ঠাকুর—রাত্রি একটার পর মহাপুরুষেরা বাহির হন। একটা হ'তে চারটা পর্য্যন্ত তাঁরা বিচরণ করেন। ঐ সময়ই সাধনের প্রশস্ত সময়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ ধ'রে একটা স্থানে ব'সে কিছুদিন নাম করলে, মহাপুরুষদের কৃপা বুঝা যায়। কয়েকবার প্রাণায়াম ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সে নাম করতে হয়। বিছানায় ব'সে মশারির ভিতরে থেকে নাম করলেও চলে—কোন ক্ষতি হয় না। নাম করার সময়ে মহাপুরুষেরা সাম্‌নে এসে দাঁড়ান, এবং সাহায্য করেন। তখন তাঁদের গাত্রগন্ধ পাওয়া যায়। ধূপ ধূনা-গুগ্‌গুল্ চন্দনাদির গন্ধ, কখনও পবিত্র হোমধূমের গন্ধ, কখনও বা গাঁজা

লবাঙ্গের গন্ধ ও সুগন্ধি ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। কখনও তাঁদের দর্শনে, কখনও বা তাঁদের বাণী শ্রবণেও তাঁদের জানা যায়। নানাপ্রকারে মহাপুরুষেরা কৃপা করেন ও নিজেদের পরিচয় দেন।

দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণ করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর কহিলেন—যদি সাধন গ্রহণের জন্য চিত্ত বাস্তবিকই ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, তা হলে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। লোকের নিকটে শুনে প্রবৃত্তি হ'লে ঠিক নয়। সামান্য বস্তু ক্রয় কর্‌তে হলেও কত দেখে শুনে গ্রহণ করে। যিনি সাধন গ্রহণ কর্‌বেন তাহা শাস্ত্র-সদাচার সম্মত কি না বিশেষ রূপে অবগত হ'য়ে তবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁর নিকটে সাধন গ্রহণ কর্‌বেন তাঁর সঙ্গ, কিছুকাল ধ'রে কর্‌তে হয়। সাধন গ্রহণের পূর্ব্বে গুরুর উপরে শত সন্দেহ হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধন গ্রহণের পর একটী ঘটনাতেও গুরুর উপরে সন্দেহ জন্মিলে বিশেষ ক্ষতি হয়। এই জন্যে বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জেনে শুনে, তবে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হয়।

ঠাকুরের আদেশ বুঝা শক্ত। এ বিষয়ে নানা প্রশ্নোত্তর।

মাতাঠাকুরাণীর ব্রতোপলক্ষে ১৭ দিন যে মৌনী ছিলাম তাহা বারংবার মনে হইতে লাগিল। চিত্তটি তখন নিয়তই কেমন অন্তর্ম্মুখী ছিল, সর্ব্বদাই নামে বিভোর থাকিতাম। ঠাকুরের স্মৃতি অনুক্ষণ অন্তরে জাগরূক ছিল। মৌনী হইলে আবার সেই অবস্থা লাভ হইবে ভাবিয়া মৌনী হইতে ইচ্ছা হইল। ইতি পূর্ব্বে শ্রীধর কয়েকদিন যাবৎ মৌনী হইয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই মৌনী হইলে কেন? ঠাকুর কি তোমাকে আদেশ করিয়াছেন?" শ্রীধর লিখিয়া উত্তর দিলেন—"ভাই! বাক্য অনর্থের মূল। বাক্যদ্বারা অনেকের প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি। বাক্য না বলাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত মনে স্থির করিয়া, আমি নিজ হইতেই মৌন হইয়াছি—এ গোঁসায়ের আদেশ নয়।" শ্রীধরের বাক্য আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। আমি মৌনী হইলাম। ঠাকুর আমাকে কোন কথা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করায়, তাহার উত্তর আমি ঠাকুরেরই মত ইঙ্গিতে

বা অস্ফুটস্বরে দিতে লাগিলাম। দু'চার বার এরূপ করায় ঠাকুর বিরক্ত হইয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**ওকি? ওরূপ কর্‌ছো কেন? তুমি কি মৌনী হয়েছ?** আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম—"হাঁ।" ঠাকুর বলিলেন—**মৌনী হ'লে কেন?** আমি বলিলাম—আপনি আমাকে বলেছিলেন—বাক্যদ্বারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়। মৌনী হও। ঠাকুর কহিলেন—**আমি বলেছিলাম! সে কি রকম?** আমি বলিলাম—"বাড়ীতে যখন ছিলাম, তখন স্বপ্নে একদিন আপনি আমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। তাই সেখানেই ১১ দিন মৌনী ছিলাম। তারপর মৌন ভঙ্গ হয়। আবার এখন তাই মৌনী হয়েছি।"

ঠাকুর—**স্বপ্নে আমি বলেছিলাম? আমার এই চেহারা তুমি দেখেছিলে?**

আমি আপনার এই চেহারা দেখি নাই, কিন্তু পরিষ্কার আপনারই কথা শুনেছিলাম। আমারও নিশ্চয় ধারণা হয়েছিল যে আপনিই বলিলেন।

ঠাকুর—**যিনি বলেছিলেন তাঁর চেহারা কি প্রকার দেখেছিলে? আমাকে দেখেছিলে?**

আমি—শুক্ল, শান্ত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, একটী ব্রাহ্মণ দেখেছিলাম। দেখা মাত্রই আমার নিশ্চয় ধারণা হয়েছিল, আপনি।

ঠাকুর—**আমি নই। ও তোমারই প্রকৃতি, তোমারই ভিতরের রূপ তোমার নিকটে প্রকাশ হ'য়ে ওই রকম বলেছিল।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম—হায়! হায়! আমারই প্রকৃতি আমার নিকটে ঠাকুরের ভাবে প্রকাশিত হইয়া আমাকে বিপথগামী করিল! তা হলে আর উপায় কি? আমিই যদি আমাকে ইষ্ট বুঝাইয়া অনিষ্টের পথে চালাই, তা হলে আর আমাকে রক্ষা করিবে কে? কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তা হলে তো বড় বিপদ? স্বপ্নে আপনার আদেশ যথার্থ আপনারই কি না, কি প্রকারে বুঝিব?

ঠাকুর—**স্বপ্নে আমার বর্ত্তমান রূপ দেখ্‌লে—তার আদেশই আমার আদেশ মনে কর্‌বে। তা হলেও গুরু যতকাল জীবিত থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, সে মত চল্‌তে নাই। গোলমাল সময়ে সময়ে হয়।** ঠাকুরের কথায় বুঝিলাম—তাঁহার রূপ দর্শন না করিয়া, শুধু কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য পাইয়াই ঠাকুরের বাণী মনে করা ঠিক্ নয়। আশানন্দের শিষ্যকে যে সেদিন একটী মহাপুরুষ শাসন করিয়াছিলেন

তাঁহার কণ্ঠস্বর অবিকল ঠাকুরেরই মত ছিল। সে সব কথা শুনিয়া একটী লোকও তখন উহা ঠাকুরের কথা নহে বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুতরাং ঠাকুরকে না দেখিয়া শুধু তাঁর বাণী শ্রবণ করিলে, তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিসংশয় হওয়া যায় না।

ঠাকুর কহিলেন—বীর্য্যধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত মৌনী হওয়া ঠিক নয়। এ অবস্থায় মৌনী হ'লে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। অনেকের পাথরী রোগ জন্মে। মৌনী হ'য়ো না—বাক্যসংযম কর। প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা অনুকরণ করতে গিয়ে অনেকে মারা যায়। ঠাকুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম।

নৃত্য গোপাল গোস্বামীর ঠাকুরকে পরীক্ষা।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামীর একটী কথা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল। সকালে প্রায় ৭৷৷০ টার সময়ে ঠাকুর চা-সেবা করেন। ঐ সময় নৃত্যগোপাল (ডাকনাম নেপাল গোঁসাই) গেণ্ডারিয়া আসিয়া আমতলায় ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। পরে তিনি বলিলেন—"আমি একান্ত মনে গোঁসাইয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম—গোঁসাই! তুমি যদি রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের সহিত অভেদ হও, প্রত্যক্ষ ভাবে আমাকে একটু কৃপা করিয়া পরিচয় দেও। গোঁসাই চা সেবার পর কখনও আসন হইতে উঠেন না; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি চা-সেবার পরই ধীরে ধীরে আমতলায় আসিয়া, আমার মাথায় তাঁর চরণখানা তুলিয়া দিলেন। এবং একটী কথাও না বলিয়া নিজ আসনে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায়ই আমি তাঁর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং তাঁর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করি।" নেপাল গোঁসাই রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের বড়ই কৃপাপাত্র।

২৬শে হইতে ৩০শে মাঘ।

ঠাকুরের চিঠি—তফাৎ থাকাই সার কথা।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া মহা গোলমাল লাগিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান লইয়া নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। ব্রাহ্মদের মধ্যে বহুলোক তাঁহার দৃষ্টান্ত দূষণীয় মনে করেন। সুতরাং ঠাকুরেরই মত তাঁহাকেও আচার্য্যপদে রাখিতে চাহেন না। ব্রাহ্মসমাজ নগেন্দ্র বাবুকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন; এবং অবিলম্বে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার উত্তর দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু ওবিষয়ে একখানা পত্র লিখিয়া ঠাকুরের নিকটে পরামর্শ চাহিয়াছেন। ঘটনা ক্রমে ঐ চিঠি ঠাকুরের নিকটে পঁহুছিতে বহু বিলম্ব হইল।

পত্রখানা পড়িয়া দেখা গেল, দিন কয়েক পূর্ব্বে ঠাকুর একদিন নিজ হইতে নগেন্দ্রবাবুকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে এই পত্রের উত্তর অক্ষরে অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। এই পত্র পাইয়া ঠাকুর নগেন্দ্রবাবুকে জবাব দিলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কখনও তাহা পঁহুছিত না। আমাদের অনেকে এই ঘটনা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সম্প্রতি ঠাকুরকে জেনারেল কমিটির সভ্য হইতে অনুরোধ করিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছেন। ঠাকুর ঐ পদগ্রহণে অসম্মত হইয়া তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন, যথা—তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভিতরে নাই। যাহা সত্য তাহাই জানিতে হইবে। সুতরাং যাগ-যজ্ঞ, তিলকমালা, জটা-জুট, ভস্ম, ব্রত কিছুকেই অবজ্ঞা করা যায় না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ সত্যবস্তু জানিতে কতই শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন। তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকট প্রণাম করেন। ভগবান্ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন, বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এসকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য তিনি বলেন তফাৎ থাকাই সার কথা।

ভাবুকতায় ঠাকুরের ধমক্।

একটী গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভিতরের কুচিন্তা, কুকল্পনা, সংশয় সন্দেহ কিসে যাইবে?

১লা হইতে ১৪ই ফাল্গুন।

ঠাকুর—যে নাম পেয়েছ তাতেই সব যাবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে ঐ নাম জপ কর।

গুরুভ্রাতা—তা কি আপনার কৃপা ভিন্ন হবে? আমার আর কি ক্ষমতা আছে?

ঠাকুর—ওসব ভাবুকতা ছেড়ে দাও। ওতে কোন উপকার হয় না। অধিক ভক্তি দেখালে নিজের ক্ষতি হয়। কৃপার কথা অনেক পরে। এখন কৃপা বুঝ্বার শক্তি নাই। যতদিন মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, কাম ক্রোধ, এ সমস্ত আছে, ততদিন নিজের চেষ্টা কর্‌তে হবে। এই চেষ্টাই সাধন—নাম করা। আমি পারি না—এসব কথা ভাবুকতামাত্র। যতদিন

মানুষের নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে, ততদিন ওসব কৃপার কথা কিছু না। নিজেরই পরিশ্রম কর্‌তে হবে, না হ'লে কিছু হবে না।

ভগবানে চিত্ত সমর্পণ, অচলা ভক্তি কিরূপে হয়।

একটী গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—অবিশ্বাস সন্দেহে তো সর্ব্বদাই ক্লেশ পাইতেছি। ভগবানের চরণে চিত্ত সমর্পণ, তাঁহাতে অচলা ভক্তি কিরূপে হইবে? ঠাকুর লিখিয়া কখনও বা ইঙ্গিতে জানাইলেন—শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা, ভক্তমাল এই সমস্ত গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করলে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অনুসারে অচিরে বিশ্বাস জ'ন্মে থাকে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ কর্‌লে, অনেক জন্মের সুকৃতি বলে ভগবৎ-ভজনে প্রাণে ব্যাকুলতা আসে। সেই সময়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ মত অকপটে ভজন সাধন কর্‌লে, ভগবান্ কৃপা ক'রে সাধককে আপন দাস ব'লে মনোনীত করেন, এবং তাকে দর্শন দেন। সমস্ত সুন্দর বস্তু যিনি রচনা করেছেন, সেই পরম সুন্দরের শ্রী-অঙ্গের কোন এক অংশ দর্শন কর্‌লেও মানুষ কখনই তাঁর চরণছাড়া হতে পারে না। ঋষিগণ বলিয়াছেন—প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ—আত্মাতে পরমাত্মাকে লাভ; তৃতীয় অবস্থা—ভগবৎ সম্বন্ধ, পূজা-অর্চ্চনা; এই অবস্থায় তাঁর রূপ দর্শন হয়! সেই রূপ—সচ্চিদানন্দ। তাহা একবার দর্শন হলে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

প্রথমে যদি আমি ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত এরূপ অভিমান হয়, চারিদিক হতে লোকে ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে, তখন যদি আমার অন্তর ধর্ম্মহীন অসাধু অজ্ঞান ও অভক্ত হয়, তবে পূর্ণ সম্মান বজায় রাখ্‌তে গিয়ে, মানুষ ক্রমেই কপট হ'য়ে ঘোর পাপের মধ্যে ডুব্‌তে থাকে। এজন্য লোকের সমক্ষে যত হীন, মলিন রূপে পরিচিত হই ততই মঙ্গল। এই বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য ঋষিরা চারিটী উপায়

বলেছেন—১। স্বাধ্যায়—(ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও নামজপ); ২। সৎসঙ্গ; ৩। বিচার—(সর্ব্বদা নিজের অন্তর পরীক্ষা কর্‌তে হবে; যদি আত্ম প্রশংসা ভাল লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয় তবে আপনাকে নরকগামী মনে কর্‌তে হবে, ধর্ম্মভ্রষ্ট মনে কর্‌তে হবে।) ৪। দান। দান শব্দে দয়া বলেছেন। কাহারও প্রাণে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া। কাহারও শরীরে বা মনে, বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা কোন প্রকার ক্লেশ দিলে দয়া থাকে না। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মনুষ্য সর্ব্বজীবেই দয়া করা কর্ত্তব্য।

এই স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, বিচার ও দান প্রতিদিন সাধন কর্‌তে হবে। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয় শাসন কর্‌তে অভ্যাস করাও প্রয়োজন বলেছেন; এই উপায়ে সহজেই বাসনা কামনার নিবৃত্তি হয়।

ধর্ম্মলাভের সহজ উপায়—নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা।

একটী গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কিছুই তো করিতে পারি না। ধর্ম্ম কিরূপে লাভ হইবে?

ঠাকুর—জীবনটিকে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত কর্‌তে হয়। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগ্‌লেও ঔষধ গেলার মত কর্‌লে ক্রমে রুচি জন্মে। প্রাতঃকালে উঠে, স্নান ক'রে একঘণ্টাকাল প্রাণায়াম ও নাম। পরে একঘণ্টা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, তার পর বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের সেবা। নিকটে দুঃখীলোক থাক্‌লে তাহার তত্ত্বাবধান কর্‌তে হয়। আহারের পর নিদ্রা যাওয়া ঠিক্ নয়। দিবানিদ্রায় বুদ্ধিনাশ ও আয়ুক্ষয় হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে অধ্যয়ন কর্‌তে হয়। অপরাহ্ণে অল্প ভ্রমণ। সন্ধ্যার সময়ে নাম-গান, প্রাণায়াম ও নাম জপ। তৎপরে পরিমিত আহার ক'রে শয়ন কর্‌বে। ইহা অভ্যস্ত হ'লেই সহজে ধর্ম্মলাভ হবে।

কুঅভ্যাসে বিষফল।

বহুদিন যাহা অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার ফলও বহুদিন থাকে। অনিয়মে চলিয়া যে সকল কুঅভ্যাস জন্মিয়াছে, এখন কত চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়াইতে পারিতেছি না। কুঅভ্যাসের কার্য্যগুলি যেন এখন আমার স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিনই সঙ্কল্প করিয়া শয্যা হইতে উঠি—'আজ এই প্রকার চলিব।' কিন্তু দুই একঘণ্টা পরেই দেখি, উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে কোন্ অবসরে সঙ্কল্পের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেলি, কিছুই বুঝিতে পারি না। ধীরে ধীরে আহারের অনিয়মে লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এখন আর উহা সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। সকল স্বেচ্ছাচারের মধ্যে এইটীই আমার স্বভাবকে বেশী কলুষিত করিয়াছে। দৃষ্টিও এখন আর পূর্ব্ববৎ পদাঙ্গুষ্ঠে স্থির থাকে না, বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। আর যে কোন কালে পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিতে পারিব, সেরূপ ভরসাও নাই। বাক্যসংযমের কথা আর কি বলিব? যেমনই ঠাকুরের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, অসাধারণ ফললাভেচ্ছায় অতিরিক্ত হঠকারিতা করিয়াছিলাম, তেমনই ঠাকুর এখন সুদে আসলেই ফলভোগ করাইতেছেন। বাক্য সংযত না হওয়ায় মন সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ—ভিতরে দৃষ্টি আর নাই। পদে পদে সত্যভ্রষ্ট হইতেছি। নামটি যেন কোথায় ছুটিয়া গিয়াছে। প্রাণায়াম কুম্ভকাদি যথারীতি না করায়, শ্বাস প্রশ্বাস অপরিমিত হ্রস্ব ও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। ফলে এখন আর বীর্য্যও স্থির নাই, চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সিংহের সহিত শৃগাল কুকুরের যুদ্ধ যে প্রকার অসম্ভব, বাক্যের সহিত আমার এই সংগ্রামও তদ্রূপ মনে হইতেছে। হায়! হায়! এখন কি করি! ঠাকুরের আদেশ একটীও রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের আদেশ মত কার্য্য হয় না কেন? তিনিই গড়েন তিনিই ভাঙ্গেন।

ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিয়াও যখন পুনঃ পুনঃ বিফল হইতে লাগিলাম, তখন ভিতরে সন্দেহ জন্মিল, এরূপ হয় কেন? ঠাকুরের আদেশ মত চলিতে আমি চেষ্টা করিতেছি, তাতে আমাকে বাধা দেয় কে? সদ্‌গুরু তো সাক্ষাৎ ভগবান্। তাঁহার বাক্য ও তাঁহার শক্তি একই বস্তু। তাঁহার বাক্য অলঙ্ঘনীয়—তাঁহার শক্তি অমোঘ। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছামাত্রে হইতেছে, তাঁহার আদেশ তো প্রয়োগমাত্রেই সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমাতে তাহা হইল

না কেন ? গুরুবাক্যের সহিত যখন আমার ইচ্ছার বিরোধ নাই, তখন তাহা সফল হওয়ার প্রতিকূলে দাঁড়ায় কে ? এমন শক্তিশালীই বা কে আছে ? এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল। মীমাংসার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি আজ আর কোন উত্তরই দিলেন না ! শেষে মনে হইল যে, কিছুকাল পূর্ব্বে ঠাকুরকে আমিই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, চেষ্টা করিয়াও আপনার আদেশ মত চলিতে পারি না কেন ? তখন ঠাকুর যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতেই ত আমার বর্ত্তমান প্রশ্নের সুস্পষ্ট মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর তখন বলিয়াছিলেন—আমি যা বল্‌ব, তাই যদি কর্‌তে পার্‌বে, তবে তো সিদ্ধই হলে। কতই বল্‌ব—যত দূর পার করে যাও। আর যা না পার, তার জন্য কষ্ট পেয়ো না। মনে ক'রো, অন্য কোন শক্তিতে তোমায় ঐ ভাবে চালিত কর্‌ছে—ওতে তোমার কোন হাত নাই, অপরাধও নাই।

তারপর সেদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আপনার আদেশমত ন্যাস করিলে তো সমস্ত দেহ মন ভগবানকেই অর্পণ করা হয়, উহার পর যে সকল অপরাধ অনিয়ম হঠাৎ হইয়া পড়ে তাহা কি বাস্তবিকই আমি করি ?

ঠাকুর বলিলেন—না, ও সব তুমি কর না। ঠাকুরের কথায় বুঝিতেছি, আদেশ করেনও তিনি আবার ভাঙ্গেনও তিনি। শুধু কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃই সংস্কার হেতু কষ্ট পাই। কিন্তু এই কষ্ট ভোগেই ক্রমশঃ এইভাবে আমার স্তূপীকৃত প্রারব্ধের ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চল্‌লে তোমাদের যাবতীয় কর্ম্মই শাঁখের করাতের মত উঠ্‌তেও কাট্‌বে পড়্‌তেও কাট্‌বে।

গুরুতে একনিষ্ঠতা সুদুর্ল্লভ।

ঠাকুর যতই আশা ভরসা দিন না কেন, কিছুদিন যাবৎ প্রাণটা বড়ই উদাস উদাস বোধ হইতেছে। সর্ব্বদাই মনে হইতেছে, এতকাল কি করিলাম ? বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, তাহার একটী অবস্থা বা কথারও তো সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিলাম না। ভগবান্ গুরুদেব আমার সকল প্রকার কঠোর কর্ত্তব্য কাটাইয়া তাঁর শান্তিময় চরণতলে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং তাঁর দেব-দুর্ল্লভ সেবায় অধিকার দিয়া নিয়তই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছেন। তাঁহার সহিত চিরদিনের নিত্যসম্বন্ধ যাহাতে স্থাপিত হয় তাহারও সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু দুর্মতি-বশতঃ আমি তাঁহার আদেশ পালনে একটী বারও ত তেমন ভাবে চেষ্টা করিলাম না। প্রায় তিন বৎসর হইল, ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, এই সময়ের মধ্যে কতপ্রকার অবস্থাই ভোগ করিলাম। এ পর্য্যন্ত কখন সাধনে উৎসাহ কখনও নিরুৎসাহ কখন দৃঢ়তা কখনও আবার শিথিলতা, দিন তো এই ভাবেই চলিয়া যাইতেছে। ঠাকুরের বহু আদেশের মধ্যে একটীও যে স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হায়, হায়! তবে আমার দশা কি হইবে? শুনিয়াছি শাস্ত্রে আছে 'কঠোর সাধন ভজন তপস্যা এবং বহু জন্মের সুকৃতি বলেও সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করা যায় না।' অথচ পতিত পাবন, দয়াময় প্রভুর অযাচিত কৃপাতেই তাহা আমি অনায়াসেই লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার তাহাতে কি হইল! ঠাকুর এযে বানরের গলায় মুক্তাহার পরাইয়াছেন! বস্তুর মাহাত্ম্য আমি তো কিছুই বুঝিলাম না! শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুনিয়াছিলাম—

"কোটি জীবের মধ্যে একটী ব্রহ্মজ্ঞানী, কোটি ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে একটী তত্ত্বজ্ঞ, কোটি তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে একটী কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু গুরুতে একনিষ্ঠ সুদুর্ল্লভ।"

সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ হইলেই তাঁহাতে একনিষ্ঠতা লাভের অধিকার জন্মে। সদ্‌গুরুর আশ্রিত জনগণের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাঁর আদেশ পালন। তাঁহাতে একনিষ্ঠতা লাভই তাহাদের আত্মার চরম কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ ও একমাত্র লক্ষ্য। শুনিয়াছি, অবিচারে গুরুর বাক্য ধরিয়া চলিলেই ক্রমে ক্রমে গুরুতে একনিষ্ঠতা জন্মে। কিন্তু আমার তাহাতে মতি জন্মিল কই? গুরুদেবের কোন একটী আদেশ ধরিয়া কিছুদিন চলিয়া আশানুরূপ ফল অবিলম্বে (হাতে হাতে) না পাইলে অমনই সন্দিগ্ধ, চঞ্চল ও হতাশ হইয়া পড়ি; আর কুবুদ্ধিবশতঃ মতিচ্ছন্ন হইয়া ঠাকুরের কৃপাবাণীর উপরে দোষারোপ করি। হায় হায়! ঠাকুরের আদেশ পালনে আমার অচলা আকাঙ্ক্ষা জন্মিল না, তাঁর প্রতি একটুকুও নির্ভর বা নিষ্ঠা হইল না, আমার আর কল্যাণের আশা কি?

তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলী।

ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত বিধি-নিয়ম একমাত্র গুরুতে একনিষ্ঠতা লাভের জন্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন্ নিয়মটি আমি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছি? প্রথম বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল—

১। প্রতিদিন ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠে কিছুক্ষণ সাধন কর্‌বে। পরে শুচি শুদ্ধ হয়ে আসনে বসে নিত্যক্রিয়া কর্‌বে। গীতা এক অধ্যায় পাঠ কর্‌বে।

২। স্বপাক আহার করবে। আহার বিষয়ে কোন প্রকার অনাচার না হয়—সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখ্বে। দিনরাতে একবারমাত্র আহার করবে। আহারের মাত্রা ও কাল নির্দ্দিষ্ট রাখ্বে। অধিক মিষ্টি, ঝাল, অম্ল, লবণাদি সর্ব্বদা পরিহার করবে। মিষ্টি ও অম্লে কাম, ঝাল ও তীক্ষ্ণ বস্তুতে ক্রোধ, লবনে লোভ, এবং গব্য বস্তুতে মোহ বৃদ্ধি করে। এসব উত্তেজক বস্তু ত্যাগ করবে।

৩। সামান্য বসন পরবে, সামান্য শয্যায় শয়ন করবে। দিবানিদ্রা ত্যাগ করবে।

৪। কারও নিন্দা করবে না। কারও নিন্দা শুনবে না। কাকেও কষ্ট দিবে না। সকলকেই সন্তুষ্ট রাখ্বে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতার যথাসাধ্য সেবা করবে।

৫। বিচারপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করবে। সত্য বাক্য বলবে। সত্য ব্যবহার ও সত্য চিন্তা করবে। কথা খুব কম বলবে।

৬। যুবতী স্ত্রীলাক স্পর্শ করবে না।

৭। গোপনে নিজের সাধন করবে। পবিত্র আসনে বস্বে। নিজের কার্য্যে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখ্বে।

প্রথম বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে ঠাকুরের এই কয়টী আদেশই বিশেষ। দ্বিতীয় বৎসরের বিশেষ আদেশ—

১। ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্—কোন স্ত্রীলোকের দিকেই তাকাবে না। কোন স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বস্বে না। স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংশ্রবেই থাক্বে না।

২। সর্ব্বদা হেঁট মস্তকে থাক্বে। দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে রাখ্বে। কিছুকাল পদাঙ্গুষ্ঠে স্থির রাখ্তে পার্লে দৃষ্টি-শক্তি খুলে যাবে, যে দিকে তাকাবে—যাবতীয় বস্তু চক্ষে পড়বে। মাটি, জল, আকাশ, সমস্ত ভেদ ক'রে দৃষ্টি চলবে।

৩। বাক্য সংযম করবে। জিজ্ঞাসিত না হ'লে কথা বলবে না।

জিজ্ঞাসিত হ'লেও বিশেষ প্রয়োজন বোধ না কর্‌লে উত্তর দিবে না। উত্তর দেওয়ার সময় খুব বিবেচনা ক'রে, অতি সংক্ষেপে সত্য উত্তরটি দিবে।

৪। অপরাহ্ন ৪টার পরে স্বপাক আহার কর্‌বে। কাহারও রান্না ডাল তরকারী ইত্যাদি 'সকৃড়ী' কোন বস্তু খাবে না। একবার মাত্র আহার কর্‌বে। তবে অন্য সময়ে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হ'লে সামান্য কিছু জলযোগ মাত্র কর্‌বে। বাজারের মিঠাই, মুড়ি, চিঁড়া, খই বা ছাতু কিছুই খাবে না।

৫। সর্ব্বদা কুম্ভকযোগে নাম কর্‌বে—প্রতিদমে; একটী শ্বাস প্রশ্বাসও যেন বৃথা না যায়। * * চক্রে সর্ব্বদা মন স্থির রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

৬। প্রতিদিন হোম কর্‌বে। গায়ত্রী অন্ততঃ আড়াই শত জপ কর্‌বে। সকালে শ্রীমদভগ্‌বদ্‌গীতা, গুরুগীতা পাঠ কর্‌বে। মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠ কর্‌বে। সন্ধ্যার পর রাত্রি দশটা বা এগারটা পর্য্যন্ত ঘুমায়ে বাকী রাত্রি সাধন করে কাটাবে।

৭। ভিক্ষান্ন আহার কর্‌বে। তিন বাড়ী পর্য্যন্ত ভিক্ষা কর্‌তে পার্‌বে। ভিক্ষান্ন সর্ব্বদাই পবিত্র। একপাক আহার কর্‌বে। সঞ্চয় ত্যাগ কর্‌বে।

এবার ব্রহ্মচর্য্যের মূল উপদেশ—

১। ক্রোধ দুর্জ্জয় রিপু, স্বজন-নির্জ্জনতার অপেক্ষা করে না। ক্রোধ জন্মিলে পূর্ব্ব তপস্যার ফল নষ্ট হয়—মানুষ চণ্ডাল হয়। ক্রোধ সংযমের চেষ্টা কর্‌বে।

২। গীতার দু একটী শ্লোক নিত্য মুখস্থ কর্‌বে। পাঠ কমায়ে নাম বেশী কর্‌বে। নাম কর্‌তে কর্‌তে অবসাদ বোধ হলে অধ্যয়ন কর্‌বে।

৩। কারও অগ্নিপক্ক কোন বস্তু খাবে না। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মাত্র ভিক্ষা কর্‌বে। গুরুভ্রাতাদের বাড়ীতেও ইচ্ছা হ'লে কর্‌তে পার—তাতে কোন বিচার নাই।

৪। অর্থ কারও নিকট প্রার্থনা কর্‌বে না। এ বিষয়ে সহোদর ভ্রাতাদেরও অন্যান্যের মতই মনে কর্‌বে। অর্থ বা অন্য কোন বস্তু সঞ্চয় কর্‌বে না।

৫। বাক্য সংযম কর্‌বে। কারও প্রতিবাদ কর্‌বে না। সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণ কর্‌বে। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌বে! শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌বে।

৬। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পরে গায়ত্রী সহস্রবার জপ কর্‌বে। যেমন বলা গিয়াছে, বিধিমত প্রতিদিন ন্যাস ও পূজা কর্‌বে। শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা ও গুরুগীতা পাঠ কর্‌বে।

ঠাকুর একদিন রাত্রে বলিলেন—আমার দুটী কথা ধরিয়া থাক তাতেই সমস্ত লাভ হবে। বীর্য্যধারণ ও সত্যকথা। এই দুটী প্রতিপালন কর্‌লে নিশ্চয়ই এক দিন ভগবানের কৃপা লাভ কর্‌বে। সত্য বল্‌তে হলেই বাক্যসংযম কর্‌তে হয়। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি হ'লেই বীর্য্য আপনা আপনি স্থির হয়ে আস্‌বে।

গুরু-শিষ্যে দেবাসুর সংগ্রাম। মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যম্‌।

ঠাকুরের এতগুলি আদেশের মধ্যে দুপাঁচটীও আমি আজ পর্য্যন্ত অবাধে যথাযথ রক্ষা করিতে পারি নাই। অনিবার্য্য কারণেই যে এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাও বলিতে পারি না। কিছুকাল কোন একটী আদেশমত চলিয়া একটা ভাল অবস্থা লাভ হইলেই ঐ অবস্থার সম্ভোগে মুগ্ধ হইয়া পড়ি; তখন আর আদেশ রক্ষার দিকে একেবারেই মনোযোগ থাকে না। আবার মনোযোগ করিলেও ভাবি, কোন অবস্থাই তো ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত লাভ হয় না, কিন্তু ঠাকুরের কৃপা অহৈতুকী, সাধন ভজন তপস্যা, এসবের কিছুরই অপেক্ষা করে না। সর্ব্বনিয়ন্তা ঠাকুর যাহাতে তাঁহার কৃপার দিকে সাধকের দৃষ্টি না পড়ে, শুধু সেই জন্যই সাধন ভজন তপস্যাকে অসাধারণ অবস্থা লাভের নিমিত্ত করিয়া, এক বিষম কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। ঠাকুরের উপর বিশ্বাস ভক্তি একবার জন্মিলেও তাহা কিছুকাল পরে থাকে না কেন, জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—তোমাদের চেষ্টা থাক্‌বে পুনঃ পুনঃ গড়ন ও স্থাপন। আর আমার চেষ্টা থাক্‌বে তাহা ভাঙ্গন। এখন দেখিতেছি, ইহা লইয়াই সারাজীবন এইভাবে গুরু-শিষ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়াছে। কখনও হাত-পা ভাঙ্গিয়া নিরাশ হইয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি, আবার নিয়ম পালনে একটু কৃতকার্য্য হইলেই ফললাভে নিজকে প্রধান ভাবিয়া অভিমান বশে দম্ভ করি। এই দম্ভের পরই ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁর কর্ত্তৃত্ব বুঝাইতে আবার দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। যতদিন

কায়মনোবাক্যে একান্ত কাতরভাবে ঠাকুরের শরণাপন্ন ও অনুগত না হই, তাঁহাকেই অনন্ত-শরণ, একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করি, ততদিন কিছুতেই আর এই দণ্ডাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কোন নিয়ম প্রণালী প্রতিপালনে কিংবা শত যত্ন চেষ্টা করিয়াও কখনও কোন প্রকার স্থায়ী ফললাভ হয় না, যদি তাহা গুরুর মুখ হইতে আদেশ বা উপদেশরূপে বাহির না হয়। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—"মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং" যে মন্ত্র স্মরণে জীব উদ্ধার হইয়া যায়, সেই মন্ত্রের মূলই গুরুর বাক্য। আদেশ-উপদেশ ও মন্ত্র এ সমস্তেরই মূল অর্থাৎ জীবনীশক্তি একমাত্র ঐ গুরুবাক্যে। শ্রীগুরু মুখনিঃসৃত না হইলে, মন্ত্রে জীবোদ্ধারের শক্তি সঞ্চারিত হয় না। গুরুর বাক্যই গুরুশক্তি। গুরুর বাক্য ধরিয়া থাকিলেই গুরুর সহিত সম্পূর্ণ যোগ থাকে। শিষ্যের নিকটে গুরুর বাক্যে লঘুগুরু তারতম্য বা ইতরবিশেষ নাই; সমস্তই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সমফলদায়ক। সদ্‌গুরুর বাক্যই সার। তাঁর বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নয়। এই নরাধমকে তিনি যে দয়া করিয়া বহু আশা দিয়াছেন, কেবল তাহাই একমাত্র ভরসা। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বিশ্বগুরু ঋষিরাও বারংবার বলিয়াছেন—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে।
বিকশতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে॥
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

পশ্চিমাকাশে সূর্য্যোদয়, গিরিশৃঙ্গে পদ্মের উদ্ভব, পর্ব্বতের প্রচলন এবং বহ্নির শীতলতা সম্ভব হইলেও, সজ্জনের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। সজ্জন অর্থে ভগবজ্জন, সদ্‌গুরুর বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নয়; ইহা বিশ্বাস হইলেই ত সব হইল। ভগবান গুরুদেব দয়া করিয়া এই শুভ মতি দিন, যেন আর কখনও তাঁর বাক্যে দ্বিধা বুদ্ধি বা সংশয় না জন্মে। এখন হইতে আবার ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি উৎসাহের সহিত যথামত প্রতিপালন করিব, স্থির করিলাম। এজন্য যদি আমাকে লোকালয় ছাড়িতে হয় এবং সেজন্য ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া পাহাড় পর্ব্বতেও যাইতে হয়—তাহাও আমি স্বচ্ছন্দে করিব।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ—শ্রীগুরুর ধ্যানকে কল্পনা বলে না।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন—আমাদের এই সাধনে কোন প্রকার কল্পনা নাই। ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন্ রূপে কখন্ কার নিকটে প্রকাশ হবেন কে

বল্‌তে পারে? ভগবানের নাম কর। নাম কর্‌তে কর্‌তে যেরূপে তিনি প্রকাশ হবেন, তাই ধরে নিবে। পূর্ব্ব হতে কোন রূপের কল্পনা কর্‌তে নাই।

আবার এইরূপও বলিয়াছেন- ভগবানের রূপের অন্ত নাই। কখন্ কোন্ রূপে তিনি কার নিকট প্রকাশ হন্, কিছুই বলা যায় না। যখন যেরূপেই তিনি প্রকাশ হন না কেন, ভক্তি কর্‌বে। কিন্তু কোন রূপেই বদ্ধ হবে না। নাম কর্‌তে কর্‌তে তাঁর অনন্তরূপের প্রকাশ হ'তে থাকে শুধু একটী রূপ ধরে থাক্‌লে হবে কেন?

ধ্যান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সর্ব্বশেষ ঠাকুর বলিয়াছেন- ভগবানকে আর কে দেখ্‌তে পায়! গুরুই ভগবান্। নাম কর্‌তে কর্‌তে গুরুর ভিতর দিয়া ভগবানের অনন্তরূপ অনন্ত বিভূতি বিকাশ পেতে থাক্‌বে।

ঠাকুরের এ কথায় এই বুঝিয়াছি যে—কোন রূপের ধ্যান করিতে হইলে, গুরুর মূর্ত্তিই ধ্যান করিতে হয়। কারণ সদ্‌গুরু হইতেই ভগবানের যাবতীয় রূপের প্রকাশ। এই জন্য ভগবান্ সদাশিবও বলিয়াছেন—"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ।" আর যখন তখন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ধ্যানশূন্য মনে নাম করিতে করিতে শ্রীগুরুর রূপই অন্তরে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, কিছুতেই তাহা ছাড়ান যায় না। সুতরাং, আমি সদ্‌গুরুর সচ্চিদানন্দ রূপই ধ্যান করি। কিন্তু গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ প্রায়ই আমাকে বলেন— "তুমি কল্পনার উপাসনা কর। গুরুর রূপ ধ্যান ইহাও কল্পনা। কারণ গুরুর রূপও এক প্রকার থাকে না—পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং অনিত্য।"

গুরুভ্রাতাদের কথায় আমার মনে খটকা জন্মিল। আমি যাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তো ভগবান্ পূর্ণ; প্রতি অণুপরমাণুতেও কি তিনি পূর্ণরূপেই আছেন?

ঠাকুর—হাঁ। প্রতি অণুপরমাণুতেও তিনি পূর্ণরূপে অবস্থান কর্‌ছেন।

পূর্ণের অংশও পূর্ণ—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ব্রহ্ম পূর্ণ, এই কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের প্রকাশ হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ সেই পূর্ণব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, কেবলমাত্র পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে।

আমি—তা হ'লে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো প্রতি অণুপরমাণুতে রহিয়াছে।

ঠাকুর—হাঁ। প্রতি অণুপরমাণুর ভিতরে যে ভগবান আছেন, তাঁর ভিতরে সমস্তই রহিয়াছে।

আমি—তা হ'লে আমার নখাগ্রে ভগবানের পূর্ণ অধিষ্ঠান বলিয়া কলিকাতা সহরটিও আছে, এরূপ যদি চিন্তা করি, তাহা কি মিথ্যা কল্পনা হইবে?

ঠাকুর—না ওকে কল্পনা বলে না।

আমি—সমস্তই তো পরিবর্ত্তনশীল। পূর্ব্বে গুরুর একপ্রকার রূপ দেখিয়াছি, এখন আবার তাহারই অন্য প্রকার রূপ দেখিতেছি। এখন পূর্ব্বের রূপ ধ্যান করিলে তাহা কি কল্পনা হইবে?

ঠাকুর—প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের সমস্ত রূপই ভগবানে নিত্যরূপে রয়েছে। ওরূপ ধ্যান কল্পনা নয়। অসত্যেরই কল্পনা। যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা কখনও হয় নাই, যেমন 'আকাশকুসুম' 'ঘোড়ার ডিম।' সত্য বস্তুর চিন্তাকে ধ্যান বলে, তাহা কল্পনা নয়।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আর অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না; কোন্ কথায় কি বলিয়া, শেষকালে আবার বিষম বিপদে পড়িব। মনে মনে প্রশ্ন আসিল—সদ্‌গুরু তো নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্! তা বলিয়া কি 'রামাশ্যামা' গুরুকেও ভগবান্ ভাবিতে হইবে?

এই প্রশ্ন আর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না। আমার পক্ষে অনাবশ্যক, বিশেষতঃ ইহার মীমাংসা ইতিপূর্ব্বেও বহুবার শুনিয়াছি।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন—অগ্নি সর্ব্বত্র থাক্‌লেও, সেই অগ্নিদ্বারা যেমন কোন কায হয় না—তাহা কেহ পায় না; অগ্নির আবশ্যক হ'লে যে স্থানে উহার বিশেষ প্রকাশ—চুল্লী, প্রদীপ প্রভৃতি হতেই তা গ্রহণ কর্‌তে হয়, সেই প্রকার ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী হলেও তাঁকে লাভ কর্‌তে বিশেষ বিশেষ

স্থানে তাঁর উপাসনা কর্‌তে হয়। ঋষিরা আটটী স্থান নির্দ্দেশ করেছেন— গুরু, সূর্য্য, শালগ্রাম, অগ্নি, জল, আত্মা, পিতা, মাতা—এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী। চক্‌মকিতে লৌহ ঘর্ষণে যেমন সহজে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঐ সব স্থানে ভগবদ্‌ধ্যানেও সেই প্রকার ইষ্টবস্তু খুব সহজে প্রকাশিত হন। পিতা-মাতা, স্বামী যেমনই হউন না কেন, প্রত্যক্ষ দেবতা মনে ক'রে, তাঁদের সেবাপূজা করা কর্ত্তব্য; প্রতি কার্য্যে তাঁদের অনুগত হ'য়ে চল্‌তে হয়। গুরু সম্বন্ধেও শিষ্যের সেই প্রকার। ভগবৎ জ্ঞানে গুরুর সেবাপূজা কর্‌তে হয়। অবিচারে তাঁর আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে হয়। ভগবানকে লাভ কর্‌তে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। ইহা ঋষিদের ব্যবস্থা।

গুরু যেমনই হউন না কেন, অকপটে তাঁর সেবাপূজা ও শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া এবং অবিচারে তাঁর আদেশ পালন করিয়া, শিষ্য যে সিদ্ধিলাভ করেন এদেশে এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্বামীও যেমনই হউক না কেন, স্ত্রী পতিব্রতা হইলে তাঁহার অসামান্য জীবন সমস্ত স্ত্রীজাতির আদর্শ হয়।

দৃষ্টিসাধন, পঞ্চভূত এবং জ্যোতিঃ সারূপ্য—নাম সাধন।

১৫ই ৩০শে ফাল্গুন।

মধ্যাহ্নে আমতলায় ভাগবত পাঠান্তে ঠাকুরের নিকটে যখন বসিয়া থাকি বড়ই আরাম পাই, সময় কি ভাবে চলিয়া যায় বুঝিতে পারি না। ঠাকুর ধ্যানস্থ থাকেন। আমি ঠাকুরের স্নিগ্ধ পবিত্র মনোহর মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া নাম করিতে থাকি। এই সময়ে প্রত্যেকটী নাম একটা সারবান বস্তু বলিয়া অনুভব হয়। নামস্মরণের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের রূপ অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোহর হয়। উত্তরোত্তর উহার মাধুর্য্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। আজকাল প্রতিদিনই নানাপ্রকার চক্রদর্শন হইতেছে। কোন সূত্র ধরিয়া উহা কোথা হইতে উদ্ভূত, কিছুই বুঝিতেছি না। অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক শুভ্র তারে এই সকল চক্র অঙ্কিত। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ বা দ্বাদশকোণ চক্রও দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটীরই মধ্যস্থল নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু মেলিয়া বা বুজিয়া ঠিক একই প্রকার দর্শন হয়। ইহা কি দৃষ্টিসাধনের ফল, না, নামেরই পরিণাম—বুঝিতেছি না। একই ভূতে দৃষ্টিসাধনের ফলে বহু রঙ্গের অপূর্ব্ব জ্যোতি দর্শন হইতেছে। দৃষ্টি সাধন সম্বন্ধে ঠাকুরকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে

ইচ্ছা হইল। অবসর পাইয়া বলিলাম—শুনিয়াছি পঞ্চভূতেই দৃষ্টিসাধন করিতে হয়। কি অবস্থা হইলে একটীর পর আর একটী ধরিতে হয়?

ঠাকুর—গুরুর আদেশ ব্যতীত এ সব কখনও কিছু কর্‌তে নাই, বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে। দৃষ্টিসাধন প্রথমে বৃক্ষে। বৃক্ষে যখন অনায়াসে, অনিমেষে, বিনা অশ্রুপাতে একঘণ্টাকাল এক বিন্দুতে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌তে পার্‌বে তখন আকাশে অভ্যাস কর্‌বে। নীল আকাশে একটী স্থানে দৃষ্টি স্থির কর্‌তে হয়। অর্দ্ধঘণ্টাকাল আকাশে দৃষ্টি স্থির হ'লে, স্রোতোজলে। স্রোতোজলে একঘণ্টা অভ্যস্ত হ'লে, নির্ব্বাতস্থানে ঘৃতের প্রদীপ রেখে তাতে দৃষ্টি স্থির কর্‌তে হয়। অন্ততঃ দুঘণ্টাকাল দীপে অভ্যাস হ'লে সূর্য্যে আরম্ভ কর্‌বে। সূর্য্যোদয় হ'তে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সূর্য্যে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌বে। কিন্তু সম্পূর্ণ বীর্য্যধারণ না হ'লে সূর্য্যে দৃষ্টিসাধন কর্‌তে নাই—অনিষ্ট হয়। এজন্য গৃহস্থদের নিষেধই আছে। এই প্রশ্নে ঠাকুর আমাকে দৃষ্টিসাধনের ক্রম ও প্রণালী পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—খুব সাবধানতার সহিত বিশেষভাবে গুরুর নিকটে সঙ্কেতটি জেনে নিয়ে তবে এই ত্রাটক সাধন কর্‌তে হয়।

আমি—কোন্ ভূতের কিরূপ জ্যোতিঃ? এক ভূতেও তো নানা রকম জ্যোতিঃ দেখা যায়।

ঠাকুর—ক্ষিতির জ্যোতিঃ পীতবর্ণ। অপের জ্যোতিঃ শুভ্রবর্ণ। তেজের লাল। মরুতের জ্যোতিঃ নীল এবং ব্যোমের জ্যোতিঃ নবজলধর গাঢ় কৃষ্ণ সংযুক্ত নীলবর্ণ।

আমি—এই সকল জ্যোতিঃ কোনটি কোন গুণের? কোনটিই বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

ঠাকুর—অপ জ্যোতিঃ শুভ্রবর্ণ—সাত্ত্বিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তেজের জ্যোতিঃ-লাল, রজোগুণী। মরুতের জ্যোতিঃ নীল—রজঃসত্ত্ব। ব্যোমজ্যোতিঃ—তম-সত্ত্ব। কিন্তু প্রত্যেকটী ভূতেই দৃষ্টিসাধন কালে সকল জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে দর্শন হয়।

আমি—নাম করিতে করিতে নাকি এমন অবস্থা হয় যে, দেহের প্রতি পরমাণু পর্য্যন্ত নাম করে? একটী রূপ চিন্তা করিতে করিতেও নাকি সেইরূপই হইয়া যায়?

ঠাকুর—নাম কর্‌তে কর্‌তে এমন অবস্থা হয় যে, শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু,

প্রতি অণু পরমাণু নাম করে। এ কল্পনা নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। এ অবস্থায় মহাত্মারা বস্ত্রদ্বারা দেহ আবরণ করে রাখেন, গায়ে বিভূতি মাখেন। যেরূপ ধ্যান করা যায়, ধীরে ধীরে দেহটিও ক্রমে সেইরূপই হয়।

আমি—বাহিরের কোন অনুষ্ঠান দ্বারা কি বীর্য্যপাত বন্ধ করা যায় না ?

ঠাকুর—সর্ব্বদা যোনিমুদ্রা ক'রে বস্‌তে পারলে বীর্য্যপাত বন্ধ হয়।

আমি—এই সাধন যাঁহারা পেয়েছেন সকলেই কি দৃষ্টিসাধন ও যোনিমুদ্রা কর্‌তে পারেন ?

ঠাকুর—হাঁ, খুব পারেন।

এইছা দিন নেহি রহেগা।

আসন কুটীরে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া যখনই বসি, দেওয়ালে ঠাকুরের সহস্তে লেখা—'এইছা দিন নেহি রহেগা' চক্ষে পড়ে। অম্‌নি মনে হয়, এই কথা ঠাকুর আমারই জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। বুঝি এই শুভদিন বেশী দিন আর আমার ভাগ্যে নাই। স্বয়ং ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। দুরদৃষ্টবশতঃ নিয়ত তাঁর সঙ্গ করিয়াও তাঁকে চিনিলাম না। মুহূর্ত্তমাত্র যাঁহার সঙ্গ পাইতে ঋষি-মুনি, দেব-দেবীরাও লালায়িত, তাঁহাকে নিয়ত নিকটে পাইয়াও আদর যত্ন বা মর্য্যাদা করিতে পারিলাম না। ভগবান্ কতবারই তো অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁর মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ না হইলে সাধারণতঃ কেহই তাঁহাকে ঠিক্‌ভাবে বুঝিতে বা জানিতে পারে নাই। অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁর ভক্ত সঙ্গীরা শেষে—'হায়! কি বস্তু হারাইলাম'? বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ দিন পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া কাটাইয়াছেন। এবার আমার অদৃষ্টেও বুঝি তাহাই ঘটিবে। এখন আমার কি সুখের দিনই যাইতেছে, ঠাকুরের এই দুর্লভ সঙ্গ কতকাল আর পাইব! কর্ম্মবিপাকে কোন দিন, কোন সময় কোথায় গিয়া যে পড়িব, কিছুই তো নিশ্চয় নাই; সুতরাং সময় থাকিতে এখন প্রাণ ভরিয়া আমার ঠাকুরকে দেখিয়া লই। এই ভাব মনে আসাতে মনটিকে আমার এতই ব্যাকুল করিয়া তুলিল যে, কান্নার বেগ কিছুতেই আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুরের সম্মুখেই শব্দ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। একান্ত প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিলাম—"ঠাকুর! তোমাতে ঐকান্তিক ভালবাসা দেও, আর অবিচ্ছেদে যেন তোমার সঙ্গলাভ করি, দয়া করিয়া শুধু এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।" এই সময়ে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি ধ্যানস্থ।

তাঁর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছে, অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; মাঝে মাঝে এক একবার মাথা তুলিতেছেন, আবার ঢলিয়া পড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। আমিও বেলা অবসান দেখিয়া তখন রান্না করিতে চলিয়া আসিলাম।

শ্রীধরের সহিত ঝগড়া—ভাগবতে কালির দাগ। পাহাড়ে যাইতে আদেশ।

সকাল বেলা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্থিরভাবে আসনে বসিয়া আছি, অকস্মাৎ শ্রীধর আমার রাশিতে ভার হইলেন। চোখ বুঝিয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তিনি ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিলেন, এবং আমার হোমের ঘৃতের বোতলটি হাতে লইয়া প্রজ্বলিত হোমাগ্নির উপরে তাহা একেবারে উপুড় করিয়া ধরিলেন। ঘৃত সংযোগে সহসা অগ্নি 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন চোখ মেলিয়া দেখি, শ্রীধর চঞ্চলনেত্রে ঘন ঘন আমার দিকে তাকাইতেছেন—আর প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ঢালিবার জন্য ব্যস্ততার সহিত দুহাতে বোতলটি ধরিয়া খুব ঝাঁকাঝাঁকি করিতেছেন। আমি 'একি একি' বলিয়া বোতলটি ধরিয়া ফেলিলাম।

শ্রীধর, "দ্যাখ্, ঐ আগুণ দ্যাখ্, ঐ আগুণ দ্যাখ" বলিয়া নিজ আসনে যাইয়া বসিলেন। আমার ১৫ দিনের হোমের ঘি এই ভাবে ২।৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই শ্রীধর সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া, মাথাটা আগুণ হইয়া উঠিল। খুব উত্তেজিত হইয়া শ্রীধরকে বলিলাম—একি! কি করলে! হাত দুখানা এখন মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে দি! সাহস তো বড় কম নয়! শ্রীধর কহিলেন—কেন ভাই! কি দোষ দেখ্‌লে যে হাত ভাঙ্গ্‌বে?

আমি—আর দোষ কাকে বলে? অত্যন্ত গুরুতর দোষ! আমার ঘি আমাকে না ব'লে তুমি কোন্ আক্কেলে সমস্তটা আগুণে ঢাল্‌লে?

শ্রীধর—বল্‌লে কি আর তুমি দিতে পার্‌তে? অগ্নিদেবকে ঘৃত ভক্ষণ করালাম—তা দোষ হলো?

আমি—আমার এত পরিশ্রমের সংগ্রহ এই খাঁটি হোমের ঘিটুকু তুমি শুধু শুধু আগুণে পোড়ালে, এ দোষ না তো কি?

শ্রীধর—ওহে! স্বার্থ বুদ্ধিতে কিছু কর্‌লেই দোষ। তুমি স্বার্থের জন্যই হোম কর আগুণে ঘি ঢাল। আমি তো আর তা করি নাই! আমার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব!

তখন আর আমি শ্রীধরের কথা সহিতে পারিলাম না। অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—ভাল চাও তো এখনও বল্‌ছি চুপ কর—না হলে মার খাবে, হাতে হাতে নিস্বার্থ ফলটি পাবে।

শ্রীধর, "বেশ, এই চুপ করি" বলিয়া চোখ বুজিলেন। শ্রীধরের এই উপেক্ষা ও অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়া বিষম রাগ হইল। মারিব বলিয়া ক্রোধভরে হাত দেখাইতে যেমন হাতখানা সজোরে নাড়া দিলাম, হঠাৎ অমনি তাহা সম্মুখস্থ কালির দোয়াতে গিয়া লাগিল। দোয়াতের কালি ছিটিয়া গিয়া আসনময় একাকার হইল, এবং খানিকটা কালি গিয়া শ্রীমদ্‌ভাবগতের মার্জ্জিনে পড়িল। যথাসাধ্য ঐ কালি গামছা দিয়া উপর উপর পুঁছিয়া রাখিলাম। অমন সুন্দর নূতন ভাগবত খানির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে ভারী কষ্ট হইতে লাগিল।

বেলা প্রায় ১টার সময় আর আর দিনের মত ভাগবত পাঠ করিতে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর আজ কুটীরে বসিয়া আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ঠাকুর ভাগবতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওকি ?

আমি—হঠাৎ দোয়াত পড়িয়া গিয়া খানিকটা কালি লাগিয়াছে। ঠাকুর যেন একটু ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন—ভাগবতে কালির দাগ। পাছে আর কোন প্রশ্ন করেন, ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া কহিলাম। কি ভাবে কালি পড়িয়াছে কিছুই বলিলাম না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঠ সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম, এবং পাখা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে কয়েকটী গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামী হরিমোহনের উপরে কটাক্ষ করায় ঠাকুরের বিরক্তি ও শাসন।

ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথায় কথায় কোন্ কোন্ গুরুভ্রাতার সাধন পথে কি কি বিঘ্ন বলিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমার সম্বন্ধে বলিলেন—এর একটু প্রতিষ্ঠার ভাব আছে। এইটুকু যদি না থাক্‌তো এতদিনে খুব সুন্দর অবস্থা লাভ করত। গুরু-ভ্রাতাদের সম্মুখে ঠাকুর আমাকে এইরূপ বলিলেন শুনিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। কষ্টও হইতে লাগিল। ভাবিলাম—ঠাকুর প্রতিষ্ঠার ভাব আমার ভিতরে কি দেখিলেন ? আমি তো কিছুই খুজিয়া পাই না। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কখন কি করিয়াছি কিছুই তো স্মরণ হয় না। পাছে আমার ভিতরে প্রতিষ্ঠার ভাব আসে, সেই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর

আমাকে সতর্ক করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, যদি প্রতিষ্ঠার ভাবই আমার ভিতরে না থাকিবে, তাহা হইলে গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে আমার দোষের কথা ঠাকুরের মুখে শুনিয়া, আমি এমন লজ্জিত ও দুঃখিত হই কেন? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি এই প্রতিষ্ঠার ভাব কি প্রকারে ত্যাগ কর্‌ব?

ঠাকুর—তুমি আর কি? কত বড় বড় লোক এই প্রতিষ্ঠার ভাব ছাড়াতে পার্‌ছেন না। শ্বাসে শ্বাসে নাম কর—সমস্ত দোষই ওতে কাট্‌বে। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা; প্রতিষ্ঠার ভাব একটী রোগ—একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হয়।

একটু থামিয়া ঠাকুর আমাকে আবার বলিলেন—তুমি গিয়ে কিছুকাল পশ্চিমে থাক না? উপকার পাবে।

আমি—আপনার সঙ্গ ছেড়ে আমার কোথাও থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। স্বামী হরিমোহনের মত একবার যাওয়া আর একবার আসা—এরূপ বৈরাগ্য করে লাভ কি?

ঠাকুর আমার কথায় হরিমোহনের উপরে কটাক্ষ শুনিয়া, খুব বিরক্তির সহিত ধমক্‌ দিয়া বলিলেন—স্বামীজীকে সামান্য মনে ক'রো না। তোমাকেও তাঁর মত অনেকবার যাওয়া আসা কর্‌তে হবে। বৈরাগ্য লাভ কর্‌তে, শান্ত অবস্থা পেতে এখনও ঢের দেরী। ভাগবত দেখাইয়া বলিলেন—এই কালির দাগ তুল্‌তে বহুকাল যাবে। এখন হয়েছে কি?

ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া, আমি অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলাম। কোন কথা না বলিয়া, শঙ্কিত, বিষণ্ণ মনে চুপ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—সর্ব্বদা বিচার ক'রে চল্‌বে। যাতে অভিমান হয় এমন কিছুই কর্‌বে না। কোন বিষয়েরই অনুকরণ কর্‌বে না। প্রত্যেকটী বস্তু গ্রহণে, রক্ষণে ও ত্যাগে সর্ব্বদা বিচার চাই। যার উদ্দেশ্য ভগবান্‌ নন্‌, তা যাই হ'ক্‌ না কেন, দূরে নিক্ষেপ কর্‌বে। যা তাঁর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'লেও তা কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে নাই। যাতে প্রতিষ্ঠা হয়, তা বিষবৎ ত্যাগ কর্‌বে। জটা, মালা, তিলকাদি যা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাতেও যদি অভিমান জন্মে, প্রতিষ্ঠার হেতু হয়, তৎক্ষণাৎ দূর ক'রে ফেল্‌বে। এ সব বিষয়ে নিয়ত দৃষ্টি না রাখ্‌লেই বিপদ। ধর্ম্মাভিমান

বড় ভয়ানক। অন্য অপরাধের পার আছে, কিন্তু এই ধর্ম্মাভিমানের পার নাই। যতপ্রকার অভিমান আছে, তার মধ্যে ধর্ম্মের অভিমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। সাবধান থেকো। সাধন, ভজন, তপস্যা, অধ্যয়ন, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা যে কোন বিষয়ে অভিমান বা প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আস্‌বে—বিষম রোগ মনে ক'রে, তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর্‌বে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কহিলেন—এখন পশ্চিমে কোন স্থানে গিয়ে সাধন কর। কাশীতে বা চিত্রকুটে গিয়ে থাক, উপকার হবে।

আমি বলিলাম—পশ্চিমে যে কোন স্থানে থাক্‌লেই হবে?

ঠাকুর—হাঁ; দুমাস চারমাস করে এক এক স্থানে থেকে, স্বাধীনভাবে সাধন ভজন কর্‌লে বেশ উপকার পাবে। তাই কর।

আমি—আমার কল্যাণের জন্য যেখানে যেয়ে থাকৃতে বল্‌বেন, সেখানেই যাব। তবে আমার আপনার কাছেই থাকৃতে ইচ্ছা হয়। আপনার নিকটে থাকায় বেশী উপকার—আমার এই ধারণা।

ঠাকুর—তা কিছু নয়। এখন নিকটে না থেকে, দূরে থাক্‌লেই তোমার বরং বেশী উপকার হবে। নিকটে, দূরে কিছু নয়।

ঠাকুরের এসব কথার পর আমি পশ্চিমেই যাইব স্থির করিলাম।

কালির দাগে চণ্ডী পাহাড়। বিস্ময়কর চিত্র—ভগবদ্ বিধান।

সকাল বেলা উঠিয়া কোন প্রকারে নিত্য ক্রিয়া সমাপন করিলাম। প্রাণে দারুণ ক্লেশ হইতে লাগিল। এতকাল সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া, ঠাকুর আমাকে কি এবার নির্ব্বাসন দিলেন? মনঃকষ্টে অনেক ক্ষণ আসনে পড়িয়া রহিলাম। মধ্যাহ্নে যথাসময়ে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। এক অধ্যায়ের অধিক আজ আর ভাগবত পাঠ করিতে পারিলাম না। খুব কাঁদিতে লাগিলাম। ঠাকুর মগ্ন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া, সস্নেহে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—তোমার ভাগবত খানা দেও ত। আমি ভাগবত খানা ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর একদৃষ্টে সেই কালির দাগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখেছ? কি সুন্দর পাহাড়! কাল তো এমনটি দেখি নাই! সুন্দর একটী পাহাড়ের চিত্র হয়েছে। অতি চমৎকার!

পাহাড়টির নীচে একটী নদী, পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপরে একটী সুন্দর মন্দির। মন্দিরের চূড়ার ধ্বজাটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার উঠেছে। কিছুক্ষণ চিত্রটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কুঞ্জবাবু প্রভৃতিকে বলিলেন—দেখ, কি সুন্দর পাহাড়ের চিত্র। সকলেই দেখিয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর আমাকে কহিলেন-এরূপ পাহাড় যেখানে দেখ্‌বে—সেখানেই আসন করবে। এখন যেভাবে চল্‌ছ ঠিক সেইভাবেই চল্‌বে। কাহারও কথায় বিচলিত হ'য়ো না।

কুঞ্জবাবু—যথার্থই কি এইরূপ পাহাড় কোথাও আছে?

ঠাকুর—হাঁ, ঠিক্ এইরূপ পাহাড়ই আছে। কাল তো এমনটি দেখি নাই! আজই এই পাহাড়ের চিত্র দেখ্‌ছি। আশ্চর্য্য!

কুঞ্জবাবু—এরূপ পাহাড় কোথায় আছে?

ঠাকুর—তা খুঁজে দেখ্‌লেই পাবে।

কুঞ্জবাবু—ভারতবর্ষে হাজার হাজার পাহাড় আছে। ছেলে মানুষ, কোথায় গিয়ে ঘুরবে, খুঁজে বার করতেই কত কাল যাবে। পাহাড়টি কোথায় ব'লে দিন। আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতারা সকলেই ঠাকুরকে আমার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর পাহাড়টি কোথায়, পাহাড়ের নাম কি, সহজে বলিতে চাহিলেন না। পরে অনেক সাধ্যসাধনা ও অনুরোধের পর কহিলেন-হরিদ্বারে চণ্ডীপাহাড়। এই পাহাড়ে একে যেতে হবে ব'লেই এই চিত্র পড়েছে। গিয়ে উপকার হবে। দেখ, কোন সূত্রে কি হয়।

আমি এ সকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। ভগবানের বিধান বুঝিয়া মনের ক্লেশ দূর হইল, এবং পাহাড়ে যাইতে উৎসাহ জন্মিল।

ঠাকুর কহিলেন-এখনও সেখানে শীত। এই মাসের পরে যেও। মাতাঠাকুরাণীর অনুমতির জন্য ঠাকুর আমাকে বাড়ী হইয়া যাইতে বলিলেন।

পাহাড়ে যাইতে মায়ের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ।

মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইতে বাড়ী আসিলাম। অবসরমত মাকে সমস্ত কথা বলিলাম। মা কহিলেন—এই অল্পবয়সে একাকী পাহাড় পর্ব্বতে থাকিবি কিরূপে!

গোঁসাই তোকে সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌বেন মনে করেই, আমি তাঁর হাতে তোকে দিয়েছি। এখন সঙ্গছাড়া করে, এই বয়সে একা তোকে তিনি পাহাড় পর্ব্বতে পাঠাবেন? আমি বলিলাম—আমি, যথার্থ ধর্ম্মলাভ করি, এই আকাঙ্ক্ষায় যখন তুমি আমাকে তাঁর চরণে অর্পণ করেছ, তখন যেখানে গিয়ে থাক্‌লে আমার কল্যাণ হবে, তাই তো তিনি ব্যবস্থা কর্‌বেন। ঠাকুর কখনও আমাকে সঙ্গছাড়া কর্‌বেন না। যেখানেই থাকি, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বেন। এখন প্রসন্নমনে, সন্তুষ্টভাবে তুমি আমাকে অনুমতি না দিলে আমার এদিক ওদিক দুদিকই গেল।

মা বলিলেন—না না। গোঁসাই যখন বলেছেন—গুরুবাক্য, যেতেই হবে। তবে ছেলেমানুষ একাকী গিয়ে পাহাড় পর্ব্বতে কি ভাবে থাক্‌বি মনে হলে কষ্ট হয়।

আমি—পাহাড়ে আমার কোন কষ্টই হবে না। আমার সমস্ত ব্যবস্থাই গোঁসাই সেখানে ক'রে রেখেছেন। লোকালয় নিকটে আছে। ভিক্ষার অসুবিধা নাই। আহার প্রচুর জুট্‌বে। সে ভাবনা ক'রো না।

মা—আচ্ছা, সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় থাকিস্, মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিস্। গোঁসাই যেমন বলেন, তেমনই চল। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি পাইয়া, আমি ঢাকায় রওয়ানা হইলাম। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল। মা সকলকে ধমক্ দিয়া কান্না থামাইলেন। বলিলেন—যাওয়ার সময়ে চখের জল ফেল্‌তে নাই; দুর্লক্ষণ, এতে অমঙ্গল হয়।

মদনোৎসবে মহাবিষ্ণুর সঙ্কীর্ত্তন—ঠাকুরের আনন্দ। দীক্ষা।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া দেখিলাম, আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে গুরুভ্রাতৃগণ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উৎসাহ-আনন্দে সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া সকলেই ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ করিতেছেন। গেণ্ডারিয়ার ছেলেরা এবারও মাঠাকুরাণীর মন্দির পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করিলেন। মাকে বিবিধ প্রকারে সাজাইয়া আনন্দে মাতিলেন। ঠাকুরও ছেলেদের আনন্দে আনন্দ করিয়া, সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে সহর হইতে বহুলোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। জানি না কেন, আজ কীর্ত্তন তেমন জমিল না। সময়ে সময়ে ঠাকুর অশ্বস্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাগলপুর হইতে মহাবিষ্ণুযতী

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিছানাপত্র আমার আসনের পাশে ফেলিয়া আমতলায় কীর্ত্তন-স্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং কুটীরের দ্বারে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ঠাকুরকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। দুই তিন মিনিট পরেই অবসর পাইয়া, বিষ্ণুবাবু নিজের রচিত মদনোৎসবের সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর গানের প্রথম চরণটি শুনিয়াই আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; এবং জয় রাধে শ্রীরাধে বলিতে বলিতে আমতলায় আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের মধুর নৃত্যে সকলেরই প্রাণে আনন্দ উৎসাহ সঞ্চার হইল। গুরুভ্রাতারা করতালি সংযোগে নৃত্য করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিষ্ণুবাবুর সহিত গাহিতে লাগিলেন—

চল লো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে মৃগমদে আজি সাজাব লো;
আজি মনসাধ সব মিটাব লো,
আজি প্রাণে প্রাণে বঁধু বাঁধিব লো॥
আয়লো ললিতে, চললো চম্পকা,
ডাকে প্রাণসখা আয়লো বিশাখা,
আয় শুক শারী, সব পরিহরি,
হরি সনে হোলি খেলিব লো॥
হাসি হাসি জোছনা রাশি,
ঢালে শশী প্রেম বিলাসী,
পিক কুহু বলে পবন দোলে,
ঐ শুন বাঁশী ডাকিছে লো॥
বকুল বেল যুথী মালতী,
চামেলী চাঁপা কনক জ্যোতি,
তুলি অতুল তমাল ফুল,
বঁধুয়ার গলে দিব লো॥
আয় আয় যত আহিরী ঝিয়ারী
আবির চন্দন নে লো থালা ভরি,
ক্ষীর সর ননী বাঁধলো যতনে
গোপনে সেধনে খাওয়াবো লো॥

হাতে হাতে ধরি নাথে ঘেরি ঘেরি,
নাচিব গাহিব সব সহচরী,
মন প্রাণ ভরি হেরিব মুরারি,
গলা ধরি বামে দাঁড়াব লো॥
হরিদাস ভাসে নয়নের জলে,
লুটায়ে গোপীর চরণ তলে,
বলে ব্রজবালা সে চিকণ কালা,
এইবার তোরে দেখাব লো।
(এই বার তোরে দেখাব লো॥)

আজ ঠাকুর মধুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিবিধ প্রকারে অঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে দেখিয়া, দর্শক মণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া পড়িল। এই সময়ে ঠাকুর এক একবার বিষ্ণুবাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। বহুক্ষণ পরে সঙ্কীর্ত্তন থামিল। কিন্তু গুরুভ্রাতাদের ভাবোচ্ছ্বাস আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে অনেকে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ দারুণ যন্ত্রনা প্রকাশ পূর্ব্বক হাত পা আছ্‌ড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঘন ঘন হাত নাড়া দিয়া— গাও গাও মধুর করে গাও, মধুর করে গাও, বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণুবাবু নৃত্য করিতে করিতে মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।
শুন ওহে বনমালী, আমরা ভাঙ্গবো তোমার নাগরালি,
কুঙ্কুম মারিব তোমার রাঙ্গা চরণে ॥

এই সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে আবির, কুঙ্কুমাদি পড়িতে লাগিল। ঠাকুরের পদাশ্রিত সকলেই মনের সাধে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আবির ছুড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরও— জয় রাধে, শ্রীরাধে বলিয়া প্রচুর পরিমাণে আবির সকলের গায়ে দিতে আরম্ভ করিলেন। মদনোৎসবের মধুর কীর্ত্তনে সকলেই আজ মাতোয়ারা। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত এই ভাবে আনন্দ করিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আসিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ গান কর্‌লেন কে? আমি অমনি বলিয়া ফেলিলাম—

মহাবিষ্ণুবাবু ভাগলপুর হইতে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই গান করিলেন। ঠাকুর খুব সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—**কাল প্রাতেই তাঁর দীক্ষা হবে। বলে দিও।** আমি বিষ্ণুবাবুকে দীক্ষার সংবাদ দিয়া, রাত্রি ১২টার সময়ে একরামপুর পঁহুছিলাম। সজনীর বাসায় উপস্থিত হইয়া, তাহাকে ভোর বেলায় গেণ্ডারিয়া যাইতে বলিয়া আসিলাম। সজনীর দীক্ষার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি।

২৯শে ফাল্গুন, শনিবার। প্রত্যুষে সজনী আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঠাকুরকে উহার দীক্ষার কথা বলায়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—**তোমার দাদার অনুমতি আছে তো? অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন তো হয় না।** আমি বলিলাম—দাদা এতে আনন্দই করবেন। এখন আর তাঁর অনুমতি কিরূপে নিব?

ঠাকুর—**যাক, তুমিও তো ওর অভিভাবক। তা তোমার অনুমতিতেই হবে।** এই বলিয়া মহাবিষ্ণুবাবুর সঙ্গেই সজনীর দীক্ষা হইবে বলিলেন। সজনী ও মহাবিষ্ণুবাবু নদীতে স্নান করিতে গেলেন। ঠাকুর চা সেবার পর উহাদের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—চা সেবার পর দীক্ষা হইবে শুনিয়া উহারা নিশ্চিন্ত আছে। ঠাকুর কহিলেন—**দীক্ষার একটা শুভ মুহূর্ত্ত আছে। সেই সময় অতীত হলে ঠিক হয় না।** এই কথা শুনিয়া আমরা ছুটাছুটি করিয়া উহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। বেলা প্রায় ৯ টার সময়ে দীক্ষা হইল। ঠাকুর সাধারণতঃ যে নাম দিয়া থাকেন, উহাদিগকে তাহা দিলেন না। সজনী যে নাম পাইল, আমাদের পরিবারের কেহ তাহা পায় নাই। এ পর্য্যন্ত তিনটি নাম আমাদের পরিবারে দিলেন। সজনীর দীক্ষাতে বড়ই নিশ্চিন্ত হইলাম।

মহাবিষ্ণুবাবুর সহিত ঝগড়া—সন্ধ্যা করিতে ঠাকুরের আদেশ।

মধ্যাহ্নে ভাগবতপাঠের পর ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, বিষ্ণুবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু ইহারা কেহ সন্ধ্যা করে না কেন? আপনি কি এদের সন্ধ্যা করতে নিষেধ করেছেন? লোকে ইহাদের সম্বন্ধে নানা আলোচনা করে, শুনতে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু তাদের কিছু বলতে পারি না, কারণ ইহারা বলেন—এসকলে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই—ঠাকুর সন্ধ্যা করতে বলেন নাই।

ঠাকুর—কেন? সাধন দেওয়ার সময়ে প্রথমেই তো বলে দিই—দেশগত সমাজগত ও কুলক্রমাগত রীতি-নীতি, আচার পদ্ধতি, সব বজায় রেখে সাধন পথে চল্‌বে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে চলা উচিত, সর্ব্বদাই তো বলি, ইহারা না মান্‌লে কি আর করা যায়? কথা মত কে আর চলে?

আমি সন্ধ্যা করি না বলিয়া, বিষ্ণুবাবু ভাগলপুরে প্রায়ই আমার সহিত ঝগড়া করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যা না করা অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া আমাকে শাসাইতেন। এখন ঠাকুরের কথায় বল পাইয়া, তিনি আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন—"কি ব্রহ্মচারী! তুমি সন্ধ্যা কর না কেন? ঠাকুর তো তোমাকে নিষেধ করেন নাই?" ঠাকুরের সম্মুখে বিষ্ণুবাবুর কথায় আমি ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর মুখবন্ধ করিতে ঠাকুরের কাছেই তর্ক আরম্ভ করিলাম। বলিলাম—সন্ধ্যা করি কি না, তুমি কিরূপে জান্‌লে? সন্ধ্যা তো মন্ত্র, তার মূল সদ্‌গুরুর বাক্য। ঠাকুরের আদেশ মতই চল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি, আর তুমি বল, আমি সন্ধ্যা করি না? কি রকম?

বিষ্ণুবাবু—তোমার উপনয়নকালে যে বৈদিক সন্ধ্যার উপদেশ হয়েছিল, তা তুমি কর?

আমি—সেই দীক্ষাকে তো আমি দীক্ষাই মনে করি নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে, তাহা তো একেবারেই ত্যাগ করেছিলাম। তাই আবার ব্রহ্মচর্য্য নিয়াছি। এই ব্রহ্মচর্য্যে যাহা যাহা আদেশ, তাহাই যথাসাধ্য প্রতিপালনের চেষ্টা কর্‌ছি। আর তুমি অনায়াসে বল্‌ছ, আমি সন্ধ্যা করি না? তুমি তো ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি। আমাদের ঝগড়ায় চাপা দিয়া, ঠাকুর আমাকে বলিলেন—উপবীত থাক্‌লেই সন্ধ্যা কর্‌তে হয়। সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য—নিত্যকর্ম্ম। প্রত্যহ সন্ধ্যা কর—উপকার পাবে। ঠাকুরের এই কথা শোনা মাত্র আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। আমি বলিলাম—সন্ধ্যা টন্ধ্যা আমি কর্‌তে পার্‌ব না। যা ব'লে দিয়েছেন তাই কর্‌তে পারি না, আবার সন্ধ্যা?

মহাবিষ্ণু—ওহে সন্ধ্যা না কর্‌লে পাপ হয়। সন্ধ্যা কর্‌তে এত ভয় কেন?

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—তুমি চুপ কর। পাপ-পুণ্যের ধার ধারি না। সে বিচার কর্‌বার কর্ত্তা একজন আছেন। গায়ত্রী জপেই সব হয়—জান?

ঠাকুর আমাকে বলিলেন—না, না, তুমি সন্ধ্যা করো। সন্ধ্যা কর্‌লে উপকার পাবে; শুধু গায়ত্রী জপে ঠিক্ হয় না।

আমি—হাঁ, যত বোঝা পারেন, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিন্‌। যে সকল নিত্যকর্ম্ম আমাকে বেঁধে দিয়েছেন, তা ঠিকমত করতে শেষরাত্রি হ'তে বেলা আড়াই প্রহর লাগে। ইহার উপরে ত্রিসন্ধ্যা করতে হলে আমার দফা শেষ। আদেশ হ'লে তো করতেই হবে? ও সব আমাকে বল্‌বেন না।

ঠাকুর—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা নিতান্তই প্রয়োজন। সন্ধ্যা আহ্নিক কর, উপকার হবে।

আমি—যে সময় ব'সে সন্ধ্যা কর্‌বো, সে সময়টা ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌লে তো আরও বেশী উপকার হবে?

ঠাকুর—না। সন্ধ্যা কর্‌লে ইষ্টনাম জপ করার মতই উপকার হবে।

আমি—সন্ধ্যা করায় ইষ্টনাম জপ করার মত ফলই যখন হয়, তখন জপ কর্‌লেই তো হলো। আবার সন্ধ্যার প্রয়োজন কি?

ঠাকুর—প্রয়োজন আছে। আমাদের এই সাধনে যে, লোকের শীঘ্র তেমন উন্নতি দেখা যায় না, তার হেতু, ক্ষেত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। ঋষিদের সময়ে আশ্রমানুযায়ী নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁরা ক্ষেত্রটি একেবারে পবিত্র ক'রে নিতেন। পরে এই পারমহংস ধর্ম্ম অবলম্বন করতেন। তাই ফলও খুব শীঘ্র লাভ হতো।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি 'কপালের ভোগ' মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে সময়ান্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম—অনেকেই বলে, গুরু নিজ হ'তে যদি কিছু বলেন, তা হ'লেই তাঁর আদেশ। লোকের কথায় যাহা বলেন, তাহা যথার্থ তাঁর আদেশ নয়। আমাকে সহস্রবার গায়ত্রীজপ করতে বলেছেন, আমি তাই করি। আমার মনে হয়, বিষ্ণুবাবুর কথায় সায় দিতে ওসব কথা আমাকে বলেছেন। যার পক্ষে যা নিতান্ত কর্ত্তব্য দীক্ষাকালেই তো বলেন। দীক্ষার সময় তো সন্ধ্যার কথা আমায় বলেন নাই?

ঠাকুর একটু বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—খেয়ে আঁচাবে, হেগে শোচাবে, এসব কথাও কি দীক্ষার সময় বল্‌তে হবে? যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম তা তো কর্‌বেই। প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ ক'রে না বল্‌লে কর্‌বে না? শাস্ত্র-সদাচার মত চল্‌বে, একথা তো বলাই হয়।

আমি আর কিছু বলিতে সাহস পাইলাম না। ঠাকুরের আদেশমত অগত্যা সন্ধ্যা করিব স্থির করিলাম।

আমি—সন্ধ্যা না কর্‌লে কি কিছু হবে না? আমাদের মধ্যে কয়জন আর সন্ধ্যা করে?

ঠাকুর—ব্রত ভিন্ন ভিন্ন। যাঁরা গৃহস্থ তাঁদের একপ্রকার; আর সারাজীবন যাঁরা ধর্ম্ম নিয়ে থাক্‌বেন তাঁদের অন্যপ্রকার। তোমার ধর্ম্ম নিয়েই জীবন যাপন কর্‌তে হবে। সুতরাং, নিত্যকর্ম্মের কিছুই তোমার বাদ দেওয়া চল্‌বে না। সন্ধ্যা কর্‌তে কোন কষ্ট নাই। কয়দিন একটু অভ্যাস কর্‌লেই হবে। পরে ওতে আরাম পাবে—উপকারও হবে।

আমি বলিলাম—এতক্ষণ আমি বুঝি নাই। এখন মনে হইতেছে, সন্ধ্যার ব্যবস্থা আমার উপর করিয়া আমাকে বিশেষ কৃপাই করিলেন। অবিচ্ছেদে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা অত্যন্ত কঠিন। বহু চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, হয় না। কিন্তু পূজা-অর্চ্চনা, হোম-পাঠ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে অনায়াসে আরামের সহিত দিন কাটান যায়। এসকলে সময় অতিবাহিত করা ও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিয়া সময় ব্যয় করার ফল যদি ঠিক একই হয়, তবে এ সমস্ত কাজ দিয়া তো আমাকে বিশেষ কৃপাই করিলেন।

ঠাকুর—হাঁ, যা ব'লেছি তাই গিয়ে কর। সন্ধ্যা, হোম, গায়ত্রী, পাঠ এসকল করায় তোমার নাম করার মতই উপকার হবে।

আমি—সন্ধ্যায় তো নানাপ্রকার রূপ ধ্যান কর্‌তে হয়, আমি ওসব চতুর্ভুজ, রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ধ্যান কর্‌তে পার্‌ব না। ওসব আমার একেবারেই আসে না। আমি ইষ্টদেবতার রূপ অন্তরে রাখিয়া সন্ধ্যার মন্ত্রগুলিমাত্র আওড়াইয়া যাইব; এবং ওসব মন্ত্র আমার ঠাকুরেরই স্তব, তাঁরই রূপ বর্ণন মনে করিব। এরূপ কর্‌লেই হইবে তো?

ঠাকুর—হাঁ, তাই করো। ওতেই হবে।

আমি—শালগ্রাম ত আমার জুটিল না। যদি জুটিয়া যায়, কি প্রকারে অভিষেক ও পূজা করিব?

ঠাকুর—গায়ত্রীজপে অভিষেক ও যথাশাস্ত্র প্রণালীমত তাঁর পূজা করো। শালগ্রামের পূজাপদ্ধতি কিন্‌তে পাওয়া যায়।

আমি—শালগ্রাম কি সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌তে হবে, না একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখ্‌ব?

ঠাকুর—শালগ্রাম সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌বে। ছোট কণ্ঠশালগ্রাম পাওয়া

যায়। উহা কৌটায় করে সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌তে হয়। সাধুরা উহা গলার ভিতরে কণ্ঠায় রাখেন।

আমি—শুনিলাম এবার নাকি আমার উপর অনেক পরীক্ষা। চিম্‌টার বাড়িও নাকি অনেক খেতে হবে। চিম্‌টার বাড়ী খাওয়াইতে আর তফাৎ করিয়া দেন কেন? আপনিই তো চিম্‌টার বাড়ি মারিয়া সঙ্গে রাখিতে পারেন। আর আমি কি পরীক্ষা দেওয়ার মত হইয়াছি? আমাকে আবার পরীক্ষা কেন?

ঠাকুর—আসনে স্থির থেকো, কোন ভয় নাই। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ কর্‌লেই চিম্‌টার বাড়ী খেতে হয়।

আমি—পাহাড়ে থাকার যদি তেমন অসুবিধা হয়, তবে পাহাড়ের ধারে থাকৃতে পার্‌ব কি না?

ঠাকুর—খুব পার্‌বে। হরিদ্বারে গিয়ে যেখানে ভাল লাগ্‌বে, সেখানেই থাক্‌বে। তাতেই পাহাড়বাস হবে।

আমি—আপনাকে যদি দেখ্‌তে খুব ইচ্ছা হয়, তখন কি কর্‌ব?

ঠাকুর—যখন তেমন ইচ্ছা হবে চ'লে আস্‌বে। মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্রও লিখ্‌তে পার্‌বে।

আমি—হরিদ্বারে থাওয়ার খরচ কি এখান হতেই সংগ্রহ করে নিব?

ঠাকুর—না, গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাওয়ার ভাড়া এখান থেকে নিয়ে যেও। আর সমস্ত রাস্তায়ই জুটে যাবে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। হরিদ্বারে যাইতে অস্থিরতা আসিয়া পড়িল।

অভয় কবচলাভ। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ—ভয় নাই।

আজ শেষরাত্রে হরিদ্বার যাত্রা করিব সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুরকে জানাইলাম। ঠাকুর খুব আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটী ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছি ঠাকুরকে বলায়, তিনি উহা শুনিতে চাহিলেন। আমি কহিলাম—পাহাড়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়া, আপনার শ্রীচরণে বিদায় নিতে যেমন নমস্কার করিলাম, আপনি একটী তাগা আমার দক্ষিণ বাহুতে পরাইয়া দিয়া

২৬শে ফাল্গুন, বুধবার।

বলিলেন—তোমাকে এই অভয় কবচ দিচ্ছি, পাহাড়ে পর্ব্বতে যেখানে ইচ্ছা গিয়ে থাক—আর কোন ভয় নাই। আপনার এই আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—বেশ দেখেছ, সচ্ছন্দে চলে যাও, কোন ভয় নাই।

গোয়ালন্দে সিপাহীর তাড়া। কুলীর ডিপোতে আটক থাকা। ঠাকুরের অদ্ভুত ব্যবস্থা।

আজ সারাদিন ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। ক্ষণে ক্ষণে ঠাকুর স্নেহ মমতাপূর্ণ-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমাকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। আজ সমস্তটি দিন আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। আহারান্তে রাত্রি ১১টার সময়ে দক্ষিণের ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। শেষ রাত্রে ঠাকুর আমাকে জাগাইতে যোগজীবনকে পাঠাইয়া দিলেন। যোগজীবনের ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম। শৌচাদি সমাপনান্তে ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ধোলাইগঞ্জ ষ্টেসনে রওয়ানা হইলাম। চার পাঁচটী গুরুভ্রাতা আমার সঙ্গে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের 'কেলে' কুকুরটি তিন চার বার আসিয়া পায়ের উপরে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। 'কেলে' ষ্টেসন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল। গাড়ীতে উঠিবার পরে 'কেলে' চীৎকার করিতে লাগিল। সকালবেলা নারায়ণগঞ্জ পঁহুছিয়া গোয়ালন্দের ষ্টীমারে উঠিলাম। সন্ধ্যার পর গোয়ালন্দ উপস্থিত হইলাম। জিনিসপত্র লইয়া ষ্টেসনে নামিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন কোথায় যাই। আসন, ঝোলা, কম্বল, ঘটি লইয়া পাঁচ মিনিটও চলিতে পারি শরীরে এমন সামর্থ্য নাই। এদিকে রিক্ত হস্ত, কুলীর সাহায্য লইবারও উপায় নাই। তা ছাড়া যাইবই বা কোথায়? ষ্টেসনের অনতিদূরে বিস্তৃত ময়দানের ধারে একটী বড় গাছ দেখিয়া তাহারই নীচে যাইয়া আসন করিয়া বসিলাম; এবং নিরুপায় হইয়া একান্ত প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে একটী বিকটাকার হিন্দুস্থানী সিপাহী আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধমক্ দিয়া বলিল—"কোন্ হ্যায় রে? ক্যাত্না মাল চুরি কিয়া?" আমি উহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সিপাহী আমাকে বলিল—"চল্—হামারা সাথ্ চল্।" আমি জিনিসপত্র ঘাড়ে লইয়া, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, এবং একটী প্রকাণ্ড কুলী ডিপোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সিপাহী আমাকে একটী কোঠার বারান্দায় রাখিয়া চলিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একটী বাবু

আসিয়া আমার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমাকে বলিলেন—"আমার সঙ্গে আসুন।" একটী কুলী আমার আসন কম্বলাদি ঘাড়ে লইয়া, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমি বাবুটির সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীতে পঁহুছিয়াই তিনি তাঁর স্ত্রীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন—"কোথা গো! শীঘ্র এস। দেখ এসে তোমার জন্য একটী সুন্দর কুলী ধরে এনেছি।" স্ত্রী দূর হইতে আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া, আমার পায়ের উপর পড়িল; এবং নমস্কার করিয়া খুব বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "একি দাদা! আপনি হঠাৎ এখানে কোথা হতে এলেন? আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন? আমি যে আপনার বোন্ প্রবাসিনী।" আমি আমার পিস্‌তুতো ভগিনীকে ওখানে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। প্রবাসিনী আগ্রহে আমার থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া অনতিবিলম্বেই রান্নার যোগাড় করিয়া দিল। খিচুড়ি রান্না করিয়া, আহারান্তে তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া শ্রান্তদেহে শয়ন করিলাম। পরদিন আমার সমস্ত খবর জানিয়া লইয়া, ভগ্নী স্বামীকে বলিল—"দাদার হাতে একটী পয়সাও নাই। যাহাতে কলিকাতা আরামে পঁহুছিতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন।" যথাসময়ে ভগ্নীপতি আমাকে ইণ্টারক্লাশের একখানা টিকেট করিয়া দিয়া, গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। আমি স্বচ্ছন্দে পরদিন প্রত্যুষে শিয়ালদহ পঁহুছিয়া ভাগিনেয়ের বাসায় উঠিলাম। ছোট দাদাও এখন এই বাসায়ই থাকেন। তিন চার দিন আমাকে কলিকাতায় অপেক্ষা করিতে হইল।

কলিকাতায় এই কয়দিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাইলাম। বেলা দশটা পর্য্যন্ত আসনের কার্য্য করিয়া শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসায় যাইতাম। তথায় অপরাহ্ণ চারটা পর্য্যন্ত একাকী থাকিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতাম। রাত্রে ভাগিনার বাসায়ই থাকা হইত।

তারকনাথ দর্শন। বিপত্তি। আশ্চর্য্যরূপে গয়ায় পঁহুছান।

বাবা তারকনাথকে দেখিতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। আমি তারকেশ্বর যাইব স্থির করিলাম। আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ছোটদাদা আমাকে তারকেশ্বরের টিকেট করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তারকেশ্বরে পঁহুছিলাম। কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, কিছুই স্থির নাই। একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তারকেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই কোন একটা স্থানে পড়িয়া থাকিব মনে করিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেসন হইতে বাহিরে যাইব এমন সময়ে একটী

১লা চৈত্র, সোমবার।

লোক আসিয়া বলিল—"বাবাজী! আপনাকে একবার ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, এই অনুরোধ করিয়াছেন।" আমি লোকটির সহিত ষ্টেসন মাষ্টারের কামরায় উপস্থিত হইলাম। তিমি আমাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। অনেকক্ষণ ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে প্রচুর গরম দুধ ও মিষ্টি আমার আহারের জন্য আনিলেন। ভোজনের পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর একটী কামরায় আমার থাকিবার সুব্যবস্থা করিলেন। আরামে বেশ সুনিদ্রা হইল। সকাল বেলা উঠিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের একটী লোকের সহিত মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে ঠাকুরের আরতি দর্শন হইল। স্নানান্তে ৺তারকনাথের পূজা করিব, স্থির করিয়া, মন্দিরের সংলগ্ন পুকুরপাড়ে গিয়া বসিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই মহামায়ার প্রভাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম। 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ' করিয়া স্নান তর্পণ করিয়া মন্দিরে গেলাম। তারকনাথকে জল বিল্বপত্র দিয়া মনের সাধে পূজা করিলাম। পরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোথায় যাই? ঠিক এই সময়ে একটী ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন—"বাবাজী! দয়া করিয়া একবার আমার বাড়ী চলুন।" আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার জন্য হোমের আয়োজন করিয়া দিয়া, বিবিধ প্রকার ফল, মিষ্টি, দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। কোন প্রকারে এখন রাণীগঞ্জ পঁহুছিতে পারিলে সেখানে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তাঁহার নিকট হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিবার রেল ভাড়া পাইব এই প্রত্যাশায় রাণীগঞ্জ যাওয়ার ইচ্ছা হইল। বৈদ্যনাথে আমার যাওয়ার অভিপ্রায় মনে করিয়া ষ্টেসন মাষ্টার আমাকে অযাচিত ভাবে নিজ হইতেই একখানা টিকেট করিয়া দিলেন। আমি বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলাম।

৩রা চৈত্র, বুধবার।

রাত্রি ৯টার সময়ে রাণীগঞ্জ ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত রাণীগঞ্জ আছেন মনে করিয়া ষ্টেসনে নামিলাম। তাঁহার বাসা খাঁরগুলী বাজার। দু তিন জনকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—"সে বাসা প্রায় এক ক্রোশ তফাৎ হইবে—এই রাস্তা ধরিয়া যাও।" আমি আসন, ঝোলা কাঁধে লইয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে একাকী ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকটা পথ চলিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। তখন একটী ভদ্রলোকের বাড়ীর রোয়াকে আসন, ঝোলা রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বাড়ীর একটী ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া

আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহাকে দেবেন বাবুর বাসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া ঘরে নিয়া বসাইলেন, এবং বলিলেন—এই বাসাই দেবেন বাবুর। দেবেন দাদা আমার পত্র পাইয়াও বিশেষ কার্য্যানুরোধে বর্দ্ধমান গিয়াছেন, এবং চার পাঁচদিন তথায় থাকিবেন, বলিলেন। শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। দেবেন দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অনায়াসে হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়ার সুব্যবস্থা হইবে, শুধু এই ভরসা করিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। কিন্তু হায়! একি সর্ব্বনাশ হইল! একটী ষ্টেসনে যাওয়ারও সংস্থান নাই, এখন কোথায় যাই! সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। গদির গোমস্তাটি আমাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিয়া যথাবিধি হোম, পাঠ ও ন্যাসাদি করিলাম। কয়েকটী ভদ্রলোক আমার নিত্যক্রিয়া দেখিয়া খুব আনন্দলাভ করিলেন, এবং আমাকে কিছু কিছু প্রণামী দিয়া পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, ঠিক গয়া পর্য্যন্ত পঁহুছিবার ভাড়া ঠাকুর আমাকে এইভাবে দয়া করিয়া জুটাইয়া দিয়াছেন। হরিদ্বারে যাওয়ার সময়ে গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। আমি যথা সময়ে ষ্টেসনে আসিয়া গয়ার টিকেট করিলাম, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে গয়া যাত্রা করিলাম।

গয়ায় থাকার সুব্যবস্থা।

৫ই চৈত্র শুক্রবার।

অধিক রাত্রে বাখ্তিকপুর ষ্টেশনে নামিতে হইল। ষ্টেশনের বারাণ্ডায় অপরাপর যাত্রীদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিলাম। খুব ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, সাধুবেশ দেখিয়া একটী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজ হইতে আধ পোয়া লুচি ও মিষ্টি আনিয়া আমাকে আহার করিতে দিলেন। তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিয়া শয়ন করিলাম। সকাল বেলা গয়ার ট্রেণ আসিলে, তাহাতে চাপিয়া প্রায় ৯টার সময়ে গয়া পঁহুছিলাম। শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় এই গয়াতেই আছেন, শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বাসা কোথায় জানি না। অচেনা সহরে তাঁহার বাসা খুঁজিতে হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। চানচৌরা নামক স্থানে আসিয়া একটী বাঙ্গালী যুবককে দেখিয়া মনোরঞ্জন বাবুর বাসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম ভদ্রলোকটি আমাকে অতিশয় শ্রান্ত দেখিয়া তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আমি একটু সুস্থ হইলে, আমাকে তিনি ঐ বাসায় পঁহুছাইয়া দিবেন বলিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বাসার সকলেই আমাকে খুব আপনার করিয়া লইলেন; এবং সাদরে আমার স্নান, সন্ধ্যা-তর্পণ ও হোমাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বাহিরের একখানা নির্জ্জন ঘর আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যে কয়দিন গয়াতে থাকিব এই বাড়ীতেই যাহাতে আমি আসন রাখি তজ্জন্য ইঁহারা সকলেই বিশেষ জেদ্ করিতে লাগিলেন। অগত্যা আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। শ্রীযুক্ত হীরালাল, মতিলাল, কৃষ্ণলাল ও নন্দলাল বাবু সস্নেহে ঠিক যেন সহোদরের মতই আমার প্রতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইংরাজী সুশিক্ষিত ও জাতিতে কায়স্থ হইলেও ইঁহাদের আচার ব্যবহার সদাচারী সদ্‌ব্রাহ্মণের মত। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে অল্পকাল মধ্যেই আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। সর্ব্বদাই কেহ না কেহ আমার নিকটে থাকিতেন। সকালে চা খাওয়া হইতে আহারান্তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়ত আমার নিকটে থাকিয়া ইঁহারা প্রয়োজনমত সেবা করিতে লাগিলেন। এ সমস্ত আমার ঠাকুরেরই অপরিসীম দয়া মনে ভাবিয়া, আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের উপরে ছাড়িয়া দিলে, তিনি কি ভাবে যে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করেন ইহাই দেখিবার বিষয়।

গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়। রঘুবর বাবা।
শেষ চক্র সংগ্রহ।

বিকালবেলা নন্দলাল বাবুর সহিত আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গেলাম। সিদ্ধ রঘুবর বাবাজীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া খুব আদর করিয়া বসাইলেন, এবং আশ্রমটি দেখাইলেন। সমতল, প্রায় দুই কাঠা, আড়াই কাঠা জমির উপরে আশ্রম। গোদাবরীর রাস্তা হইতে তিন চার মিনিট উত্তরদিকে চলিয়া, বামে মুরলী, ও দক্ষিণে আকাশগঙ্গা পাহাড়। কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উভয় পাহাড়ের সন্ধিস্থলে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করিলাম; এবং মহাবীরজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া নমস্কার করিলাম। মূর্ত্তির সম্মুখে ৭।৮ হাত প্রস্থ ১০।১২ হাত লম্বা একটী বাঁধান আঙ্গিনা। আঙ্গিনার পূর্ব্বদিকে মহাবীরজীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটী বেলগাছ। এই বেলগাছের নীচে আঙ্গিনা হইতে প্রায় দেড় ফুট উঁচুতে ৬ ফুট দীর্ঘ ৪ ফুট প্রস্থ পরিষ্কার একখানা প্রস্তর উত্তর দক্ষিণে লম্বা পাতা রহিয়াছে। বাবাজী কহিলেন— দীক্ষালাভের পরে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ঠাকুর ঢুলিতে ঢুলিতে এই বেলতলায় প্রস্তরের চটাঙ্গের উপরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। এবং ১১ দিন ১১ রাত্রি অবিচ্ছেদে একই ভাবে সমাধির

অবস্থায় তিনি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবাজী নিয়ত নিকটে থাকিয়া ঠাকুরের দেহরক্ষা করিতেন। এই প্রস্তরখণ্ডের গা ঘেঁসিয়া পূর্ব্বদিকে একটী প্রকাণ্ড পাথরের চটাঙ্গ। এই চটাঙ্গের নীচে একটী সুন্দর গোফা। প্রায় ৪ ফুট প্রস্থ ও ৬ ফুট লম্বা হইবে। ঠাকুর এই গোফার ভিতরে বসিয়া অনেকদিন নির্জ্জন-সাধন করিয়াছিলেন।

আশ্রমের উত্তর প্রান্তে দুই খানা কোঠা ঘর। পূর্ব্বদিকের ঘরখানা বাবাজীর ভাণ্ডার। এবং সংলগ্ন পশ্চিমে তাঁহার আসনকুটীর, উভয় ঘরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে প্রায় পাঁচ ফুট প্রস্থ ১৮।২০ ফুট লম্বা দরদালান। এই দালানের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসীদের থাকিবার বড় একখানা কোঠা ঘর, ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়ই মহাবীরজী প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের পশ্চিম দিকে প্রায় ২৫।৩০ ফুঠ নীচুতে সুন্দর আকাশগঙ্গা ঝরণা, একটী কুণ্ড জলে পরিপূর্ণ রাখিয়া, কল কল শব্দে দক্ষিণে নিম্ন ভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের দক্ষিণে বেলগাছ, পূর্ব্বে বট, অশ্বত্থ এবং উত্তরে নিমগাছে ছাতার মত সমস্ত আশ্রমটিকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। আশ্রমে বসিয়া দক্ষিণদিকে সমস্ত গয়া সহর, বিষ্ণুপদের মন্দির ও ফল্গুর অপর পারে রামগয়া পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়।

আশ্রমের পূর্ব্বদিকে প্রায় দুই শত ফুট সোজা উঠিয়া ঠাকুরের দীক্ষার স্থান। নতশিরে থাকা হেতু তাহা আমার নজরে পড়িল না। পাহাড়ের সম্মুখের ও নিম্ন দিকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। বাবাজী আমাকে বেলগাছের নীচে বসাইয়া অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন—"হরিদ্বারের পাহাড়ে তোমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি এই পাহাড়ে আমার আশ্রমে থাক, এখানে থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভজন সাধন কর। আমি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তোমাকে খাওয়াইব। আমিই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। তোমার গুরুজীকে আমি সব সংবাদ দেই। তিনি ইহাতে সন্তুষ্টই হইবেন।" আমি বলিলাম—আমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার অপর আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহাই করিব। হরিদ্বারেই যাইব নিশ্চয় করিয়াছি। বাবাজী বলিলেন—"আচ্ছা, এখন তুমি যাও, কিন্তু এর পর আমি তোমাকে এখানে আনিব।" বাবাজীর নিকটে লক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম চাওয়াতে, তিনি একটী নখপরিমিত সর্পাঙ্কিত শিলাচক্র দেখাইয়া বলিলেন—"এটী বড় উৎকৃষ্ট চক্র। ইচ্ছা হইলে নিতে পার। ইহার নাম 'শেষ'। এই চক্রটি নেপালের নরসিংহ নদী হইতে আনিয়াছিলাম। ঐ নদীতে তুলসী চন্দন পুষ্পাদিদ্বারা শালগ্রাম উদ্দেশে পূজা করিলে শিলাচক্র নিকটে আসেন। গামছা বা বস্ত্র পাতিয়া রাখিলে উহার উপরে উঠিয়া পড়েন

তখন তুলিয়া নিতে হয়। কোন কোন শালগ্রামের ভিতরে স্বর্ণ থাকে, উপরে চিহ্ন দেখিয়া বুঝা যায়। ওখানকার পাহারাওয়ালারা উহা বাহির করিয়া লয়, এই চক্রটি আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, দুর্ল্লভ বস্তু বলিয়া, এতকাল গোপনে রাখিয়াছি" বাবাজীর এসকল কথা কিছুই আমার মনে লাগিল না। মনে হইল কাল কষ্টি পাথরের উপরে সুনিপুণ কারিকরের দ্বারা একটী সর্পের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাবাজীর কথায় শিলাটি সঙ্গে করিয়া আনিলাম। হেঁট মস্তকে থাকার দরুণ পাহাড়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাবাজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, নন্দবাবুর সহিত বাসায় আসিলাম।

বাড়ীর মেয়েরা খুব শ্রদ্ধার সহিত আমার রান্নার যোগাড় করিয়া দিলেন। দিবসান্তে আহার করিয়া আরামে শয়ন করিলাম।

নিঃসম্বল মনোরঞ্জন বাবু। ফল্গুতে স্নান।

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় গুরুদেবের আদেশক্রমে সপরিবারে গয়াতে আছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রেবতী বাবু, বেণী বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারাও সঙ্গে রহিয়াছেন। একটী পয়সাও আয় নাই, সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তির উপরে নির্ভর। অপরিচিত স্থানে বহু পুষ্যি লইয়া, নিঃসম্বল অবস্থায় যেভাবে তিনি দিন কাটাইতেছেন, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। সংসারে এরূপটি কোথাও আছে কি না জানি না। গয়াতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহার বাসার কোন খোজ পাই নাই—দেখাও হয় নাই। আজ তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল, ঠাকুরের কৃপায় মনোরঞ্জন বাবু লোকপরম্পরায় আমার কথা শুনিয়া, বেলা প্রায় ৮টার সময়ে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন—"ফল্গুতে জল আসিয়াছে, চলুন স্নান করিয়া আসি। ফল্গু অন্তঃসলিলা। এ সময়ে কখন জল দেখা যায় না। উত্তপ্ত বালি একটুকু খুঁড়িলেই বরফের মত নির্ম্মল শীতল জলে গর্ত্ত পরিপূর্ণ হয়। সর্দ্দিজ্বরের ভয়ে কেহ এই জলে স্নান করে না। জল আসিয়াছে শুনিয়া, মনোরঞ্জন বাবুর সহিত স্নান করিতে গেলাম; অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলে বহুক্ষণ থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া স্নান তর্পণ করিলাম। শুনিয়াছি ফল্গুতে স্নানান্তে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে বালির পিণ্ড দিতে হয়। পরে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার হইয়া যান। আমি তিন মুষ্টি বালি লইয়া, পিতা ও পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত্যর্থে প্রদান করিলাম। পরে বিষ্ণুপদে যাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি ও কল্যাণার্থে, জল তুলসীদ্বারা পূজা করিয়া, বাসায় আসিলাম। হোম সমাপনান্তে গরম চা পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম।

৭ই চৈত্র, রবিবার।

সূক্ষ্মতত্ত্ব—অতীন্দ্রিয়।

অপরাহ্ণে মুন্সেফ্, সব্‌জজ্, উকিল, ডেপুটি প্রভৃতি কতকগুলি সুশিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলে তাহাতে যে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ হয়, তার কি কোন প্রমাণ আছে?" আমি বলিলাম—এ বিষয়ে আমিও একবার কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু সে সব প্রমাণ গ্রহণের যোগ্যতা তো আমাদের নাই! সূক্ষ্ম পারলৌকিক তত্ত্ব স্থূল জাগতিক দৃষ্টান্তে কি প্রকারে বুঝা যাইবে? অতীন্দ্রিয় বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বুঝিতে চাই। তাহা কি কখনও হয়?" আমি তাঁহাকে বলিলাম—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। জ্ঞেয় বিষয় এমন কি থাকিতে পারে, যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা বুঝা যাইবে না? তিনি কহিলেন—"যিনি কখনও কোন বস্তু জীবনে দেখেন নাই—জন্মান্ধ, তাহাকে কি কেহ দৃষ্টান্তদ্বারা দৃশ্য বস্তু ও বিচিত্র কারুকার্য্য বুঝাইতে পারে? সহস্রবার বলিলেও তিনি দৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিবেন না। জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, ত্বকের সমস্ত বিষয়ই বুঝিবেন; কিন্তু চক্ষুর গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকিবেন। সেই প্রকার ভগবানের সৃষ্ট এমন বহু বিষয় আছে যাহা ষষ্ঠ, সপ্তমাদি ইন্দ্রিয় বিকশিত হইলে জানিতে পারা যায়। একমাত্র সাধনের দ্বারাই সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত হয়। অতীন্দ্রিয় অর্থ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত।" এই সময়ে একটী সাধু আমার কথায় বাধা দিয়া উঁহাদিগকে বলিলেন, সাধনবলে দৈহিক আবরণ ভেদ হইলে, এই ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারাও সাধক সাধারণের অগম্য কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও পারলৌকিক জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারেন। এই কথা লইয়া ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ চলিল, আমিও বাঁচিলাম। ভগবানের অনন্ত সৃষ্টি অনন্ত জ্ঞানলাভের জন্য জীবাত্মার চতুর্দ্দিকে অনন্ত দ্বার রহিয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইলেও, তাহা দ্বারা শুধু স্থূল পঞ্চ ভূতেরই জ্ঞানমাত্র লাভ করা যায়। সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করার অধিকার হয় না। আজ ধর্ম্মালোচনায় দিনটি আনন্দে অতিবাহিত হইল।

বুদ্ধগয়া দর্শন।

ফল্গুতে ঠাণ্ডা জলে বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়াছিলাম। তাহাতে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। মনোরঞ্জনবাবু আমাকে বুদ্ধগয়ায় লইয়া যাইতে আসিলেন। হীরালালবাবু

কয়েকখানা গাড়ী ভাড়া করিলেন, বেলা প্রায় ১টার সময়ে আমরা সকলে বুদ্ধগয়ায় রওয়ানা হইলাম। রাস্তায় আমার জ্বর হইল। মাথাধরায় শরীর মন অস্থির হইয়া পড়িল। ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দিরাদি কিছুই দর্শন করিতে পারিলাম না। এই মন্দির এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি বহুশত বৎসর বালির নীচে চাপা ছিল। কিছুকাল হয় সরকার এ সকল উদ্ধার করিয়াছেন। এখনও কত জিনিষ মাটির নীচে পড়িয়া আছে বলা যায় না। আমি কোনও প্রকারে মন্দিরটি দর্শন করিয়া, উহার পশ্চাৎ দিকে বোধিদ্রুমের তলায় গিয়া বসিলাম। একান্ত মনে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়া, নাম করাতে বড়ই আরাম পাইলাম। মন্দির পরিবেষ্টনের প্রান্তভাগে নূতন মন্দিরে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলাম। শরীরের অবস্থা অতিশয় কাতর বোধ হওয়ায় অবিলম্বে বাসায় চলিয়া আসিলাম; এবং প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। বাড়ীর বাবুরা সহরের বড় ডাক্তার আনাইয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ৫।৭ দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হইলাম। অসুখের সময়ে মতি বাবু আমার নিকটে থাকিতেন। ঠাকুরের কথা শুনিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। আমি তাঁহার নিকটে ঠাকুরের কথা কহিতাম; ইহার ফলে তিনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিলেন। জানিলাম অচিরেই তিনি দীক্ষালাভ করিবেন।

সাধুর আক্রোশে ভূতের উপদ্রব।

মতিবাবু প্রভৃতির নিকটে তাহাদের পারিবারিক একটী দুর্ঘটনা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। একটী সাধুর আক্রোশে এই পরিবার ভূতের উপদ্রবে বিষম বিপন্ন হইয়াছিলেন। সাধুটি ইহাদের বাড়ীতে প্রায়ই ভিক্ষা করিতে আসিতেন। অবাধে ভিক্ষা পাওয়ায় তিনি দুএকদিন অন্তর অন্তর আসিতে লাগিলেন। ইচ্ছামত জিনিষ না পাইলে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক গালাগালি করিতেন। একদিন গৃহস্বামী উহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, দ্বারবানকে বলিলেন—উহাকে বাহির করিয়া দাও, আর কখনও এখানে না আসে। দ্বারবান সাধুকে নাকি কিছু অপমান করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। সাধু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, "আরে পাষণ্ডি সাধু নেহি মান্‌তা হায়? আচ্ছা হাম্‌বি দেখ লেয়েঙ্গে।" এই বলিয়া "নরশিং নরশিং" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে চিমটাদ্বারা দ্বারে তিনটী ঘা মারিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পরই এই বাড়ীতে ভূতের বিষম উপদ্রব আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পর সমস্ত ঘরের জানালা দরজা বন্ধ থাকিলেও অকস্মাৎ দুড়ুম্ দাড়ুম

শব্দে খুলিয়া যাইত। প্রদীপ লণ্ঠনাদি হঠাৎ একেবারে নির্ব্বাণ হইত, ইট, পাট্‌কেল, ধূলা, বালি শূন্য হইতে ঘরের মধ্যে পড়িতে থাকিত। আহারের পাত্রে ময়লা, রাবিশ, হাড় প্রভৃতি কোথা হইতে আসিয়া পড়িত। এই অবস্থায় কয়দিন আর থাকা যায়? বহু চেষ্টায়ও কোন প্রকার প্রতীকার করিতে না পারিয়া, অবশেষে সকলে বাঁকীপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানেও ঠিক্ এই প্রকার উপদ্রবই হইতে লাগিল। তখন আরাতে একটী শক্তিশালী ফকিরের সন্ধান পাইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির সাহেব মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, শঙ্খ ধ্বনি করিয়া ভূতকে তাড়াইয়া দিলেন। সেই হইতে আর কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। ঘটনাটি শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। কি ভাবে কোথা হইতে শূন্য পথে এ সকল ইট, পাট্‌কেল, রাবিশ, ময়লা আসিয়া পড়ে, কে এ সকল লইয়া আসে, দরজা জানালা কে বন্ধ করে, প্রদীপাদি কি প্রকারে এককালে নির্ব্বাণ হয়, প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুই বুঝা যায় না। এ সকল অলৌকিক কার্য্য যাহাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সাধক সাধনবলে সেই সকল পরলোকগত আত্মার উপরে আধিপত্য ও শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারেন, ইহা আরও বিস্ময়কর।

ব্রজমোহনের অলৌকিক দীক্ষা।

পাঁচ ছয়দিন শয্যাগত থাকিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলাম। পথ্য পাইয়াই কুঞ্জের নিকটে আরায় যাইতে ব্যস্ত হইলাম। আমার হাতে কিছুই নাই জানিয়া বাবুরা আমাকে আরা পর্য্যন্ত যাওয়ার টিকেট করিয়া দিলেন। ১৬ই চৈত্র কুঞ্জের নিকটে পঁহুছিলাম। কুঞ্জের জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয় আবগারী বিভাগে ইনস্‌পেক্টর। আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। যে কয়দিন কুঞ্জের নিকটে রহিলাম, ঠাকুরের প্রসঙ্গে বড়ই আনন্দ পাইলাম। গেণ্ডারিয়া থাকা কালীন কুঞ্জদের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দীক্ষার বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কুঞ্জের নিকটে ঘটনাটি জানিতে আগ্রহ জন্মিল। জিজ্ঞাসা করায় কুঞ্জ বলিলেন—পুরোহিত মহাশয়ের ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের বড়ই আকাঙ্ক্ষা জন্মে, কিন্তু তাঁর অবস্থা অতিশয় শোচনীয়—গেণ্ডারিয়া যাওয়ার সামর্থ্য নাই। তাই তিনি কাতর হইয়া মনে মনে ঠাকুরকে জানাইতে লাগিলেন। একদিন পুরোহিত রাত্রে আহারের পর শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছেন, অধিক রাত্রিতে "ব্রজমোহন, ব্রজমোহন" ডাক শুনিয়া, ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং চাহিয়া দেখেন ঠাকুর সম্মুখে দাঁড়ান, পুরোহিতকে বলিলেন—"শীঘ্র স্নান

করে এস—এখনই তোমার দীক্ষা হবে।" ব্রজমোহন স্নান করিয়া আসিলেন। কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুরের কথামত তাঁহাকে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে যাইতে লাগিলেন। ঘরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পুরোহিত পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঠাকুর নাই। তখন ব্যস্ততার সহিত ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতরে ঠাকুর বসিয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর ব্রজমোহনকে সম্মুখে বসাইয়া যথামত দীক্ষা দিলেন, দীক্ষার পর ব্রজমোহন ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, মাথা তুলিয়া দেখেন, ঠাকুর আর নাই। ব্রজমোহন এদিক সেদিক একটু খুঁজিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন এবং নিদ্রিত হইলেন। সকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ব্রজমোহনের রাত্রির কথা স্মরণ হইল, একটু দ্বিধাভাব আসিতেই ভিজা ছাড়া কাপড় দরজার ধারে পড়িয়া আছে দেখিয়া সংশয় শূন্য হইলেন। অমনি গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঠাকুরতা ও রজনী ঠাকুরতার নিকটে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তাহারা ঐ ঘটনার সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ঠাকুরকে জানাইলেন! ঠাকুর উত্তরে লিখিলেন—ঘটনা সত্য, কিন্তু উহাকে আবার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

বস্তি যাত্রা। দাদার অপূর্ব্ব দীনভাব।

আরাতে আসিয়া শরীর আমার সুস্থ রহিল না। কুঞ্জের সহিত কয়েকদিন আনন্দে কাটাইয়া কাশী যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। কাশীতে রামকুমার বিদ্যারত্ন (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) ও তারাকান্ত দাদা (ব্রহ্মানন্দ ভারতী) আছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় পছন্দমত শালগ্রাম সংগ্রহ হইতে পারিবে; এবং ত্রিসন্ধ্যাটিও ভালরূপে শিখিয়া লইতে পারিব। আসন ঝোলা বাঁধিয়া, আমি কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময় কুঞ্জ বলিলেন—"কাতর শরীর লইয়া কাশীতে আর যাওয়া কেন, ওখানে গেলে নানা অনিয়মে শরীর আরও অসুস্থ হইয়া পড়িবে। অবিলম্বে পাহাড়ে যাওয়ার বিঘ্ন ঘটিবে। বরং দাদার নিকটে বস্তি যাওয়া ভাল।" আমিও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়া বস্তি যাত্রা করিলাম। কুঞ্জ একখানা মধ্যম শ্রেণীর টিকেট করিয়া দিলেন। লাইনের দুদিকে নিবিড় শালবন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উহার মধ্যে ঠাকুরকে দেখিতে পাই কি না অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পর দিন বেলা প্রায় ৭টার সময়ে দাদার বাসায় উপস্থিত হইলাম। দাদা তখন আহ্নিক করিতেছিলেন। দাদার নিকটে না যাইয়া বাহির বারান্দায় আসন করিয়া বসিলাম। পূজা সমাপনান্তে দাদা আমার নিকটে আসিলেন। দাদাকে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। দাদার আর সেই স্থুল চেহারা নাই; শরীরটি একেবারে

হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। দাদা করজোড়ে নমস্কার করিতে করিতে আমার সম্মুখীন হইলেন। দাদার চরণ দুখানা সামান্য মাত্র ভূমিসংলগ্ন রহিয়াছে মনে হইল। দাদাকে দেখিয়াই আমি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু দাদা কিছুতেই আমাকে চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না। আমি দাদার চারিটী ভাইবোনের ছোট, তথাপি দাদার এই প্রকার ভাব; ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। দাদার চেহারাটি তপস্যাপূর্ণ উজ্জ্বল সাত্ত্বিক বৈষ্ণবের মত হইয়াছে। তাঁহার স্নেহপূর্ণ-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমি ঠাণ্ডা হইলাম। দাদার এরূপ দীনভাবাপন্ন মূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই। ঠাকুর দাদাসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—**তোমার বড়দাদা একেবারে আলাভোলা মানুষ, অসাধারণ সরল, সংসারের কিছুই জানেন না। ফয়জাবাদে তাঁর সব কাণ্ড দেখে আমরা সকলে অবাক্ হয়েছি। একেবারে বালকের মত বিশ্বাসটি বড় সুন্দর।** দাদাকে দেখিয়া ঠাকুরের এই সকল কথা আমার স্মরণ হইল। দাদা আমাকে স্নানাহ্নিকান্তে জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন; এবং শালগ্রামের কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া হাঁসপাতালে চলিয়া গেলেন।

বস্তিতে স্বাস্থ্য লাভ।

দাদার বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন যে ঘরখানায় গতবারে ছিলাম, তাহাতেই আসন করিলাম। শেষ রাত্রি হইতে পুনরায় নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত দিবসের কার্য্যগুলি ঘড়ি ধরিয়া করিতে লাগিলাম। ভোরবেলা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ঠাকুর আমাকে তাঁর নামে ও ধ্যানে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখেন। আহা! কবে জনশূন্যস্থানে পাহাড় পর্ব্বতে যাইয়া তাঁহার মনোহর রূপের ধ্যানে দিবারাত্রি বিভোর হইয়া থাকিব? কবে ঠাকুর আমার চতুর্দ্দিক শূন্য করিয়া তাঁহার শান্তিময় শ্রীচরণে চির আশ্রয় প্রদান করিবেন? অচিরে পাহাড়ে যাইতে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু শরীর অতিশয় খারাপ দেখিয়া দাদা তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন—"কিছুদিন যথামত আহারাদি করিয়া শরীর সুস্থ করিয়া লইতে হইবে।" দাদা আমার পুষ্টিকর আহারের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সময় সময় ঔষধও দিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। ৬।৭ দিনের মধ্যেই দাদার ব্যবস্থা মত চলিয়া শরীর আমার বেশ সুস্থ হইল। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে ভিক্ষায় চাউল জুটিবে না অনুমানে দাদা আমাকে ডাল রুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। পরে শুধু নুন রুটি খাইতে লাগিলাম। শরীর তাহাতে আমার কয়েক দিনের মধ্যেই খুব সবল ও সুস্থ হইল।

পাহাড়ে পাছে ঠাণ্ডা লাগিয়া আবার জ্বর হয়, সেই আশঙ্কায় দাদা আমাকে একটী তুলার আল্‌খিল্লা এবং কন্দমূল খুঁড়িবার জন্য একখানা বড় চিম্‌টা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। একটী রূপার সুন্দর কৌটা আমাকে দিয়া বলিলেন—"ইহার ভিতরে শালগ্রাম রাখিয়া কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিও। না হইলে চুরি হইয়া যাইবে।"

শালগ্রাম পূজা ও ত্রিসন্ধ্যা আরম্ভ।

রঘুবর বাবাজীর নিকট হইতে যে 'শেষ-চক্রটি' পাইয়াছিলাম, এতকাল তাহা ঝোলাতেই বন্ধ ছিল। এখন জল, তুলসী, ফুল চন্দনাদি দিয়া তাহা পূজা করিতে লাগিলাম। উহা আমার পছন্দমত সুশ্রী নয় বলিয়া, পূজাটিতে তেমন আরাম পাইতেছি না। সন্ধ্যা করিবারও একটা প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় প্রতিদিন আমি ত্রি-সন্ধ্যা করিতেছি। কিন্তু সন্ধ্যার আচমন, আপমার্জ্জন ও অঘমর্ষণাদি কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। সমস্ত মন্ত্রেরই ত তাৎপর্য্য স্বয়ং ভগবান, সুতরাং সন্ধ্যাও আমার ঠাকুরেরই শ্রীঅঙ্গের বর্ণনা মাত্র করিয়া যাইতেছি। সন্ধ্যাপাঠ কালে ঠাকুরের প্রত্যেকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্টরূপে যেন চক্ষে পড়ে। তাহাতে কি যে আনন্দ অনুভব করি, প্রকাশ করিতে পারি না। আজ-কাল মনে হইতেছে যেন সমস্ত দিনটিই ঠাকুরের উপাসনায় যাইতেছে।

সাবেকের প্রতি সমাদর।

কিছুকাল পূর্ব্বেও ফয়জাবাদে দাদাকে মহা ভোগসুখে থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু এখন তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্যের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি।

অযোধ্যা হইতে দাদার ধর্ম্মবন্ধুগণ সময় সময় তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য এখানে আসিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কয়েকটী দিন কাটিয়া গেল। দাদার মুখে বাবু হরিসিংহের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভিতরে থাকিয়া, তিনি যেরূপ দীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন তাহা বড়ই অদ্ভুত।

দাদা কহিলেন—এক দিবস আমি হরিসিংহের বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম; তাঁহার আসবাব জিনিসপত্র বাড়ী ঘর দেখিয়া তাঁহাকে অসাধারণ ধনী বলিয়া মনে হইল। বাড়ীর ভিতরে একখানা মাটির জীর্ণ খোলার ঘর দেখিয়া আমার স্ত্রী হরিসিংহের পরিবারকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন সুন্দর বাড়ীর ভিতরে এই খোলার ঘরখানা কেন রহিয়াছে?" তিনি ছল ছল চক্ষে বলিলেন—"এই ঘরই আমার লক্ষ্মী, আমার স্বামী যখন ১০ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন, তখন আমরা এই ঘর খানাতেই থাকিতাম। এই ঘরে থাকিয়াই আমার যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য। এখন এ ঘর কি আমি ত্যাগ করিতে পারি? বর্ষা বাদলে শীতে গ্রীষ্মে বারমাস আমরা এই ঘরেই থাকি। যতকাল রামজী সংসারে রাখিবেন, এই ঘর খানায়ই থাকিব। এ সকল ঐশ্বর্য্য যাহাদের ভাগ্যে আসিয়াছে, তাহারা ভোগ করিবে।" শুনিলাম হরিসিং এখন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। বহু ছত্র ও ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে আছে। প্রতি মাসে সহস্র সহস্র টাকা পরাহিতার্থে ব্যয় করেন। রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত কয়িয়াও সাবেক কুটীর খানি ছাড়েন নাই। নিজেরা স্ত্রীপুরুষে তাহাতেই বাস করেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

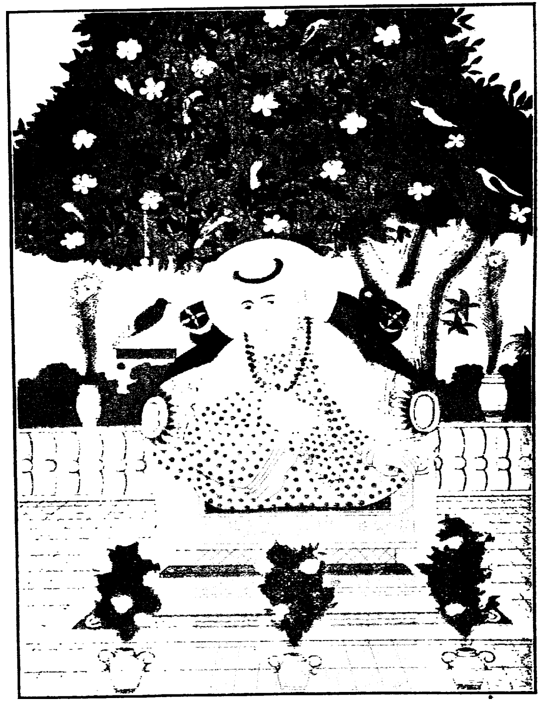
শ্বাসে প্রশ্বাসে সাধন তত্ত্ব।

বস্তি সহরে কোন প্রসিদ্ধ দেবালয় বা সাধু মহাত্মা আছেন কিনা, দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন—নানক সাহিদের একটী আখ্‌ড়া আছে। তাহা ছাড়া আরও দু'একটী দেবালয় আছে। কিন্তু তাহা তেমন প্রসিদ্ধ নয়। বৌদ্ধ লামা-গুরুরা সময় সময় এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা পর্য্যটন করিয়া চলিয়া যান।

শুনিয়াছিলাম—এই বস্তিই নাকি প্রাচীন কপিলাবস্তু। এই স্থানেই রাজপুত্র শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়। এই স্থানেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ত্রিতাপ জ্বালায় জীবকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অতুল রাজৈশ্বর্য্য ও যৌবন সুলভ সম্ভোগাদি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গভীর অরণ্যে কঠোর তপস্যায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু ছয় বৎসরকাল অদম্য অধ্যবসায়ে আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা নানা প্রণালীতে যোগাভ্যাস করিয়াও তিনি "সত্যতত্ত্ব" উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অবশেষে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দুঃখের মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া নির্ব্বাণের এক অভিনব পথ আবিষ্কার করিলেন। পরদুঃখ-কাতর, সদয়হৃদয় বুদ্ধদেব শুধু নিজে নির্ব্বাণলাভে পরিতৃপ্ত না থাকিয়া, জীবের কল্যাণার্থ মনোবিজ্ঞান সম্মত এরূপ অমূল্য সাধন প্রণালী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যাহার অনুসরণে আজও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে; এবং যুগযুগান্তর হইতে মানব সভ্যতার উপর আর্য্যধর্ম্মের যে প্রভাব চলিয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ তাহার



বুদ্ধদেব



গুরু নানক

আরও বিস্তার সাধন করিতেছে। ঠাকুরের অপরিসীম কৃপায় আমরা যে সাধন লাভ করিয়াছি, বৌদ্ধ-সাধনের সহিত অনেকাংশে তাহার সাদৃশ্য আছে।

বুদ্ধদেব নানা প্রকার সাধন প্রণালীর মধ্যে দেহতত্ত্ব অবলম্বনে সাধনপন্থার সমধিক বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রিপিটক ও বিশুদ্ধিমার্গ প্রভৃতি গ্রন্থে উহার বহুল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে রোহিলাশ্ববগ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"অপিচাহং আবাস ইমস্মিং এব ব্যামমত্তে কলেবরে সন্নিঙ্কি সমানকে
লোকঞ্চ পন্নপেমি লোকসমুদয়ঞ্চ লোকনিবোধঞ্চ পতিপদন্তি" ইত্যাদি—

সাড়ে তিন হাত পরিমাণ এই শরীরে যেখানে চৈতন্য ও মন রহিয়াছে, সেই স্থানে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ও রহিয়াছে; এবং এই সংসারাবর্ত্ত হইতে পরিনির্ব্বাণের পথও রহিয়াছে।

আবার কায়গতাসতি বা দেহতত্ত্ব অবলম্বনে সাধনপ্রণালীতে আনাপানাসতি বা শ্বাস-প্রশ্বাসে মনঃসংযোগ করিয়া সাধন করাই প্রশস্ত। আনয়তি অর্থে শ্বাস গ্রহণ, পানয়তি অর্থে প্রশ্বাস ত্যাগ বুঝায়। সতি শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, পালি ভাষায় 'সতি' শব্দে, প্রতি নিমেষে প্রতি মুহূর্ত্তে যে ব্যাপার সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে জাগ্রতভাবে মনঃসংযোগ করিয়া থাকাই সূচিত হয়। ধ্যান করিবার পূর্ব্বে মনকে লক্ষ্য বিষয়ে পুনঃপুনঃ নিবিষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। চঞ্চলতা, জড়তা, নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদি আসিয়া একাগ্রতা নষ্ট না করে এ জন্য চেষ্টা যত্ন দ্বারা মনকে সর্ব্বদা সচেতন রাখিতে হয়। তাই বুদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রেও পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে—সাধক অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন উপাধিশূন্য নির্জ্জন স্থানে যাইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করেন। দেহ সরল ও সোজাভাবে রাখিয়া, নাসিকার অগ্রভাগে চিত্ত স্থির করিয়া, সাধনের বিষয় বা ধ্যেয় বস্তুতে মনঃসংযোগ করেন। তৎপরে বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেকটী শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে সাধন আরম্ভ করেন।

১। স সতো ব অস্সসতি সতো ব পস্সসতি।

তিনি স্মৃতিশীল হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ কালে তাহার পরিষ্কার অনুভূতি হইতে থাকে যে, তিনি শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন, এবং প্রশ্বাস ত্যাগকালেও তাহার জানা থাকে যে, তিনি প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে তিনি

স্মৃতিশীল হইয়া অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন।

২। দীঘং বা অস্‌সসন্তো দীঘং অস্‌সসামীতি পজানাতি,
দীঘং বা পস্‌সসন্তো দীঘং পস্‌সসামীতি পজানাতি,
রস্‌সংবা অস্‌সসন্তো রস্‌সং অস্‌সসামীতি পজানাতি,
রস্‌সং বা পস্‌সসন্তো রস্‌সং পস্‌সসামীতি পজানাতি।

শ্বাস প্রশ্বাসের টান যদি লম্বা হয়, তবে তিনি (সাধক) দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন, এবং দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, ইহা তিনি জানেন। শ্বাস প্রশ্বাস যদি ছোট হয় তবে তিনি (সাধক) সেইরূপ খর্ব্ব শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন এবং সেইমত ছোট প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ইহাও তিনি জানেন।

৩। সব্বকায় পটিসংবেদী অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।
সব্বকায় পটিসংবেদী পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

তিনি (সাধক) সর্ব্বাঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দন বা কম্পন বা টান অনুভব করিতেছেন, এরূপ ভাবে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

এ স্থলে সর্ব্বাঙ্গ অর্থে—বুদ্ধ ঘোষের মতে—নাভি হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত বুঝায়; যে হেতু শ্বাস-প্রশ্বাসের উৎপত্তি ও অবসান নাভি হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ আছে।

৪। পস্‌সম্ভয়ং কায়সংখারং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
পস্‌সম্ভয়ং কায়সংখারং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখায় দেহের সংস্কার প্রশ্রম্ভিত বা বিলুপ্ত হইবে এরূপভাবে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব—ইহা তিনি শিক্ষা করেন।

উক্ত চারিটী সূত্র লইয়া প্রথম চতুষ্ক করা হইয়াছে। ইহার প্রথমটিতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার জ্ঞান, দ্বিতীয়টিতে শ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব দীর্ঘ হওয়ার জ্ঞান, তৃতীয়টিতে সর্ব্বশরীর ব্যাপী শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য হওয়ার জ্ঞান, এবং চতুর্থটিতে দেহ সংস্কার ত্যাগে নিরোধাভিমুখী হওয়ার জ্ঞান সূচিত হইতেছে।

৫। পীতি পটিসংবেদী অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
পীতি পটিসংবেদী পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রীতি উন্মেষক—এই ভাবের শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

৬। সুখ পটিসংবেদী অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
সুখ পটিসংবেদী পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই সুখ উৎপত্তি হইতেছে, এই ভাবের শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

৭। চিত্তসংখারং পটিসংবেদী অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
চিত্তসংখারং পটিসংবেদী পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই চিত্তসংস্কারের অর্থাৎ উপেক্ষা, বেদনা ইত্যাদির উন্মেষ হইতেছে এই প্রকার শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

৮। পস্‌সম্ভয়ং চিত্তসংখারং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
পস্‌সম্ভয়ং চিত্তসংখারং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

চিত্তসংস্কার প্রশমিত, দমিত, শান্ত ও নিরোধ করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত চারিটী সূত্র লইয়া দ্বিতীয় চতুষ্ক করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় চতুষ্কে বলা হইয়াছে, দেহের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিলে মন অন্তর্ম্মুখী হয়, বিক্ষিপ্ততা কমিয়া যায়, এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়; তাহাতে প্রীতি সুখ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বা ভাবের উদ্রেক হয়। তারপর আবার এই চতুষ্কের শেষভাগে এই চিত্তবৃত্তিগুলিরও নিরোধ করার কথা বলা হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বনে ভিতরের প্রত্যেকটী ভাব প্রথমে জাগাইয়া তুলিয়া তৎপরে তাহা দ্বারাই উহা সমূলে উৎপাটনের কৌশল বুদ্ধদেব বলিয়া দিলেন।

৯। চিত্ত পটিসংবেদী অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
চিত্ত পটিসংবেদী পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

উপরি উক্ত উপায়ে চিত্ত বৃত্তিবিহীন হইলে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে সেই চিত্ত বিকাশ হয়; এইরূপ বৃত্তি বিহীন চিত্তকে প্রকট করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

১০। অভিপমোদয়ং চিত্তং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
অভিপমোদয়ং চিত্তং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসেই চিত্ত অভিপ্রমোদিত অর্থাৎ আনন্দময় হইতেছে এই ভাবের শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

১১। সমাদহং চিত্তং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
সমাদহং চিত্তং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে চিত্ত সাম্যভাবাপন্ন বা সমাহিত হইতেছে, এই ভাবে চিত্তকে সম্যক্ সমান ভাবে স্থাপন করিতে করিতে সমাহিত বা সমাধিযুক্ত করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

১২। বিমোচয়ং চিত্তং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
বিমোচয়ং চিত্তং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসেই 'পঞ্চনিবারক' অর্থাৎ নির্ব্বাণের পাঁচটী প্রতিবন্ধক—অবিদ্যা, অস্মিতা আনন্দ প্রভৃতি পঞ্চভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, শুদ্ধ বুদ্ধাবস্থাপন্ন হইতেছে, এই ভাবে সাধক শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

নবম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত এই চারিটী সূত্র লইয়া তৃতীয় চতুষ্ক করা হইয়াছে। তৃতীয় চতুষ্কে ইহা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে যে, চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলেও মূল চিত্তটি থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রথমে তাহাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া লইতে হইবে; তাহাতে আনন্দ অবস্থা লাভ হইবে। আনন্দের আতিশয্যে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে একাগ্র হইবে। এইবারে তীক্ষ্ণ একাগ্রতা সহকারে পরীক্ষা করিয়া, চিত্তের গুপ্ত সংস্কারাদি যাহা কিছু থাকে দূরীভূত করিতে হইবে। সুখ, প্রীতি, আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই নির্ব্বাণের বিরোধী। এই সকলকে নির্ম্মূল করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে।

সর্ব্বশেষে চতুর্থচতুষ্কে 'আনাপানাসতির' অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে সাধনের সহিত 'বিদর্শন ভাবনা' করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সাধনে চিত্তের যে বিশুদ্ধি জন্মে তাহা সাময়িক ও অসম্পূর্ণ। যেমন পানাপুকুরে ঢিল ছুড়িলে কিছু ক্ষণের জন্য ফাঁকা হইয়া আবার উহা বুঝিয়া যায়, সাধনের দ্বারা চিত্ত সর্ব্বসংস্কার রহিত হইলেও সংস্কারের মূল থাকিয়া যায়। সুযোগ পাইলে উহা আবার গজাইয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। উহাকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিতে হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসে 'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা' বলিয়া প্রত্যয় জন্মাইতে হইবে। তখন বৈরাগ্যের উদয় হইবে। কোনও অবস্থাতেই আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা হইবে না। এই প্রকারে নিরোধের দিকে অগ্রসর যতই হইবে ততই সমস্ত নিসর্জ্জিত বা পরিত্যক্ত হইবে। তখনই নির্ব্বাণ লাভ।

সাধক তৃতীয় চতুষ্কের অবস্থায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে 'বিদর্শন ভাবনা' সম্ভবপর হয় না। নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা, বিচার-বিতর্ক, ভুল-ভ্রান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি, আমোদ-প্রমোদ

প্রভৃতি মনের ভাব বর্ত্তমানে সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যধির যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি সংস্কার মাত্র। বাস্তবিক তাহাদের কোনও অস্তিত্বই নাই। কেননা, আমি যাহা পাপ বলিয়া মনে করি, অন্যে তাহাই পুণ্য বলিয়া বুঝিতে পারে। এই সমস্ত সংস্কার বশতঃই আমাদের মিথ্যা ধারনা জন্মিয়াছে। অসার ক্ষণস্থায়ী সংসারকে সত্য বলিয়া বুঝিতেছি। জ্বালা-যন্ত্রনাময় সংসারকে পরম সুখের স্থান মনে করিতেছি। সমস্ত বস্তুতেই 'আমার, আমার' করিয়া আসক্ত হইতেছি। অনিত্য, দুঃখদ, অনাত্ম জগৎকে নিত্য, সুখকর ও পরমাত্মার প্রকাশমান অবস্থা মনে করিতেছি। এই সমস্ত ভ্রান্তি দূর না হইলে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থা লাভ হয় না। ইহা দূর করিবার জন্যই সাধন ভজন। যেমন প্রথমে বড় বৃক্ষের ডালপালা ছাটিয়া, গোড়া কাটিয়া দেওয়ায় উহা পড়িয়া গেলে মাটীর নীচ হইতে শিকড় তুলিয়া ফেলা সহজ হয়, তেমনি প্রথমে উপরে উপরে, ভাসা ভাসা সংস্কারগুলি নষ্ট করিয়া, ক্রমে অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত সংস্কার উচ্ছেদ করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত 'বিদর্শন ভাবনা' স্বতঃই জাগ্রত হয়। কারণ তখন মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসই অনুধ্যানের বিষয় থাকে, কিন্তু এই শ্বাস প্রশ্বাস কোনও মূহূর্ত্তে এক অবস্থায় স্থির থাকে না। ইহা নিয়তই গতিমান ও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, সমস্তই অনিত্য বোধ হইবে। এই সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসই যত দুঃখের কারণ, ইহা আত্মা নয়—এইরূপ প্রতিতীও জন্মিবে। এ জন্য শ্বাস প্রশ্বাসই অনিত্য দুঃখদ ও অনাত্মা বলিয়া প্রতীতি হইবে। কিন্তু 'বিদর্শন ভাবনা'স্থলে আমরা প্রথম হইতেই গুরুদত্ত অপ্রাকৃত শক্তিযুক্ত নাম করি। সর্ব্বসংস্কার রহিত হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসে একাগ্রতা সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ থাকে, তখন বিদর্শন ভাবনাই করি আর নামই করি তাহা শ্বাসে প্রশ্বাসে মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে বিদর্শন ভাবনায় অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা বলিয়া প্রতীতি জন্মে; শ্বাসে প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিতে গেলেও ধ্যানের চরমাবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসই নাম, নামই শ্বাস প্রশ্বাস, এরূপ অনুভূতি জন্মে। তখন নামে কোনও অর্থবোধও জন্মায় না, কোনও রূপের সংস্কারও জাগায় না। স্বভাব হইতে নাম আপনা আপনি হয়; আমি নিশ্চেষ্ট দর্শকের ন্যায় তাহার অনুভব মাত্র করিতে থাকি। এ অবস্থা সম্বন্ধে বাক্য-ভাষায় আর কিছুই প্রকাশ করা যায় না। আর্য্য ঋষিরা ইহাকেই 'অবাঙ্মনসগোচর'—বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন, ইহা "অচিন্তেয্যানি ও অচিন্তিতব্যানি" অর্থাৎ চিন্তার বিষয় নয়, চিন্তা করাও যাইতে পারে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"পতিসোতাগম্মং নিপুনং গম্ভীরং অনুং বাগরত্তা ন দক্‌খতি তমোখন্ধেন আবতা"

রাগদ্বেষরক্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম গভীর সত্য দেখিতে পায় না। জ্ঞানীরা দেখিলেও প্রকাশ করিতে পারেন না।

চিন্তারাজ্যের অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা একটী ঘটনা হইতে বিশেষরূপে বুঝা যায়। আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবুর স্ত্রী মনোরমা দেবী একসঙ্গে ৪৮ ঘণ্টাকাল অবিচ্ছেদে সমাধিস্থ থাকিতেন। এ বিষয়ে ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন—**মাত্র নামানন্দে মগ্ন আছেন, এখনও হয়েছে কি ? আস্তিক্য বুদ্ধিই জন্মে নাই।** ভাবাভাব রহিত হইয়া, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থায় উপনীত না হইলে, তত্ত্ব প্রকাশ পায় না, এবং প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রলাপ বাক্য। এ জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নিরুত্তর থাকিতেন; এবং জিজ্ঞাসুকে তাহার প্রদর্শিত সাধন পথে চলিয়া, লক্ষ্যস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করার উপদেশ দিতেন। ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেন—**শুধু শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করে যাও সমস্ত অবস্থা তাতেই লাভ হবে।** কিন্তু কি অবস্থা লাভ হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, অথবা নামের প্রতিপাদ্য বস্তু সম্বন্ধেও কোনও প্রকার ধ্যান ধারণা করিতে উপদেশ দেন নাই। সহজ শ্বাস প্রশ্বাসে মনঃসংযোগরূপ অত্যুর্ব্বরা সাধনক্ষেত্রে শক্তিমান গুরু যে কোনও বীজ বপন করুন না কেন, অতি সহজেই তাহার অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়া, ক্রমে উহা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে নানক, কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই সাধন অবলম্বনেই আপন আপন ইষ্ট বস্তু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও এই সাধনে সফলতা বিষয়ে মহাত্মা গম্ভীরানাথজী এবং আমাদের ঠাকুর ইহার ফললাভ সম্বন্ধে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশের প্রারম্ভে ও শেষে বলিয়াছেন—

"একায়নো অয়ং ভিক্‌খবে···নিব্‌বানস্‌স সচ্ছি কিরিয়ায়, যদিদং চত্তারো সতিপট্‌ঠানো।" ইত্যাদি—অর্থ্যাৎ নির্ব্বাণ লাভের পক্ষে ইহাই একমাত্র পথ।

শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই।

"আমতং তেসং বিরুদ্‌ধং যেসং কায়গতাসতি বিরুদ্‌ধা।"

যাহারা কায়গতাসতি অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসাদি দেহতত্ত্ব অবলম্বনে সাধন করার বিরোধী, তাহারা নির্ব্বাণেরও পরিপন্থী। ইহাই বুদ্ধের চরম সিদ্ধান্ত।

সর্ব্বশেষে এই সাধনের ফলাফল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন।

"তিট্‌ঠতু ভিক্‌খবে অদ্‌ধমাসো যোহি কেচি ভিক্‌খবে ইমে চত্তারো সতিপট্‌ঠানো এবং ভাবেয্যং সত্তাহং তস্‌স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পটিকংখং দিট্‌ঠেব ধম্মে অঞ্ঞাসতি উপাদিসেসে অনাগামিতা।"

হে ভিক্ষুগণ! যিনি অর্দ্ধমাস কিম্বা সপ্তাহ কাল এই সাধন করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং দেহান্তে অনাগামি হন।

শুনিয়াছি ঠাকুরও বলিয়াছেন—**লামা-গুরুদিগের আচার ব্যবহার ও তাঁহাদের সাধন প্রণালী না দেখিলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝা যায় না। উহাই একমাত্র পন্থা।** গত ২৪শে পৌষ তারিখে গুরুভ্রাতাদিগকে উপদেশ করার সময়েও ঠাকুর বলিয়াছেন—

একমাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ দ্বারা আত্মার সমস্ত পাপ, সংশয় নষ্ট হইবে। তখন বিশ্বাস আপনা হইতেই আসিবে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়।

ওঁ গুরু।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।